শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট . পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৬০
দ্বিতীয় মুদ্রণ · অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

শ্রীবিমল মিত্র

বন্ধুবরেষু

আমার এই উপন্যাসটি গত বৎসর ছাপা হয়েছিল পূজা-সংখ্যা আনন্দ-বাজার পত্রিকায়। সেই থেকে একে নিয়ে আলোচনার আর অন্ত নেই। এর প্রশংসাও যত শুনেছি, আবার বিরুদ্ধ সমালোচনাও কম শুনিনি। প্রশংসার কথাটা বলব না, নিন্দার কথাটাই বলি।

এ-বইএর নাম 'সারারাত' হতে পারে না, সেকথা সকলেই বলেছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। তবু 'সারারাত' নামটি রাখতে বাধ্য হলাম শুধু এইজন্যে যে ওই নামে আনন্দবাজারের অগণিত পাঠক-পাঠিকা গল্পটি পড়ে ফেলেছেন। যাঁরা পড়েননি, তাঁদের কাছ থেকেও অনেক চিঠি পেয়েছি। সকলেই জানতে চেয়েছেন—বইটি পুস্তকাকারে কখন প্রকাশিত হবে। সারারাত নাম না রাখলে তাঁরা বিভ্রান্ত হতে পারেন তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই নাম রেখে দিলাম।

তার পরের কথা হলো—গল্পটি বিয়োগান্ত কেন হলো? অনেকে বলেছেন—ভালই হয়েছে। আবার অনেকে বলেছেন—ভাল হয়নি। যাঁরা চিঠি লিখে জানিয়েছেন তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ওপরেও শুধু সেই একটিমাত্র অনুযোগ বারংবার আমার বুকে এসে বিঁধেছে : 'যে-শঙ্করকে আমরা এত ভালবেসে ফেললাম সে-শঙ্করের এ শোচনীয় পরিণতি আপনি দেখালেন কেন?'

কেন দেখালাম সেকথা কি আমিই জানি?

এর জন্য আমাকেও কম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি।

এই গল্পটির নাট্যরূপ দিতে গিয়ে আকাশবাণী (অল ইণ্ডিয়া রেডিযো) আমার অনুমতি না পেয়ে এখনও কিছু করতে পারছেন না। গল্পটিকে মিলনান্ত করবার অনুমতি চেয়েছেন।

শ্রীদেবকীকুমার এই গল্পটির সিনেমায় চিত্র-নাট্য করতে গিয়ে সেই একই কথা বলেছেন। এই নিয়ে কয়েকদিন ধরে আমার সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। আরও তিনজন সিনেমার দিক্‌পাল শুধু ওই একই কারণে হাত গুটিয়ে বসে আছেন।

এখন এর বিচারের ভার আমার পাঠক-পাঠিকাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

১৩৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
টালা পার্ক, কলিকাতা-২

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছেলেটা মানুষ হল না। অথচ এই ছেলেটাকে মানুষ করবার জন্যই তার কলকাতায় আসা।

পাড়া-প্রতিবেশী হিতৈষী যে দু-চারজন ছিল, সবাই বলেছিল সেই এক কথা। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও ত শহরে যাও। তাই সে তার পাঁচ বছরের ছেলে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল শহরের সেরা শহর—কলকাতায়।

আজ সেই ছেলে তার পঁচিশ বছরের যুবক। এই কুড়িটি বছর ধরে কীই-না সে করেছে ছেলের জন্যে!

বিমলা ব্রাহ্মণের বিধবা। প্রথম যখন সে কলকাতায এসেছিল, দেহে স্বাস্থ্য ছিল, সৌন্দর্য ছিল। বড়লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ জুটিয়ে নিতে তার দেরি হয়নি।

নিজে রান্নার কাজ কবেছে, আর ছেলেকে দিযেছে ইস্কুলে।

বাবুদেব বাড়ির ছেলের সঙ্গে শঙ্কব লেখাপড়া শিখছে। গর্বে আনন্দে মায়েব বুক দশহাত হয়ে গিযেছে। ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে রাত্রে শুযে শুয়ে কত কথা শিখিযেছে তাকে। বলেছে, "তুমি লেখাপড়া শিখবে, বড হবে, তার পর যাবে তোমার গ্রামে। বর্ধমান জেলাব ময়নাবুনি গ্রামে তোমার সব আছে। বাড়ি আছে, জমি আছে, পুকুর আছে, বাগান আছে, তোমাব অভাব কিছু নেই। কিন্তু সে-সব তোমাকে উদ্ধার করতে হবে।"

শঙ্কর তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। জিজ্ঞাসা করেছে, "উদ্ধার কী মা?"

বিমলা বিপদে পড়েছে। উদ্ধাব কথাটার মানে নিজেও সে ঠিকমত বোঝাতে পাবেনি। বলেছে, "তোমাব এক কাকা আছে সেখানে। ভারী বজ্জাত। তোমার বাবার জিনিস, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে নানারকম কৌশল করে নিজে নিয়ে নিয়েছে। তোমার সেই কাকাকে জব্দ করতে হবে। তোমার নিজের জিনিস—আবার তোমাকে কেড়ে নিতে হবে।"

এতক্ষণ পরে শঙ্কব উৎসাহিত হয়েছে। বলেছে, "ঠিক কেড়ে নেব, তুমি দেখো। মেরে কেড়ে নেব।"

বিমলা ম্লান একটু হেসেছে শুধু।

ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হয়েছে। শঙ্কর কাঁদতে কাঁদতে এসে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়েছে মায়ের কোলের ওপর।

বিমলা কিছুতেই তাকে থামাতে পারে না! "চুপ কর বাবা, ছি, কাঁদতে নেই। কী হয়েছে বল না।"

শঙ্কর বলে না কিছুতেই। শুধু ফুলে ফুলে কাঁদে।

ওদিকে উনোনে দুধ চড়ানো রয়েছে। এক্ষুনি দিয়ে আসতে হবে গিন্নি-মার কাছে। ছেলেকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

বিমলা বাধ্য হয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে উনোনের কাছে এগিয়ে গেল।

শঙ্কর এতক্ষণে কথা বললে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমাকে রাঁধুনী-বামনীর ছেলে কেন বলবে?"

দুধটা নামাতে নামাতে বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কে বললে?"

শঙ্কর বললে, "রনা।"

"ওরে চুপ চুপ, রনা বলিসনি, রণেন বলবি। ও যে বড়বাবুর ছেলে।"

শঙ্কর বললে, "না, বলবে না! আমি বলেছিলাম আমি তোদেরই মত বড়লোকের ছেলে। রনা আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে দিয়ে বললে, 'যাঃ, রাঁধুনী-বামনীব ছেলে—বলে কিনা বড়লোকের ছেলে!"

"ওরা কেমন করে জানবে বাবা? বস, আমি দুধটা দিয়ে আসি।"

বাঁ হাতের ওপর কাপড় দিয়ে বসানো গবম দুধের বাটি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে খালি খালি চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে বিমলার। ডান হাতের উলটো পিঠ দিযে চোখের জল মুছতে গিয়ে সে আবার আর-এক বিপদ! গরম দুধ হাতেব ওপর ছল্‌কে পড়ে আর-কি!

কথাটা তাকে না বললেই হতো। কিন্তু না বলেই-বা থাকে কেমন করে? এই সঙ্কল্প নিয়েই যে সে বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে!

এমনি সব ছোট-খাটো কত কথা মনে হয় বিমলার।

কত চেষ্টা করেছে সে ছেলেটাকে ভাল কবে পড়াবার। বইয়ের অভাবে পাছে তার পড়ার ক্ষতি হয়, তাই প্রত্যেকটি বই সে কিনে দিয়েছে। গিন্নি-মার কাছে কেঁদেকেটে বইয়ের দাম আদায় করেছে। হেডমাস্টারের কাছে নিজে গিয়েছে। ইস্কুলের সেক্রেটারির পা-দুটো জড়িয়ে ধরেছে। গরিবের ছেলে বলে মাইনে পর্যন্ত দিতে হয়নি।

ছেলে কিন্তু নিজেকে গরিব বলে কোনদিনই ভাবতে পারলে না।

তিন চারটে বাড়ি বদল করে বাগবাজারের ঘোষালদের বাড়িতে তখন সে চাকরি করে। মস্ত বড়লোক অরিন্দম ঘোষাল। ঘোষাল-গিন্নী বিমলাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। নাতিদের জামা-কাপড় একটু পুরনো হয়ে গেলেই বিমলার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, "নাও, তোমার ছেলেকে দিও। একটু সেলাই করে নিলেই হবে।"

শঙ্কর কিন্তু সেলাই-করা পুরনো জামা-কাপড় পরবে না কিছুতেই। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

বিমলা বসে বসে কাঁদে।

শুধু জামা-কাপড় নয়, ইস্কুলও পছন্দ হয় না শঙ্করের।

এ-ইস্কুলটা ভাল নয়, ওখানকার মাস্টারগুলো বজ্জাত, এখানকার ছেলে-গুলো ছোটলোকের ছেলে, এমনি করে করে ক্রমাগত ইস্কুল বদলায় সে।

ইস্কুল বদলায় আর বন্ধু বদলায়।

বিমলা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "এত নতুন নতুন বন্ধু কোথায় পাচ্ছিস রে?"

শঙ্কব বলেছিল, "জোটাতে হয়।"

কম বয়সেই বেশ লায়েক হয়ে উঠল শঙ্কর।

শঙ্কর যখন ক্লাস এইটের ছাত্র, তখন হঠাৎ একদিন সে তার মাকে এসে বললে, "কাল থেকে খুব ভোরে উঠে আমি বেরিয়ে যাব। তুমি আমার জন্যে একমুঠো ছোলা ভিজিয়ে রেখো।"

বিমলা বললে, "রাখব।"

"ঘণ্টাখানেক পবে ফিরে যখন আসব, তখন যদি একগ্লাস মিছরির শরবত দিতে পার ত খুব ভাল হয়। পারবে দিতে?"

বিমলা বললে, "খুব পারব। কিন্তু কেন বল দেখি? চা খাবি না?"

"না, চা আমি ছেড়ে দিলাম। কাল থেকে একটা জিম্‌নাসিয়ামে যাব।"

বিমলা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। বলে, "সে আবার কী?"

শঙ্কর বলে, "সে-সব তুমি বুঝবে না, মা।"

মাব কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না।

দু-চার মাস যেতে না যেতেই দেখা যায়, শঙ্কর যেন ফন-ফন করে বেড়ে উঠছে। বুকেব ছাতিটা হয়েছে চওড়া, মুখখানা হযেছে ভবাট, গাল দুটো লাল।

বছর ফিরতে-না-ফিবতেই শঙ্কবেব চেহাবাটা হযে উঠল দেখবার মত।

বিমলা তার দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর বলে, "হ্যাঁ, এমনিটি আমি চেয়েছিলাম।"

পাইকপাড়া থেকে কোন্ এক বড়লোকের ছেলে তাকে ডাকতে আসে। ছেলেটির নাম বিমল।

শঙ্কর তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বলে, "আমি ক্লাবে যাচ্ছি।"

শঙ্কর মার কাছে এসে গল্প করে। বলে, "আমি সাইকেল চালাতে শিখলাম, মা। এবার একটা সাইকেল কিনতে হবে।"

বিমলা বলে, "সে-যে অনেক টাকা দাম বাবা। কোথায় পাবি অত টাকা?"

"পাব যেখানে হোক। কলকাতা শহরে টাকার ভাবনা!"

বিমলা ভাবে তার বড়লোক বন্ধু জুটেছে অনেক। তারাই দেবে হয়ত কিনে।

শেষে একদিন সত্যিই দেখা গেল, শঙ্কর একটা বাইকে চড়ে বাড়ি এল। বাইকটা তুলে রাখলে ঘরের ভিতর।

তারপর প্রায়ই দেখা যায়, সে বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময়ে খেতে পর্যন্ত আসে না। মা তার খাবার নিয়ে বসে থাকে। বাড়ি ফেরে হয়ত সন্ধ্যের পর। মা জিজ্ঞাসা করে, "সারাটা দিন কোথায় ছিলি, বাবা? খেতে পর্যন্ত এলি না, আমি এদিকে ভেবে ভেবে সারা।"

শঙ্কর বলে. "তুমি ভারী বোকা, তাই ভেবে মর। বারোটার ভেতর আমি যদি না ফিরি, নিশ্চয় জানবে আমি কোথাও খেয়ে নিয়েছি। আজকাল রাইফেল প্রাক্‌টিস্‌ করছি কিনা, তাই একটু দূরে চলে যেতে হয় বন্দুক নিয়ে। খাবার সময় অত দূর থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।"

রোজই তার রাইফেল প্রাক্‌টিস্‌ চলতে লাগল।

রাইফেল প্রাক্‌টিসেব পর. কী প্রাক্‌টিস্‌ সে করতে লাগল কে জানে, মা শুধু তার চেহাবা দেখেই মশগুল!

এমন দিনে বিশ্রী একটা অঘটন ঘটে গেল।

শঙ্কবের বয়সী একটি নাদুসনুদুস ছেলে একদিন সকালে এসে ডাকলে, "শঙ্কর!"

বিমলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে, "সে ত বাড়িতে নেই, বাবা।"

ছেলেটিব সাজ-পোশাক দেখে মনে হল বড়লোকেব ছেলে। বিমলা বললে, "একটু বস, বাবা, এক্ষুনি আসবে।"

ছেলেটি দোবের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, বসবার জন্যে এগিয়েও এল না, কথাটার জবাবও দিলে না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী নাম তোমার?"

ছেলেটি বললে, "বিজন।"

বলতে বলতেই সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বিজন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে শঙ্কর আসছে।

বিমলা আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, দোরের কাছে বিস্তর লোক জড় হয়েছে। চিৎকারে গোলমালে কি হয়েছে কিছুই ভাল বুঝতে পাবা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে, শঙ্কর দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সাইকেলটা, আর সবাই মিলে তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে সাইকেলটা কেড়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু তারা না পারছে শঙ্করকে সেখান থেকে সরাতে, না পারছে সাইকেলটা কেড়ে নিতে।

শঙ্কর শুধু বলছে, "সরে যাও—ছেড়ে দাও তোমরা। ছেড়ে দাও বলছি!"

চোখ-মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে।

বিমলা আর চুপ করে থাকতে পারলে না। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল দোরের কাছে। বললে, "কী হয়েছে তোমাদের?"

প্রথমে যে-ছেলেটি এসেছিল শঙ্করকে ডাকতে, সেই বিজন ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, "তোমার ছেলে আমার সাইকেল দিচ্ছে না।"

শঙ্কর বলে উঠল, "মিথ্যেবাদী! সাইকেল আমি দেব না। তুই কী করবি কর!"

বিমলা বললে, "ছি! শঙ্কর!"

কিন্তু তার কথা ডুবিয়ে দিয়ে লোকগুলো আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নানা-রকম মন্তব্য করতে লাগল। ভিড়ের ভিতর থেকে একটা লোকের গলা বেশ স্পষ্ট শোনা গেল, "রাঁধুনী-বামুনীর ব্যাটার শখ দ্যাখো? সাইকেল চড়বে। দিয়ে দে ব্যাটা, সাইকেল দিয়ে দে!"

শঙ্কর এবার রুখে উঠল। বললে, "কী বললি? বাপের ব্যাটা হলে এগিয়ে আয়। এইখানে এসে বল। আমি তোর বাপের নাম যদি ভুলিয়ে দিতে না পারি ত"—

আবার চিৎকার! আবার গোলমাল!

শঙ্কবের কাছে দাঁড়িযে কে একজন একটা অভদ্র মন্তব্য করে বসল। তাই-না শুনে শঙ্কর পা দিযে তার পেটে এমন এক লাথি মারলে যে, লোকটা 'ওরে বাপ্!' বলে চিৎকার করে উলটে পড়ে গেল।

বিমলা চিৎকার করে উঠল, "শঙ্কর!"

শঙ্কর তার মাব দিকে ফিরে তাকাতেই মা বললে, "ওর সাইকেল ফিরিযে দাও।"

শঙ্কর বললে, "তার আগে বলুক, ও কেন এই এতগুলো লোক জড় করেছে?"

বিজন বললে, "ওরা যে বললে, আমাদের পাঁচটা টাকা দাও, আমরা তোমার সাইকেল আদায় করে দিচ্ছি।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "টাকা দিয়েছিস?"

বিজন তখন কেঁদে ফেলেছে।

কাঁদতে কাঁদতে বললে, "হ্যাঁ, দিযেছি।"

"কাকে দিয়েছিস?"

শঙ্কর জনতার দিকে তাকিয়ে দেখলে, লোকজন তখন পাতলা হয়ে গেছে।

বিজনও সে-লোকটিকে খুঁজে পেলে না, যে তার কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিয়েছিল।

শঙ্কর বললে, "এই নে তোর গাড়ি। ভাগ!"

বিজন তার বাইকে চড়ে চলে গেল।

তেতলার বারান্দার উপর ঝুঁকে পড়ে বাড়ির মালিক বৃদ্ধ অরিন্দম ঘোষাল আগাগোড়া দেখলেন ব্যাপারটা। দেখে তার চাকরকে ডেকে বললেন, "শঙ্করের মাকে ডেকে আন!"

শঙ্করের মা তখন শঙ্করকে নিয়ে পড়েছে। বলছে, "কই তোকে ত আর বই নিয়ে বসতে দেখি না। ইস্কুলে যাস কিনা তাও জানি না। পড়াশোনা কি ছেড়ে দিলি?"

চট করে কথাটার জবাব দিতে পারলে না শঙ্কর।

বাইকটা বিজনকে ফিরিয়ে দিয়ে এসে অবধি কেমন যেন মনমরা হয়ে সে বসেছিল মাথা হেঁট করে।

কথাটার জবাব দিলে না।

বিমলা বললে, "কতদিন জিজ্ঞেস করব কবব করেও আব জিজ্ঞেস করতে পারিনি। বলতে নেই—তোব চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে গেছি।"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিতেই বিমলা 'আসছি' বলে উপরে উঠে গেল।

উপরে যেতেই বাড়ির কর্তা বললেন, "দ্যাখো শঙ্করেব মা, তোমাকে একটা কথা আজ বলা আমি দরকার মনে করছি।"

বিমলা বললে, "আপনাব আশ্রয়ে আছি। আপনি আমার বাবা। বলুন।"

অরিন্দম বললেন, "ছেলেটির দিকে একটু নজর দাও।"

মাথা হেঁট করে রইল বিমলা। কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

অবিন্দম বললেন. "আজ যা দেখলাম. তাই দেখে আমাব মনে হল, ছেলেটা বোধহয় তার শরীরের দিকেই নজর দিয়েছে একটু বেশী।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন। তারপব আবার বললেন, "তা দিক। শবীরটাও অবহেলাব বস্তু নয়। কিন্তু একটু লেখাপড়া না শিখলে মনটা যে তার উপবাসী রয়ে যাবে মা।"

কাবও সঙ্গে যখন তিনি কথা বলেন, তখন তাব মুখের দিকে তাকাতে পাবেন না, এই তাঁর স্বভাব। কথাটা শেষ করে যেই তিনি বিমলার দিকে তাকিয়েছেন, দেখলেন, বিমলা কাঁদছে।

দোরের পাশে কপাটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমলা, আর তার দু-চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। এইটে যে তারও মনের কথা!

অরিন্দম বললেন, "কাঁদছ কেন মা? ছেলের ত এখনও বয়েস হয়নি।"
এতক্ষণ পরে বিমলা কথা বললে। "কী করব, বাবা, আপনি বলে দিন!"
অরিন্দম বললেন, "কী আর করবে, একটু শাসন কর।"
এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন পাশের দরজা দিয়ে।
কারও কান্না তিনি সহ্য করতে পারেন না।
নীচে নামবার সময় বিমলা একবার ঘোষাল-গিন্নীব ঘরের দিকে তাকালে। ঘরের মেঝেয় বসে বসে তিনি পান সাজছিলেন। একটা কথাও তিনি বললেন না।
বিমলা সিঁড়ির ওপর থমকে থামল। চোখ দুটো বেশ ভাল করে মুছে শঙ্করকে কি বলবে একবার ভেবে নিলে। রান্নাঘরের পাশে নিজের সেই ছোট ঘরটিতে এসে দেখলে, শঙ্কর তার গায়ের শার্টটা খুলে খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে।
বিমলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। হাতকাটা সাদা গেঞ্জিটা চমৎকার মানিয়েছে শঙ্কবকে। জিজ্ঞাসা করলে, "ঘুমুলি নাকি?"
তেমনি চোখ বুজেই শঙ্কর বললে, "না।"
"ইস্কুলে যাওয়া কি তুই ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?"
শঙ্কর জবাব দিলে না।
বিমলা আবার ডাকলে, "শঙ্কর!"
"কী?"
"তুই কি মুখ্খু হয়ে থাকতে চাস?"
শঙ্কর চুপ করে রইল।
"আজকালকাব দিনে লেখাপড়া শিখবি না, মুখ্খু হয়ে থাকবি—লোকে যে তোর সঙ্গে কথা বলবে না রে!"
শঙ্কর তেমনি শুয়ে শুয়েই বলে উঠল, "তুমি সব জান!"
বিমলা বললে, "জানি।"
শঙ্কর বললে, "বেশ বাবা, বেশ, জান ত জান। চুপ কর।"
বিমলা বললে, "তাহলে তুই লেখাপড়া শিখবিনে?"
"এই কথা ওই বুড়ো বুঝি তোমাকে শিখিয়ে দিলে?"
বিমলা ছুটে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, "ওরে চুপ চুপ, হতভাগা, এ কী হল তোর? এ কী বলছিস, ছি!"
শঙ্কব উঠে বসল। বললে, "ঠিক বলছি।"
বিমলা বললে, "আমাকে শেখাতে হবে কেন? আমি দেখতে পাচ্ছি যে! বইয়ের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ নেই, ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিস, এমনি টো-টো কবে ঘুরে বেড়ালে কোনদিন মানুষ হতে পারবি, না এক পয়সা রোজগার করতে পারবি? মুখ্খু ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। শার্টটা গায়ে দিতে দিতে বললে, "তাহলে তাই জেনো।"

"কী জানব?"

বিমলা তার কাছে এগিয়ে গেল।

"জেনো যে তোমার ছেলে নেই।"

কথাটা ধক করে গিয়ে বাজল মায়ের বুকে। ডাকলে, "শঙ্কর!"

শঙ্কর তখন চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা তার পিছু পিছু এল ঘর থেকে বেরিয়ে। উঠোন পেরিয়ে খানিকটা এগিয়েও গেল, কিন্তু তাকে ফেরাতে পারলে না।

বিমলা যেই পিছন ফিরেছে, দেখলে বাড়ির বড় বউ দাঁড়িয়ে তার জানলার কাছে। আড়ি পেতে দাঁড়ানো তার স্বভাব।

তাকে কিছু বলবার ইচ্ছা বিমলার ছিল না, তবু মায়ের মন না বলে থাকতে পারলে না। বললে, "দেখলে বউমা, জোর করে দুটো কথা বলতে গেলাম ত রাগ করে পালিয়ে গেল।"

বড় বউয়েব মুখটা কেমন যেন একরকম হয়ে গেল। বললে, "খাওয়াও আরও চুরি করে করে লুকিয়ে লুকিযে দুধ ঘি মাছ—"

এ বলে কী? বিমলা যেন আকাশ থেকে পড়ল। এতদিন সে কাজ করছে এ-বাড়িতে, চুরি করার অপবাদ কেউ তাকে কখনও দেয়নি।

মায়ের মন, হয়ত-বা এক-আধদিন এক-আধ টুকরো বেশী মাছ, একটু ভাল খাবাব ছেলেকে সে দিতে গিযেছে, কিন্তু ছেলে তার হাঁ হাঁ করে নিষেধ করেছে। বলেছে, "তুমি কি ভেবেছ, না খেয়েই শরীরটে আমার এমনি হয়েছে! বাইরে আমি প্রচুর খাই। বন্ধুরা খাওয়ায়।"

সেদিন মাংস রান্না হয়েছিল। শঙ্করের জন্য একবাটি মাংস বিমলা তুলে রেখেছিল। কিন্তু খাবার সময় মাংসের বাটি সে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "তোমাদের এই 'রিচ্' রান্না আমি খেতে পারি না, মা। মাংস যদি শুধু নুন দিয়ে সেদ্ধ করে দিতে পার ত আমি খেতে পারি।"

বিমলা বলেছিল, "সবই কি তোর আশ্চয্যি, বাবা!"

শঙ্কর বলেছিল, "হাতি দেখেছ মা? বড় বড় ষাঁড়, বড় বড় বাঁদর? তারা মাছ-মাংস খায় না, তবু তাদের গায়ে কী রকম জোর। শুধু শাক আর ভাত আমি যদি ভাল করে হজম করতে পারি ত আমার আর-কিছু দরকার হবে না।"

সেই শঙ্করের নামে এই দুর্নাম?

বিমলা বললে, "না বউমা, শঙ্কর আমার সেরকম ছেলেই নয়। মাছ-মাংস সে খেতেই চায় না।"

বড় বউ বললে, "থাম! কার কাছে কী কথা বলছ? ছেলে তোমার কিছু খায় না! না খেয়ে খেয়েই অমনি কুঁদো বাঘের মত ফুলছে দিন-দিন।"

ছেলে চলে গেল রাগ করে। মনের অবস্থা ভাল ছিল না বিমলার। বলে বসল, "বেশ, তাহলে চুরি-চামারি যে করে না, সেইরকম একজন ভাল লোক তোমরা দেখে নাও, আমি চলে যাই।"

বড় বউ বললে, "সেই কথাই ভাবছি। নইলে তোমার ওই ছেলেটি এ-বাড়িতে থাকলে আমার ছেলেরা যাবে খারাপ হয়ে।"

কথা বলতে ইচ্ছেও করে না, অথচ এই কথা শুনে কোন্ মা চুপ করে থাকতে পারে? বিমলা বললে, "আমার ছেলে ত তোমার ছেলেদের সঙ্গে মেশে না, বউমা।"

বড় বউ বললে, "মেশবার দরকার হয় না। আজ যখন তোমার ছেলে সাইকেল চুরি করে ধরা পড়ল, সদর দরজায় গোলমাল শুনে আমার ছেলেরা ছুটে যাচ্ছিল সেইখানে। আমি তাদের ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিলাম।"

"আমার ছেলে চুরি করেনি বউমা।"

"না, চুরি করেনি! নিজের ছেলেটি খুব ভাল। তোমার ছেলে একটি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা।"

কথায় কথা বেড়ে গেল। বড় বউ বলতে কিছু বাকী রাখলে না। বিমলাও বললে।

বিমলা ভেবেছিল গিন্নী-মা এসে থামিয়ে দেবেন। কিন্তু থামিয়ে দেওয়া দূরের কথা, সন্ধ্যের আগে দেখা গেল, রাঁধুনী একজন বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।

এতদিন ধরে বিমলা রয়েছে এখানে। কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে সবার ওপর। এ-আশ্রয় তার নিরাপদ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু সব-কিছু গোলমাল হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

রাত্রের রান্না সকাল-সকাল করতে হয়। ছেলেরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই সেদিনও সে ঠিক সময়েই রান্না চড়ালে। ঝি, চাকর, যেমন সাহায্য করে তেমনি করতে লাগল। বিমলা ভাবলে, তাহলে বুঝি এটা কিছুই নয়। এরা জবাব তাকে নিশ্চয়ই দেবে না।

বড় বউ তার ছেলেদের খাবার নিজে এসে নিয়ে যায়। সেদিন কিন্তু সে এল না। তার বদলে এল ছোট বউ। ছোট বউ গরিবের মেয়ে। সংসারেব কাজকর্ম তাকেই বেশী করতে হয়। সেজন্য তার কোনও দুঃখ নেই। মুখে যেন হাসি তার লেগেই আছে।

রান্নাঘরে ঢুকেই সে হাসতে হাসতে বললে, "কই গো বামুন-মা, দিদির ছেলেদের খাবার আজ আমি নিয়ে যাব। আমার ওপর হুকুম হল।"

বিমলা বললে, "নিজেই দেখেশুনে নাও মা, আমার কিছু ভাল লাগছে না।"

ছোট বউ আবার হাসলে। বললে, "কেন বামুন-মা, ভাল লাগছে না কেন বলছ? তুমি বুঝি ভাবছ তোমাকে তাড়িয়ে দেবে? তা আর দিতে হয় না' যে ঠাকুরটা এসেছিল সে মাইনে চাইলে তিরিশ টাকা, তার ওপর ডিম ছোঁবে না। কাপড় দিতে হবে বছরে চারখানা, গামছা চারখানা, চুল কাটার পয়সা মাসে ছ আনা, ধোপা চার আনা, আর পানদোক্তার জন্যে রোজ দু আনা। এই না শুনে বাবা কি বললে জান? বললে, 'ব্যাটা দুদিন বাদে একটি বউ চেয়ে বসবে। তাড়াও ওকে। তার চেয়ে শঙ্করের মা আমাদের ভালই আছে।'"

এই বলে আবার সে ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল।

বিমলার মনটা এতক্ষণ পরে যেন খানিকটা হালকা হল। জিজ্ঞাসা করলে, "কত্তাবাবু এই কথা বললেন? তুমি শুনলে?"

ছোট বউ বললে, "এই দ্যাখো, আমি মিছে কথা বলি? তুমি ত বাবার খাবার দিতে যাবে, তখন না হয় জিজ্ঞেস করো।"

ছোট বউ ঠিকই বলেছিল।

বড়কর্তা কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "দূর পাগ্‌লী' কে তোকে যেতে বলেছে এখান থেকে?"

বিমলার চোখ দিয়ে আবার জল এসেছিল। কথাটার জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু নীচে নেমে এসে দেখে, এক বিপরীত কাণ্ড।

শঙ্কব এসেছে। এসেই জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। "ও কী রে, ওগুলো বাঁধছিস কেন?"

শঙ্কর বললে, "এক্ষুনি আমরা চলে যাব এখান থেকে।"

বিমলা বললে, "কেন বে? এরা ত আমাকে যেতে বলেনি!"

শঙ্কর মায়ের কাছে এগিয়ে এল। বললে, "আচ্ছা মা, তোমার কি লজ্জা-ঘেন্না কিছু নেই? রনার মা তোমাকে কী বলেছে আমি শুনেছি। তুমি চোব? তুমি চুরি কবে আমাকে খাওয়াও? এর পরেও বলতে চাও—তোমাকে আমি এইখানে রাখব? না, আমি এখানে খাব?"

ছেলের এই গর্বোদ্ধত আত্মসম্মানবোধ বিমলাকে যেন সব-কিছু ভুলিয়ে দিলে। বিমলা জিজ্ঞাসা কবলে, "কিন্তু যাবি কোথায় বাবা?"

শঙ্কর বললে, "সেকথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে এসেছি।"

"কি ঠিক করে এসেছিস? থাকবার জায়গা?"

শঙ্কর বললে, "আবার কি ঠিক করব?"

বিমলা বললে, "খাবি কি? আমার কাজ ঠিক করেছিস?"

শঙ্কর বললে, "সে এখন দেখা যাবে। তুমি চল ত!"

বিমলা আবার জিজ্ঞাসা করলে, "খাবি না?"

"আবার খাবার কথা বলছ আমাকে? আমার এক কথা। আমি এ-বাড়িতে একগ্লাস জল পর্যন্ত খাব না। তুমি খাবে ত খেয়ে নিতে পার। আমি খেয়ে এসেছি।"

বিমলা বললে, "গিন্নী-মার কাছে যাই তাহলে একবার। বলে আসি।"

"হ্যাঁ, তুমি যাও, আমি ততক্ষণ গাড়ি ডেকে আনি।"

এই বলে শঙ্কর বেরিয়ে গেল।

বিমলা বললে গিয়ে গিন্নী-মাকে। "কি করব মা, আমার ছেলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে গিন্নী-মা তার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "ছেলে তোমার এরই মধ্যে এমন লায়েক হয়েছে নাকি?"

বিমলা চুপ করে রইল। অনেক দিন এ-বাড়ির অন্ন খেয়েছে বিমলা। ছেলেটা একরকম এই বাড়ি থেকেই মানুষ হয়েছে। যেতে তার কষ্টও হচ্ছে। অথচ না-গেলেও নয়।

গিন্নী-মা ডাকলেন কর্তাকে।

বিমলা বললে, "ডাকতে হবে না মা, আমিই যাচ্ছি। বাবাকে প্রণাম করে আসি।"

বিমলা কর্তার ঘরে ঢুকল তাঁকে প্রণাম করবার জন্যে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে, "আমি তাহলে আসি বাবা। আপনাদের দয়া আমি জীবনে ভুলব না।"

কর্তা অরিন্দম ঘোষাল বহুদর্শী মানুষ। বললেন, "তোমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিয়েছ?"

বিমলা বললে, "আমার আর পাওনা কি বাবা, আপনার অনেক খেয়েছি, অনেক পেয়েছি।"

"না না, তাই কি হয় কখনও? তোমার ছেলেই হয়ত লোকজনের কাছে বলে বেড়াবে—ঘোষাল-বাড়িতে মা আমার কাজ করত, মায়ের পাওনাটা মেরে দিলে। না তা হয় না।"

বলে তিনি তাঁর মোটা ডায়েরি বইটা খুলে বললেন, "তোমার ছেলের পৈতের সময় কালীঘাটে যাবার দিন নিয়েছিলে পঞ্চাশ টাকা। তার আগের দেনা-পাওনা বিশেষ কিছু ছিল না। তারপর তিন টাকা, দু টাকা, এক টাকা,

আবার পাঁচ টাকা—দাঁড়াও আমার সব লেখা আছে, আমি সব হিসেব করে দিচ্ছি।"

পেন্সিল নিয়ে তৎক্ষণাৎ হিসেব করে দিলেন তিনি। বললেন, "তোমার পাওনা হয়েছে তিরিশ টাকা সাত আনা। এই নাও।"

হাতবাক্সটি খুলে তিরিশ টাকা সাত আনা বিমলার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "কাজটা ভাল করলে বলে মনে হচ্ছে না বিমলা। ছেলে তোমার দেখতেই এইরকম বড় হয়েছে, কিন্তু বয়েস ত বেশী নয়। সেই তোমাকেই কারও বাড়িতে কাজ করে ওকে খাওয়াতে হবে। যাচ্ছ, যাও।"

টাকাকটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে বিমলা আবার একটি প্রণাম করলে কর্তাকে। তারপর গিন্নীকে প্রণাম করে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখলে বড় বউ দাঁড়িয়ে আছে দোরের কাছে।

আজই দুপুরে তাকে বলতে কিছু বাকী রাখেনি এই মেয়েটি। বিমলা তবু একবার যাবার সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "চললাম বউমা।"

বড় বউ বললে, "যাও।"

বিমলা দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চট্ করে আবার তাকে থামতে হল। পিছনে শুনলে বড় বউ বলছে, "নিমকহারাম যারা, তারা এমনি করেই যায়।"

নিমকহারাম অপবাদটা বিমলার সহ্য হল না। সেও কিছু কম করেনি এদের জন্যে। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কী বললে বউমা? নিমকহারাম?"

বড় বউ কিন্তু কথাটাকে চাপা দিয়ে দিলে। বললে, "কেন যাচ্ছ তা কি জানি না? কাল সকাল থেকে তুমি আমাকে হাঁড়ি ধরাতে চাও।"

বিমলা বললে, "ছোট বউ থাকতে তুমি আবার কখন হাঁড়ি ধরেছ বউমা?"

সংসারের কাজকর্ম করে ছোট বউ শাশুড়ীর মন নিয়েছে। তাই বড় বউয়ের দু চক্ষের বিষ এই ছোট বউ। অথচ তারই নাম করে বিমলা তাকে খোঁটা দিচ্ছে ভেবে বড় বউ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। শাশুড়ী সামনে যদি বসে না থাকত, ছোট বউযের আজ নিস্তার ছিল না। ছোট বউকে কিছু বলতে না পেরে বিমলাকেই সে মোক্ষম আঘাত দিয়ে বসল। বললে, "হাঁড়ি ছোট বউ ধরবে না আমি ধরব তোমাকে সেসব দেখতে হবে না। তুমি তোমার গুণ্ডা ছেলেটিকে নিয়ে যেখানে যাচ্ছ যাও। শুধু দেখো, যেন বাসন-কোসন কিছু সরিও না।"

বিমলা গিন্নী-মার দিকে তাকিযে বললে, "মা! শুনলেন?"

বড় বউ বললে, "রাজ্যের বাসন হেঁসেলে পড়ে রয়েছে, আমি সেইজন্যে বলছি।"

গিন্নী-মা বললেন, "বড়বৌমা!"

বড় বউ থামবার মেয়ে নয়। বললে, "ওর ছেলের জন্যে একটা থালা একটি বাটি একটা গেলাস ত ও কিনেছে। বলি যাবার সময় সেগুলো ত ও নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আরও দু-চারটে থালা গেলাস চলে যেতে পারে ত?"

বিমলা কেঁদে ফেললে। গিন্নী-মার পায়ের কাছে বসে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এতদিন আছি মা আমি তোমার বাড়িতে, তুমি জান আর ভগবান জানেন, তোমার জিনিস আমি আমার বুক দিয়ে আগলেছি কিনা! আমার ছেলের থালা বাটি আমি এখনও তুলিনি মা, তুমি এস, তোমাকে কষ্ট করে একটিবার আসতেই হবে আমার সঙ্গে। তোমার বাড়ির একটা ছুঁচ যদি আমি নিয়ে যাই ত আমি আমার ছেলের মাথা খাই! আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়!"

এই বলে বিমলা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

গিন্নী-মা বললেন, "কাঁদে না বিমলা। ছি! ওঠ, যা!"

বিমলা ধরে বসল, "না মা, তোমাকে একটিবার আসতেই হবে। তোমার চোখের সামনে আমি বেরিয়ে যাব।"

গিন্নী-মা এবার তাঁর বড় বউয়ের দিকে ফিরে বললেন, "ছি বউমা, বিমলাকে ও-কথা বলা তোমার উচিত হয়নি। আর যাই হোক, ও চোর-ছ্যাঁচড় নয়।"

বড় বউ বললে, "হতেই-বা কতক্ষণ মা! ছেলে যার সাইকেল চুরি করে বাড়ির সামনে কেলেঙ্কারি করতে পারে, তার মা দুটো বাসন চুরি করবে তাতে আর আশ্চয্যি কি?"

ঠিক এমনি সময়ে শঙ্কর এসে দাঁড়াল। বললে, "মা, নীচে যাও।"

সে যে ঠিক এই সময়ে এসে দাঁড়াবে কেউ তা ভাবতে পারেনি। দোরের কাছে রিক্‌শা দাঁড় করিয়ে সে উপরে উঠে এসেছিল কর্তা-গিন্নীকে প্রণাম করবার জন্যে। মার কান্না শুনে সিঁড়ির আড়ালে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর বড় বউয়ের মন্তব্য শুনে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। রাগে তার আপাদমস্তক রিরি করছিল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শঙ্কর ঢিপ করে মাটিতে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম করলে গিন্নী-মাকে।

গিন্নী-মা বললেন, "বেঁচে থাক! মানুষ হও!"

ছেলেকে দেখে বিমলা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

শঙ্কর বড়কর্তার ঘরে ঢুকল প্রণাম করবার জন্যে। ঘোষালমশাই ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দেখতে পাননি শঙ্করকে। পায়ে হাত ঠেকতেই চমকে তাকালেন কাগজটা নামিয়ে। বললেন, "চললে? কোথায় যাচ্ছ?"

"গাছতলায়।"

বলেই শঙ্কর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বিমলা তখনও গিন্নী-মার কাছে দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা, চল।"

বিমলা গিন্নী-মাকে ডাকলে, "মা, এস।"

গিন্নী-মা বললেন, "কী যা-তা বলছিস, যা।"

শঙ্কর বললে, "বড় মামীমা বড়লোক, আমরা গরিব। উনি আমাদের চোর, ডাকাত, যা-খুশি বলতে চান বলুন। তুমি এস।"

বড় বউ বললে, "শুনলে মা? ছেলেটার কথা শুনলে? আমরা বড়-লোক।"

কথাটার জবাব দিলেন না গিন্নী-মা। তাইতে আরও রাগ হল বড় বউয়ের। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চোরকে চোর বলব না তো কী বলব রে ছোঁড়া?"

শঙ্কর তার মাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল বারান্দার ওপর দিয়ে। বড় বউয়ের কথাটা শুনে শঙ্কর থমকে থামল। তাকে শুনিযে শুনিয়ে বললে, "মা, অনেকক্ষণ থেকে শুনছি উনি বলছেন আমরা নাকি ওঁদের বাসন চুরি করে নিযে যাব। তুমি এক কাজ কর মা, আমাদের বাসন বলতে ত আমার একখানা থালা, বাটি আর গ্লাস, আর তোমার একটা ঘটি। ওগুলো তুমি এইখানে রেখে যাও। বড়মামীর অনেকগুলো ছেলে, ওঁর কাজে লাগবে।"

"কী বললি?"

রেগে টং হয়ে বড় বউ চিৎকার করে এগিযে যাচ্ছিল শঙ্করের দিকে। কিন্তু যেতে তাকে হল না। শঙ্কর যে-ঘরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই ঘরটাই বড় বউয়েব ঘর। ঘরের দরজাটা ছিল বন্ধ। হঠাৎ সেই বন্ধ দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল বড় বউয়ের স্বামী—অরিন্দম ঘোষালের বড ছেলে নিবারণ ঘোষাল। খালি গা, পরনের ধুতিটা লুঙিগর মত করে পরা, খেয়ে দেয়ে বোধকরি শুয়ে পড়েছিল সে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই সে কিন্তু এমন একটা কাজ করে বসলো—যার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই সে শঙ্করের গলাটা চেপে ধরে দেয়ালের গায়ে ঠাই করে তার মাথাটা ঠুকে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আর বলবি? যা বললি আর বলবি?"

শঙকরও রুখে দাঁডিয়েছিল এর জবাব দেবার জন্যে, কিন্তু যে-লোকটির সুমুখে জীবনে সে কোনদিন মুখ তুলে তাকায়নি, তাকে আঘাত সে দেবে কেমন করে?

কিছুই সে বলতে পারলে না, চোখ দিয়ে শুধু দর দর করে জল গড়িয়ে এল, আর নিবারণ তাব লোহার মত সরু সরু হাতদুটো দিয়ে বীরবিক্রমে নিরীহ সেই ছেলেটার ওপর সমানে তার শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল।

বিমলা গিন্নী-মার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "ছাড়িয়ে দিন মা, বড়বাবুকে বারণ করুন!"

বুড়ো বাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে। ছেলেকে বলতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না, তবু বললেন, "নিবারণ, ছেড়ে দে!"

নিবারণ বললে, "তুমি থাম। ওর এত বড় আস্পর্ধা—"

বলেই সে দুম করে তার একটা পা চালিয়ে দিলে শঙ্করের পেটের ওপর।

'মা' বলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে শঙ্কর একেবারে দুমড়ে গিয়ে পড়ল ছোটবাবুর দরজার কাছে। পেটে হাত দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে ঘরের চৌকাঠটা ধরে সে সামলে নিলে।

কিন্তু ধন্য নিবারণের রাগ। হাত দুটো বোধহয তার ভেরে গিয়েছিল। তাই সে আবার পা বাড়িয়ে তাকে মারতে গেল। কিন্তু লাথিটা গিয়ে পড়ল আর-একজনের পিঠে। ছোট বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুহাত বাড়িয়ে শঙ্করকে তখন জড়িয়ে ধবেছে।

নিবারণ চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দাও ছোট বউ।"

ছোট বউ ছাড়লে না, জবাবও দিলে না, শঙ্করকে জড়িয়ে ধরে ভাসুরের কাছ থেকে আড়াল করে হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলে, "খুব লেগেছে?"

শঙ্করের সমস্ত যন্ত্রণা যেন নিমেষেই জল হয়ে গেল। ছোট বউয়ের মুখের দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যে-মুখে হাসি ছাড়া আব-কিছু সে কোনদিন দেখেনি, আজ দেখলে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি সহানুভূতিতে কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছে, আর টানা টানা বড় বড চোখ দুটি তার জলে ছলছল করছে।

"চল।" বলে শঙ্করকে ধরে ধরে ছোট বউ সিঁড়ির দিকে এগিযে গেল। বিমলাও তাদেব পিছু ধবলে।

বড় বউ বললে, "এই ছোট বউ আমাদের মুখ যদি না পুডিযে দেয় ত কী বলেছি!"

কথাটা সে সবাইকে শুনিয়ে শুনিযেই বলেছিল। ছোট বউও কথাটা শুনলে। ভেবেছিল জবাব দেবে না, কিন্তু জবাব না দিয়ে পারলে না। সিঁড়ির মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "না দিদি, অত সাহস আমার নেই। আমি গরিবের মেয়ে।"

বড় বউ দুম-দুম করে নিজেব ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তার স্বামী তখন এক হাতে দোরের চৌকাঠ ধরে আর এক হাত কোমবে দিয়ে ক্লান্ত হযে হাঁপাচ্ছিল। বড় বউ বললে, "যা বলেছিলাম, সত্যি কিনা দ্যাখো।"

বলেই সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘোষাল-বাড়ি ছেড়ে চলে এল শঙ্কর তার মাকে নিয়ে। আসবার সময় নিজের বাসন ক'খানি সত্যিই সে রেখে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ছোট বউ রাখতে দেয়নি। নিজের হাতে তাদের কাপড়ের পুঁটলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

পরিচ্ছন্ন একটি বস্তির এক টেরে ছোট্ট একখানি ঘর। ঘরের পাশেই একটু রান্নার জায়গা। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ।

নতুন একটি লণ্ঠন পর্যন্ত কিনে রেখে গিয়েছে শঙ্কর। ঘরের ভিতর দুটো চৌকি পাতা। মাটির একটি নতুন কলসীতে জল পর্যন্ত তোলা রয়েছে।

"ওমা, এ যে বেশ ঘর। কত ভাড়া? এত পয়সা তুই পেলি কোথায়?"

শঙ্কর এসেই একটা চৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। মার কথার কোনও জবাবই দিলে না। বিমলাও আর ভরসা করলে না তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে। একটি একটি করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল।

চৌকির ওপর বিছানাটা পেতে দিয়ে বিমলা ডাকলে, "শঙ্কর, তুই এইখানে এসে শো। আমি ততক্ষণে তোর বিছানাটা পেতে দিই।"

শঙ্কর উঠে গেল আর-একটা চৌকিতে। ঘোষাল-বাড়ির অপ্রীতিকর স্মৃতিটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আর ভুলতে পারছে না তাদের সেই ছোট বউকে। বড়বাবু কী মারটাই না তাকে মারলে! সে মারের জবাব সে দিতে পারত। সে শক্তি ছিল তার শরীরে। কিন্তু জবাব দেওয়া দূরে থাক, একটি কথাও সে বলেনি।

বড়বাবু চিৎকার করে বলেছে, 'ছোট বউ, ছেড়ে দাও ওকে!' ছোট বউ সেকথা গ্রাহ্য করেনি। আরও জোরে সে তাকে চেপে ধরেছে। তারপর চোখের জল মুছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, তার লেগেছে কিনা।

অনাত্মীয়া এই হাস্যাধরার করুণাঘন যে মাতৃমূর্তি সেদিন সে দেখেছে তেমনটি আর দেখেনি কোনদিন। তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, বিহ্বল করে দিয়েছে।

তাই সে ছোট বউকে ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

ভুলতে পারছে না—রিকশায় চড়ে তারা চলে আসছে, মা ও ছেলে। যতবার সে পিছনে ফিরে তাকিয়েছে, দেখেছে, ছোট বউ দাঁড়িয়ে আছে সদর দরজার কাছে।

এই নিয়ে তাকে অপবাদ দিয়েছে বাড়ির বড় বউ। চরিত্রে কলঙ্কের ইঙ্গিত করেছে। ছোট বউ তার জবাব দিয়েছে, 'অত সাহস আমার নেই দিদি। আমি গরিবের মেয়ে।'

বিমলা বললে, "তোর জন্যে চারটি রান্না করে দেব শঙ্কর?"

শঙ্কর বললে, "আমি খেয়েছি মা। তুমি বিশ্বাস কর—আমি খেয়েছি।"

সারারাত মা আর ছেলে পাশাপাশি দুটো চৌকির ওপর শুয়ে। বিমলার চোখে ঘুম নেই। কতবার সে ভেবেছে—শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে, তাদের চলবে কেমন করে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি।

শেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে হৈ-হৈ করে ছেলের দল এসেছে শঙ্করকে ডাকতে।

শঙ্কর একটা কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসেছিল সংসারে কি কি আনতে হবে তার হিসেব করতে। মা তাকে বলে বলে দিচ্ছিল।

ছেলেরা আসতেই শঙ্কর কাগজ-পেন্সিল নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলেদের ভিতর একজনকে ডাকলে, "ভবেশ!"

ভবেশ এসে দাঁড়াতেই শঙ্কব হুকুম করলে, "মাকে জিজ্ঞেস করে কি কি আনতে হবে লিখে নিয়ে তুই বাজার চলে যা।"

এই বলে দশ টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে শঙ্কর বললে, "আমি আসছি, মা।"

"কখন আসবি?"

"এসে খাব।"

শঙ্কর বেরিয়ে যেতেই ভবেশ বললে, "বলুন মা, কি কি আনতে হবে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি কর ভবেশ?"

ভবেশ বললে, "আমরা কাজ করি, মা।"

"কী কাজ বাবা?"

ভবেশ বললে, "ক্লাবের কাজ।"

"সে আবার কি রকম কাজ?"

ভবেশ বললে, "জিমনাসিয়াম্ কাকে বলে জানেন?"

বিমলা বললে, "না বাবা।"

"তাহলেই ত বেগড়্বাঁই। শঙ্করদাকে জিজ্ঞেস করবেন সে ঠিক বুঝিয়ে দেবে। আপনি বলুন কি কি আনতে হবে।"

কিন্তু ভবেশ কি করে, সেকথা জানবার জন্যে বিমলা ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এই সূত্রে বিমলা জানতে চায় তার শঙ্কব কী করে। তাই বাজারের ফর্দ করবার আগে বিমলা জিজ্ঞাসা করে বসল, "শঙ্করও কি ওই একই কাজ করে নাকি?"

ভবেশ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বিমলার মুখেব পানে তাকিয়ে বললে, "বা বা বা, আপনি দেখছি ঠিক আমার মায়ের মতন। শঙ্করদাই ত আমাদের সব। আমাদের বোসবাগান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।"

এই বলে সে আর সময় নষ্ট করতে চাইলে না।

ফর্দ নিয়ে বাজার করতে চলে গেল।

বোসবাগান ক্লাব বেশীদিনের ক্লাব নয়। এর একটু ইতিহাস আছে।

এই পাড়াতেই বহুকালের পুরনো একটা প্রকাণ্ড বাড়ি—অনেকদিন থেকে পোড়ো বাড়ির মতন পড়ে ছিল। ঘরগুলো জরাজীর্ণ। দরজা জানলা একটিও নেই। আগাছার জঙ্গল আর ইটের গাদা। লোকজন সেখানে বাস করা দূরে থাক, দিনের বেলাতেও সাপের ভয়ে কেউ ওপথ দিয়ে হাঁটত না। তারই একটা নীচের ঘর পরিষ্কার করে নিয়ে পাড়ার কতকগুলো ছেলে ছেঁড়া চট আর চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে গুলতানি করত। সবাইকে বলত, আমরা ক্লাব করেছি ওখানে। ক্লাবের নাম পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল, 'উত্তর কলিকাতা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ।'

পাড়ার মুরুব্বি-মাতব্বরেরা বলতেন, "'সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ' না ছাই, ওর নাম দেওয়া উচিত 'উচ্ছন্ন মন্দির'।"

নিজের বাড়ির ছেলেদের বারণ করতেন, "যাসনে বাবা ওখানে। কোন্‌দিন সাপে কামড়ে দেবে। ওই পোড়ো বাড়িটায় অন্তত শতখানেক গোখরো সাপ বাস করে।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

সে-বছর চারিদিকের জঙ্গল সাফ করে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে ছেলেবা সেখানে সরস্বতী প্রতিমা এনে পুজো পর্যন্ত করে ফেললে। পুজোর দিন বিকেলে বুড়ো-গোছেব একজন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ কবে এনে একটা সাহিত্য-সভা করবাব মতলব তাদের ছিল, কিন্তু সভাটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। গজা ছিল পুজো-কমিটির ক্যাসিয়ার। চাঁদার টাকাটা থাকত তারই হেফাজতে। পুজোটা কোনোরকমে চুকে যাবার পরেই সে বলে দিলে, "মনিব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে।"

গজার কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। কত কষ্টে আদায় করা চাঁদার দরুন নগদ ষাট টাকা বারো আনা ছিল তার কাছে। সবাই ভেবেছিল, পুজোর পরদিন ভাল করে একটা 'ফিস্ট' করবে। গজা দিলে সব মাটি করে।

দুটো দল হয়ে গেল। গজার একটা, হবার একটা। হরার দল বললে, "টাকাটা গজা মেরে দিয়েছে।" আর গজার দল বললে, "হরাই চুরি করেছে মনিব্যাগটা।"

প্রথমে কথা কাটাকাটি। তারপর মারামারি।

হরা সবাইকার সামনে গজাকে একটা চাঁটি মেরেছিল। গজা তার প্রতিশোধ নিলে সবার অসাক্ষাতে।

হরা একদিন গিয়েছিল বেলঘরিয়া—তার বোনের বাড়ি। ফিরতে রাত্রি

হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পথের মাঝে কে যে তাকে এমন করে মেরে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে গেল কেউ বলতে পারলে না। বাড়িতে খোঁজাখুঁজি, কান্নাকাটি পড়ে গেল। দুদিন পরে খবর এল, হরা হাসপাতালে।

দশদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে হরা বললে, পিছন থেকে কে যে তার মাথায় বাড়ি মেরে ছিল সে বুঝতে পারেনি। তবে সে যে গজা ছাড়া আর কেউ নয়—তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই।

সবাই বললে, "গজার নামে নালিশ করে দে আদালতে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালেই তোকে বলতে হতো—গজাকে তুই দেখেছিস।"

হরা শুধু হেসেছিল একটুখানি।

তারপর একদিন দেখা গেল, হরাদের বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে শোনা গেল তারা নাকি কালীঘাটে বাড়ি ভাড়া করেছে।

সে আজ অনেকদিনের কথা। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি।

সেই থেকে 'উত্তর কলিকাতা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘে'র নাম আর কেউ শুনতে পায়নি। পোড়ো বাড়িটাব চারদিকে আবার আগাছার জঙ্গল উঠেছিল, আর ছেলেদের সেই আড্ডা-ঘরখানা দখল করেছিল একটা ধর্মের ষাঁড়।

কিছুদিন পরেই বোসবাগানেব জমিদার বৃদ্ধ গণপতি সরকার লোকজন নিয়ে একটা রিক্‌শা চড়ে এসে দাঁড়ালেন সেই পোড়ো বাড়িটার সুমুখে। হুকুম হয়ে গেল বাড়িটা ভেঙে একেবারে সমতল করে দিয়ে ভাড়া দেবার জন্যে ছোট ছোট খুপ্‌রি করে দেওয়া হোক।

কথাটা গজার কানে গেল।

গজা তখন গজেনবাবু। দশটার সময় খেয়েদেয়ে কোথায় কোন্ আপিসে বেরোয়, ফিবে আসে সন্ধ্যায়। কিন্তু সেদিনটা ছিল রবিবার। গজা তার বাড়ির বকে বসে বিড়ি টানছিল, পাডার একটা ছেলে এসে খবব দিলে, তাদের ক্লাব-ঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

ক্লাব-ঘরের অস্তিত্ব তার অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবু চাঁদা আদায কবে ক্লাব চালানোর মহিমা এখনও সে ভুলতে পারেনি। চট্ করে বিড়িটা ফেলে দিয়ে হাতকাটা শার্টটা গায়ে চড়িয়ে চটি পবে গজা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল বুড়ো গণপতি সরকারের কাছে। হাত দুটো তুলে চট্ করে একটা নমস্কার করে গজা বললে, "বাড়িটা ভেঙে ফেলছেন স্যাব?"

গণপতি বললে, "হ্যাঁ বাবা, এইখানে একটা নতুন বাড়ি হবে।"

গজা বললে, "ভালই হবে। আমাদের উত্তর কলিকাতা সংস্কৃতি সঙ্ঘের জন্যে একখানা ঘর কিন্তু দিয়ে দেবেন। এখন থেকে বলে রাখছি।"

মুখটা কাঁচুমাচু করে গণপতি বললেন, "সংস্কৃত টোল? কত ভাড়া দিতে পারবে?"

গজা বললে, "ভাড়া কী বলছেন? এই ভাঙা ঘরে আমরা পাঁচ বছর ক্লাব চালিয়েছি, সরস্বতী পুজো করেছি—"

গণপতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। বললেন, "ও। কেলাব্ করবে?"

গজা বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

গণপতি বললেন, "না বাবা। এখানে কেলাব-ফেলাব হলে আমার ভাড়াটে থাকবে না। আমি ভাড়া দেবার জন্যে বাড়ি তৈরি করছি।"

গজা বললে, "বেশ ত, ভাড়া আপনি আমাদের কাছ থেকেও নেবেন।"

গণপতি বললেন, "না বাবা, কেলাবে তোমরা নাচানাচি দাপাদাপি করবে, আমার ভাড়াটেরা থাকতে চাইবে না। ও-সব হবে না, যাও।"

গজা বেশী কথা বলবার লোক নয়। বললে, "তাহলে দেবেন না আপনি?"

"না।"

বলেই তিনি রিক্শায় ওঠবার জন্যে পা বাড়ালেন।

গজা বললে, "টাকাগুলো আপনার জলে ফেলবেন স্যার। নতুন বাড়িও আপনার অমনি পোড়ো বাড়ি হয়ে থাকবে।"

গণপতি রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, "কেন?"

গজা বললে, "পরে বুঝতে পারবেন।"

"ভয় দেখাচ্ছ?"

গজা বললে, "কী যে বলেন স্যার, আপনাকে ভয় দেখাতে পারি কখনও? সারা জীবন ধরে চড়া সুদে বন্ধকী কারবার করেছেন আপনি, লোকজন ত আপনার ভয়েই অস্থির, আপনাকে ভয় দেখাবে কে?"

গণপতি তাড়াতাড়ি রিক্শায় চড়ে বসলেন। বললেন, "চালাও।"

রিক্শা চলবার আগে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন, "এটা মগের মুল্লুক নয়। ইংরেজের রাজত্ব।"

গজা সবিনয়ে একটি নমস্কার করে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।"

সেই গণপতি সরকারের বাড়ি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন একদিন তিনি বাড়ি ফিরলেন ট্যাক্সি করে। রোজ সন্ধ্যায় তিনি স্বাস্থ্যলাভ করবার জন্য গঙ্গায় যান। লাঠি হাতে নিয়ে খানিকটা পায়চারি করেন। জেটির ওপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন।

ট্যাক্সি থেকে নেমে সেদিন কিন্তু তিনি নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দোতলায় উঠতে পারলেন না। চাকর এসে তাঁকে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে গেল। গিয়েই শয্যা গ্রহণ করলেন। হাঁটুতে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা।

একমাত্র পুত্র সুরপতি সরকার তখন তার বন্ধুদের নিয়ে রাজনীতি চর্চা করছিল। চাকর এসে খবর দিলে, "বাবা ডাকছেন।"

সুরপতি বললে, "আমি এখন যেতে পারব না। কি দরকার জিজ্ঞেস করে এস।"

চাকর আবার এসে বললে, "বাবুর খুব অসুখ। আপনি একবার আসুন।"

সুরপতি খুব বিরক্ত হল। বললে, "অসুখ না ছাই! কোনও বন্ধকী বাড়ি হয়ত হাতছাড়া হয়ে গেল।"

বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল। তাদেরই ভিতর কে একজন বললে, "এই বন্ধকী করে করেই ত লাখ-পঞ্চাশেক রেখে যাবে তোমার জন্যে।"

সুরপতি গিয়ে দেখলে, একজন ঝি তার বাবার পায়ে গরম চুন-হলুদ লাগাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে, "কী হল?"

যন্ত্রণায় কথা কইতে পারছিলেন না তিনি। অতিকষ্টে বললেন, "পড়ে গেলাম।"

"পড়ে গেলেন ত চুন-হলুদ কেন, একটা ডাক্তার ডাকলেই ত পারতেন!"

গণপতি বললেন, "তোমাদের সেই এক কথা! ডাক্তার! ডাক্তার! ব্যাটারা টাকা খাবার যম। ডেকেছ কি, আট টাকা, তার চেয়ে বড় হলে ষোল টাকা। তার ওপর ওষুধ আর ইনজেক্সানের ঠেলায় অস্থির।"

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "ডেকেছিলেন কী জন্যে?"

গণপতি বললেন, "বলছিলাম কি, বোসবাগানে যে-বাড়িটা তৈরি হল, ওর একখানা ঘর ওই পাড়ার ছেলেগুলোকে দিও। ভাড়া নিও না। ছোঁড়াগুলো ভারী বজ্জাত।"

গণপতি সরকারের সেই শয্যাই হয়েছিল অন্তিমশয্যা। হাঁটুতে চুন-হলুদ-লেপা অবস্থাতেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। জ্ঞান যতক্ষণ ছিল, ডাক্তার ততক্ষণ তিনি আসতে দেননি।

শেষ পর্যন্ত সুরপতি টেলিফোন করে একজন ডাক্তারকে আনিয়েছিল। ষোল টাকা ফিও তিনি নিয়েছিলেন, দামী দামী কয়েকটা ইনজেক্সানও দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আর কিছুতেই কিছু হয়নি। টিটেনাসেই তিনি মারা গেলেন।

পিতাব শেষ আদেশ সুরপতি কিন্তু পালন করেছিল।

বোসবাগানে গিয়ে নতুন বাড়ির একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে ছেলেদের বলেছিল, "এই ঘরে তোমবা ক্লাব করবে।" আর খানিকটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, "এইখানে হবে প্যারালেল বার, জিমনাস্টিক আর কুস্তির আখড়া। কিন্তু মনে থাকে যেন, শরীরচর্চা করতে হবে সবাইকে। নইলে শুধু নাচ-গান আর থিয়েটার করবার জন্যে আমি ক্লাব-ঘর দেব না।"

গজা আপিস থেকে ফিরেই শুনলে এই সুসংবাদ। মনে মনেই একটু হাসলে। বললে, "ভেবেছিলুম, মিছেই লেঙ্গি মারলাম বুড়োকে। যাক, কাজ হয়েছে।"

বলেই সে ছুটল সুরপতির বাড়িতে। সুরপতির সঙ্গে দেখা করে বললে, "কালই আমি জিমনেসিয়াম খুলে দিচ্ছি স্যার। আপনার যখন যা দরকার হবে আমাদের বলবেন। আমরা করে দেব।"

এই নর্থ ক্যালকাটা জিমনাসিয়ামের প্রথম ছাত্র শঙ্কর।

ছাত্র অবশ্য জুটেছিল অনেকগুলি। কিন্তু মাসে চার আনার বেশী চাঁদা দেবার ক্ষমতা কারও নেই। কাজেই অন্য জিমনাসিয়াম থেকে উপদেষ্টা হয়ে যিনি এলেন তার মাইনে দেওয়াই মুশকিল হয়ে উঠল।

গজা সুরপতির কাছে গিয়ে হাত পাতলে। দু'-চার মাস সুরপতি দিলে কিছু কিছু। গজা তার কিছুটা রাখলে নিজে, কিছুটা দিলে জিমনাসিয়ামে। তারপর সুরপতি একদিন জবাব দিয়ে দিলে। বললে, "আমি দিতে পারব না। ক্লাব আমার নয়। তোমাদের।"

গজার কিন্তু মতলব ছিল অন্যরকম। মাসে মাসে চাঁদা আদায় হবে দু'শ চার'শ, বড়লোকের ছেলেরা মেম্বার হবে, মুক্ত হস্তে দান করবে, মেয়েদের নাচ হবে, গান হবে, থিয়েটার হবে। মাসে একটা-দুটো ফাংশান করবে, টিকিট বিক্রি হবে হাজার দেড় হাজার টাকার, তবে ত ক্লাব চালিয়ে সুখ! তা না, ছেলেরা কুস্তি লড়ে পালোয়ান হবে, দেশ উদ্ধার করবে, আর আমি ব্যাটা টাকার ভাবনায় পাগলের মত ছুটে বেড়াব। গজা একদিন শঙ্করকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "এর মধ্যে আমি নেই। পারিস ত তুই চালা।"

শঙ্কর বললে, "আমি কি পারব চালাতে?"

গজা বললে, "দ্যাখ না চেষ্টা করে। না পারিস না পারবি।"

"কী করব তখন?"

গজা বললে, "যার ঘর তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলবি—এই রইল তোমার ঘর। আমি চললাম।"

চলে অবশ্য শঙ্কর গেল না। গেল গজা।

আপিসের কাজে তাকে বোম্বাই চলে যেতে হল।

যাবার সময় বলে গেল শঙ্করকে, "মেয়েছেলে রইল বাড়িতে, দেখিস। দরকার হলে দু-দশ টাকা দিস।"

শঙ্কর সায় দিয়েছিল তার মাথাটি ঈষৎ কাত করে।

একদিকে ক্লাব চালাবার দায়িত্ব, আর একদিকে গজার সংসার। টাকা অবশ্য সে পাঠাবে বোম্বাই থেকে, কিন্তু হয়ত-বা তা যৎসামান্য।

কী করে কি করবে, শঙ্কর ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। তখন তার বয়সই-বা কত!

গজা যাবার আগে বলেছিল, "মাথাটা কাত করিস না কোথাও, আর ভয় করিস না কাউকে।"

ঠিকই বলেছিল গজা, কিন্তু একটা কথা বলতে ভুলেছিল।

নির্ভয় হতে হলে সত্যাশ্রয়ী হতে হয়। সত্যকে ছুঁয়ে থাকলে ভয় তার পাশ ঘেঁষতে পারে না।

কিশোর বালক শঙ্কর। কুড়ির কাছাকাছি বয়স, সুন্দর সুগঠিত দেহ, নিষ্পাপ নিষ্কলুষ মুখচ্ছবি, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সহায় সম্বল-হীন অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের এই প্রথম সংগ্রামে। ইস্কুলে যাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেল। মার কাছে খায়-দায় আর দিবারাত্রি ঘুরে বেড়ায়। যেমন করে হোক, ক্লাবটিকে তার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে শঙ্কর, ক্লাবে ডেকে আনে তাদের, টাকা-পয়সা আদায় করে, কোন রকমে ক্লাবের খরচ চালায়।

ওদিকে গজার বাড়িতে গিয়ে দেখে, বাচ্চা ছেলেটার অসুখ, টাকা যা এসেছিল খরচ হয়ে গেছে, ডাক্তাব দেখাবাব পয়সা নেই। পকেটে যা ছিল, শঙ্কর উজাড় করে ঢেলে দিয়ে এল সেইখানে।

ক্লাবে তখন ছেলেরা বসে আছে হাত গুটিয়ে। জিমনাস্টিকের মাস্টারের পনেরটি টাকা বাকী। টাকা না পেলে তিনি কাজ করবেন না।

শঙ্কর আসতেই মাস্টার বললে, "টাকা দাও।"

শঙ্কর বললে, "আজ দিতে পারব না।"

"আজই ত দেবে বলেছিলে।"

"বলেছিলাম। কিন্তু খরচ হয়ে গেছে। টাকা নেই।"

"নেই বললে আমি শুনব না। টাকা আমার চাই-ই।"

শঙ্কর বললে, "মিছে কথা আমি বলি না। আমি বলছি টাকা নেই।"

মাস্টার শুনবে না কিছুতেই। ভদ্রলোক সেই এক জিদ ধরে রইল। শঙ্করের অসহ্য হয়ে উঠল। মুখ তুলে বললে, "কী করতে চান আপনি?"

লোকটা ধাঁ করে একটা চড় মেরে বসল শঙ্করের মাথায়। —"কী করতে চান আপনি? আমাকে চোখ রাঙানো হচ্ছে? এঁচড়ে পাকা ছেলে!"

শঙ্কর থর থর করে কাঁপছে।—"বলা শেষ হয়েছে?"

"আবার?" বলেই লোকটি শঙ্করের গালের ওপর মারলে আর-এক চড়!

শঙ্কর এবার আর চুপ করে থাকতে পারলে না। প্রাণপণে একটি ঘুঁষি চালিয়ে দিলে ভদ্রলোকের মুখে। মেরেই ঠিক বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার

ওপর। এলোপাথাড়ি ঘুঁষি চালাতে চালাতে শঙ্কর তাকে যখন ঘরের বাইরে বের করে দিলে, দেখা গেল, লোকটির মুখ দিয়ে কাঁচা রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছে, আর সেই রক্তে তার সাদা জামাটা হয়ে গেছে লাল।

ভদ্রলোক হেঁটমুখে বসে পড়ল বাইরে গিয়ে। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা দাঁত বোধহয় ভেঙে গেছে।

একটা ছেলেকে কাছে ডেকে শঙ্কর বললে, "এক মগ জল এনে দে।"

বলেই সে তার গায়ের জামাটা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, "চলে এস তোমরা। আজ থেকে আমি তোমাদের শেখাব।"

জল দিয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে লোকটি সেই যে সেখান থেকে উঠে চলে গেল, আর কোনদিন সে এ-পথ মাড়াল না।

সকাল বিকেল শঙ্কর নিজেই শেখাতে লাগল সবাইকে। অনেকেই শঙ্করের চেয়ে বয়সে বড়, তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হল না। বিপদ হল শুধু বড়লোকের ছেলেদের নিয়ে। মুগুর, ডাম্বেল, স্প্রিং, ওয়েট, সবই তাদের কাছে ভারী বলে মনে হয়, কেউ কেউ গাযের জামা খুলতে চায না। আবার কেউ কেউ বলে, গায়ে মাটি মেখে কুস্তি লড়তে তারা পারবে না। বাড়ির দারোয়ান-গুলো দেখতে পেলে হাসবে।

একে একে সব পালিয়ে যেতে লাগল।

অথচ এই বড়লোকের ছেলেরাই ছিল শঙ্করের একমাত্র ভরসা।

সারা ভারতবর্ষে তখন আগুন জ্বলছে। ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে সকলেই কৃতসঙ্কল্প।

শঙ্কর তারই সুযোগ গ্রহণ করলে। একজন সাহিত্যিকেব কাছে গিযে ভাল করে একটি বিজ্ঞাপন লিখিযে আনলে।—বাঙালী নির্বীর্য, বাঙালী বল-হীন, বাঙালী কাপুরুষ, বাঙালী শুধু কেরানীর জাত। জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত প্রয়োজন। তোমরা সব দলে দলে চলে এস আমাদের ক্লাবে। তিনমাসে তোমাদের চেহারা ফিরিয়ে দেব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

'নর্থ ক্যালকাটা জিমনাসিয়াম', 'উত্তর কলিকাতা শক্তি মন্দির' এ-সব নাম তার পছন্দ হল না। তাই শঙ্কর তার ক্লাবের নতুন নামকরণ করলে—'বোসবাগান ক্লাব।'

কাজ যে কিছু হল না তা নয়।

নতুন কিছু ছেলে এসে ভর্তি হল। সব গরিবের ছেলে। মাসিক বেতন চার আনার জায়গায় এক টাকা করলে, তবু সে তার ছাপাখানাব বিল মেটাতে পারলে না। নতুন সাইন বোর্ডের টাকাটা দিতেই সব ফুরিয়ে গেল।

এমন দিনে গজা এল। তার চাকরির জায়গা থেকে দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে।

শঙ্কর অবাক হয়ে গেল তার মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, "এ কী চেহারা হয়েছে গজাদা? রোগা হয়ে গেছ, কুঁজো হয়ে গেছ, চোখে চশমা নিয়েছ। মনে হচ্ছে এই ক'মাসে বয়েস যেন তোমার অনেক বেড়ে গেছে। বোম্বাই থেকে আসছ?"

গজা বলল, "না রে ভাই, চরকির মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সারা দেশটা। চাকরি আবার মানুষে করে!"

শঙ্কর বললে, "ভালই ত! কত দেশ দেখলে!"

গজা বললে, "দেশ দেখে আমার লাভ ত হল খুব। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরিয়ে এলাম। যা খাই কিছুই হজম হয় না।"

শঙ্কর টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বলে উঠল, "কাল থেকে লেগে যাও এইখানে। দুদিনে তোমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ভাল হয়ে যাবে।"

গজা বললে, "না রে না, দু-দশদিনেব কম্ম নয় আমি জানি। দশদিনের ছুটি পেয়েছি, দশদিন পরেই ছুটতে হবে মেদিনীপুরে। তিরিশটে টাকা দে দেখি। তুই তিনমাস কিছু দিসনি আমার বাড়িতে।"

শঙ্কর মাথায় হাত দিয়ে বসল। বললে, "কি কষ্টে যে ক্লাব চালাচ্ছি তা ভগবান জানেন, গজাদা। হাজাব-পাঁচেক হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়েছিলাম। ছাপাখানার পঁচিশটে টাকা এখনও দিতে পারিনি।"

কথাটা গজা বিশ্বাস করলে বলে মনে হল না। বললে, "যাঃ, গুল মারবার আব জায়গা পেলি না? মাইনে করেছিস এক টাকা, মাস্টারগুলোকে মেরে তাড়িয়েছিস, আমার দেওয়া নামটা পর্যন্ত বদলে দিয়ে চক্‌চকে নতুন সাইন-বোর্ড টাঙিয়েছিস, আমি সব বুঝি। তোর হাতে ক্লাবটা ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি।"

এই বলে গজা উঠে চলে গেল।

শঙ্কর কিছুক্ষণ বসে রইল মাথায় হাত দিয়ে। তারপর ভাবলে ভালই হল, কাল সকালে এসেই সে গজাদার হাতে তার ক্লাবটিকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

পরের দিন সকালে এসেই দেখে, সুরপতি সরকার দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাব-ঘরের সামনে। সঙ্গে গজা।

গজা বললে, "এ-ই শঙ্কর।"

শঙ্কব সুবপতিকে চেনে, কিন্তু সুরপতি বোধকরি এই প্রথম দেখলে শঙ্করকে।

সুরপতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। চোখ যেন আর ফেরাতে পারে না! কিন্তু কিছু না বলে কারও দিকে তাকিয়েই-বা থাকে কেমন করে? জিজ্ঞাসা করলে, "ক্লাবটা কি তুমি ভাল চালাতে পারছ না?"

শঙ্কর প্রথমে বলতে চাচ্ছিল না। কিন্তু গজা রয়েছে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কাজেই বলতে বাধ্য হল। বললে, "আজ্ঞে না, ভাল চলছে না।"

গজা বললে, "তার চেয়ে আমি বলি কি, তুই ছেড়ে দে। আমরা অন্য লোক দেখি। আমি ত এখানে থাকতে পারছি না, নইলে আমার ক্লাব আমিই চালাতাম।"

শঙ্কর বললে, "আজ আমি সেই কথা বলতেই এসেছিলাম। আসি তাহলে। নমস্কার।"

শঙ্কর যে এত সহজে ছেড়ে চলে যাবে, গজা তা ভাবেনি। যাক, ভালই হল, যে-কদিন সে কলকাতায় আছে, নিজে দেখাশোনা করে সবকিছু ঠিক করে দিয়ে যাবে।

কিন্তু দেখাশোনা করতে গিয়ে দেখে, খাতায় মাত্র তিরিশজনের নাম। তিরিশজন মানে তিরিশ টাকা মাসে! গজা ভাবলে অনেকের নাম বোধহয খাতায় লেখেনি শঙ্কর।

দু'দিন বসে থাকবার পরেও তাদের কোনও হদিশ মিলল না। তার ওপর শঙ্কর ছেড়ে দিয়েছে শুনে তিরিশজন ছাত্রের মধ্যে কুড়িজন আসা বন্ধ করে দিলে। তখন নিরুপায় হয়ে গজা আবার সুরপতির কাছে গিয়ে হাজির হল; বললে, "শঙ্কর ছেলেটা ভালই ছিল, বুঝলেন? এখন দেখছি, একেবারে বখে গেছে। যেই দেখলে আমি টেক-আপ করলাম, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সব দিলে বারণ করে। যাই হোক, ক্লাব আমি ছাড়ব না। কলকাতায় বদলি হয়ে আসবার দরখাস্তটা আমার মঞ্জুর হয়ে গেলেই আমি এখানে ফিরে এসে দেখুন না ক্লাবটাকে কিরকম জাঁকিয়ে তুলব।"

গজার ছুটি গেল ফুরিয়ে। ক্লাব-ঘর বন্ধ করে দিয়ে সে মেদিনীপুর চলে গেল।

তিনদিন যেতে না যেতেই কলকাতায় আগুন জ্বলে উঠল। লাগল হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। কলকাতা শহরের পথে ঘাটে চলতে লাগল বীভৎস নরহত্যা আর লুঠতরাজ।

অরিন্দম ঘোষালের বাড়িটা যে-পাড়ায়, সে-পাড়াটা ছিল একেবারে নিরাপদ। নানারকমের অদ্ভুত গুজব ছাড়া তাঁব অন্দরমহলে আর কিছু প্রবেশ করেনি। কর্তাবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। হুকুম দিলেন, সদর দরজা বন্ধ করে রাখো। খুব দরকারী কাজ ছাড়া কেউ যেন বাইরে না বেরোয়।

বড় বউ কিন্তু প্রথম দিনেই একটা ভারী মজার খবর নিয়ে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর কানে তুলে দিলে। বললে, "এত ত বারণ করলেন, কিন্তু শঙ্কর বেরিয়ে গেল। ওর মা শুধু পায়ে ধরতে বাকি রাখলে, কিন্তু কিছুতেই শুনলে না।"

বড় বউ ভেবেছিল এই নিয়ে বেশ একটা হৈ হৈ হবে বাড়িতে, কিন্তু রাঁধুনি-বামনীর ছেলে—বেরিয়ে গেল ত বয়ে গেল। তার জন্যে কার কী মাথাব্যথা!

কর্তাবাবু মুখ না তুলে শুধু বললেন, "ও।"

শঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার বোসবাগান ক্লাবের সুমুখে। গিয়েই দেখে, সুরপতিবাবু দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি এখানে?"

সুরপতি বললে, "তোমারই খোঁজে।"

শঙ্কর বললে, "আপনারা ত আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, তারপরেও ভাবলেন কেমন করে যে আমি এখানে আসব?"

সুরপতি বললে, "ও-সব কথা থাক। এখন শোন, আমাদের এই বিপদের দিনে নিজেদেরই সব ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার দলবল নিয়ে এই পাড়াটা তুমি বাঁচাও।"

শঙ্কর বললে, "সে সাধ্য কি আমার আছে?"

"খুব আছে। চমৎকার ছেলে তুমি।"

এই বলে সুরপতি তার পিঠ চাপড়ে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "রাইফেল চালাতে জানো?"

শঙ্কর বললে, "কেমন করে জানব? রাইফেল কোথায় পাব বলুন?"

সুরপতি বললে, "আমার আছে। আমি তোমাকে শেখাব।"

শঙ্কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে শুধু। বললে, "আমার একটু কাজ আছে। আমি চললাম।"

সুরপতি বললে, "না না, এসময় কোনও কাজ নয়। তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না। যে-কদিন এইরকম গোলমাল চলবে, সে-কদিন তোমার দলবল নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে খাবে, থাকবে। এস তুমি আমার সঙ্গে।"

শঙ্কর বললে, "এ সময় বাড়ির বাইরে থাকলে আমার মা কেঁদে কেঁদে মরে যাবে। তাঁকে অন্তত একটিবার দেখা দিয়ে আসতেই হবে।"

সুরপতি নিজের স্বার্থ বেশ ভালই বোঝে। জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়িতে কে কে আছে? তোমার মা—"

শঙ্কর বললে, "আর কেউ নেই। শুধু আমার মা।"

সুরপতি বললে, "তবে আর কী! নিয়ে এস তোমার মাকে আমার বাড়িতে। মাকে আমি আলাদা ঘর ছেড়ে দেব। আমার মস্ত বাড়ি, তুমি দেখেছ বোধহয়।"

"দেখেছি। কিন্তু এখন আমাকে ছেড়ে দিন, আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।"

শঙ্কর তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুরপতি তাকিয়ে রইল তার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে। শঙ্কর তার চোখের বাইরে চলে যাবার পর হঠাৎ মনে হল,—শঙ্করের বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে ভাল হতো। এই বিপদের দিনে শঙ্করের মত ছেলের একান্ত প্রয়োজন।

সুরপতির বাড়ির ত্রিসীমানায় বিপদের আশঙ্কা কিছু ছিল না, তবু সুরপতি ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে স্নানাহার করেই সে তার বন্দুক আর রিভলভার নিয়ে বসল। বন্দুকের নল পরিষ্কার করলে। রিভলভারের চেম্বারে বুলেট পুরলে। বাড়ির ছাদে উঠে ফাঁকা দুটো আওয়াজ করলে, তারপর ব্রিচেস পরে শিকারীর বেশে বন্দুক হাতে নিয়ে বীরবিক্রমে বেরিয়ে পড়ল।

কথায় আছে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। সুরপতিরও ঠিক তাই। সাজপোশাক পরে, হাতে বন্দুক আর চামড়ার বেল্টে রিভলভাব নিয়ে এসে দাঁড়াল বোসবাগান ক্লাবের সুমুখে।

এসে যা দেখলে, তা অবশ্য দেখবার প্রত্যাশা সে করেনি।

দেখলে, শঙ্কর তার দলবল নিয়ে ক্লাব-ঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কী যেন পরামর্শ করছে। সুরপতি জিজ্ঞেস করলে, "তখন তুমি কোথায় চলে গেলে?"

শঙ্কর বললে, "যেখানে গেলাম, সেখানে যেতে যদি আর একটু দেরি হতো, তাহলে ভারি মুশকিলে পড়তাম। বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে নিয়ে যেতে যেতে আমার একটু দেরিও হয়েছিল।"

ক্লাব-ঘরের দিকে তাকিয়ে সুবপতি দেখলে, কয়েকজন মেয়েছেলে রয়েছে সেখানে। জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা কে ওখানে?"

শঙ্কর বললে, "ওদেরই ত এনে এইখানে তুললাম। গজাদাব বউ, গজাদার বোন, গজাদার ছেলেমেয়ে। বাড়িতে একটা ব্যাটাছেলে নেই, টাকা নেই, পয়সা নেই, এর-ওর কাছে চেয়ে-চিন্তে আজ আর কাল দুদিনের মত ব্যবস্থা করে দিলাম।"

সুরপতি অবাক হয়ে গেল শঙ্করের ব্যবহার দেখে। এখান থেকে চলে যাবার আগে গজা তাকে শঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেছে। বলে গেছে "ছোঁড়াটাকে ক্লাবের পাশ মাড়াতে দেবেন না। ছোঁড়াটা শয়তান।"

সেই শয়তানই আজ তার পরিবারকে রক্ষা করলে।

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "ওখানে আরও ত বাড়ি আছে, তাদের কী হবে?"

শঙ্কর বললে, "সে বাড়িগুলো একটু দূরে, আর সেখানে লোক আছে অনেক। তাহলেও আজ আমরা পালা করে পাহারা দেব রাত্তিরটা।"

সুরপতি বললে, "বস্তিটা ত খালের ওপারে। সেখান থেকে অতটা ঘুরে লোকজন এপারে আসবে ভেবেছ?"

শঙ্কর বললে, "যদি আসে—? দেখে এলাম খালের ওপার থেকে ওরা চিৎকার করছে, এপার থেকে এরা চেঁচাচ্ছে। এই চলছে দিনরাত।"

সুরপতি বললে, "আজ সারাদিন ত তুমি বাড়িছাড়া। আর তখন আমাকে বললে, বাড়ির বাইরে থাকলে মা তোমার কেঁদে কেঁদে মরে যাবে!"

শঙ্কর বললে, "ঠিক সময়ে আমি মার কাছে গিয়ে খেয়ে এসেছি। আবার রাত্রেও গিয়ে খেয়ে আসব। একটা বাইক্ পেলে ভাল হতো। বিজনের কাছ থেকে চেয়েছি, দেখি যদি পাই।"

সুরপতি বললে, "আমি তোমাকে সবকিছু দিতে পারি শঙ্কর, তুমি যদি আমার কথামত কাজ কর।"

শঙ্কর হাসলে সুরপতির মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, "করব, এই হাঙ্গামাটা চুকুক।"

খালের এপারে পাহারা অবশ্য তারা দিয়েছিল। সুরপতি নিজেও একবার গিয়েছিল সন্ধ্যার পরে। দুটো আওয়াজও করে এসেছিল বন্দুকের।

সেদিন একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটে গেল। রাত্রি তখন বোধ করি এগারটা হবে। পাড়ার সব জোয়ান ছেলেরা খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে ক্লান্ত হয়ে একে একে সব বাড়ি চলে গেছে। শঙ্করের দলের মাত্র জন-পাঁচেক ছোকরা একটা গাছের তলায় বসে বসে গল্প করছে।

গল্প করছে এই ব্যাপার নিয়েই।

কে একজন বললে, "এটা কী হল বল দেখি? গৃহযুদ্ধ?"

ঘনা অন্যদিকে তাকিয়েছিল। বলে উঠল, "ওরে থাম। তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। ঐদিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ।"

সবাই তাকিয়ে দেখল। শঙ্কর এগিয়ে এল ঘনার কাছে। দূরে গজার বাড়ির দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ঘনা চুপি চুপি বললে, "কি মনে হচ্ছে?"

রাস্তার আলো গিয়ে পড়েছিল একটা গাছের ওপর আর সেই গাছের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু ঝাপ্সা আলো পড়েছিল গজার দরজায়, তাইতে মনে হল, কে একটা লোক যেন দোরটা একবার খুলছে, আবার বন্ধ করছে।

শঙ্কর বললে, "বাড়িতে ত কেউ নেই।"

ঘনা বললে, "নেই বলেই ত ঢুকেছে।"

শঙ্কর বললে, "চোর নিশ্চয়ই। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে কিছু চুরি করবে বলে ঢুকেছে।"

"যেই হোক, চল দেখি।"

ছুরি-ছোরা, লাঠি-সোঁটা যা কিছু ছিল প্রত্যেকে হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে।

দোরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতর থেকে খিল বন্ধ।

"হ্যাঁ, ঠিক। আমাদের আসতে দেখে ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে দিয়েছে।"

ঘনা বললে, "সাবধান কিন্তু, অনেকে আছে। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এইখানে ঘাঁটি করেছে।"

তারু বললে, "আমরা ছ'জন মাত্র আছি। দলে যদি ওরা ভারী হয়, আমরা বেকায়দায় পড়ে যাব। দাঁড়া আরও লোক জড় করি।"

শঙ্কর বললে, "না। কেউ যদি না থাকে ত লোকে হাসবে। পাঁচিল টপকে চল আগে ঢুকে পড়ি। দোরের কাছে কে থাকবে? তোর হাতে ধারালো টাঙ্গি আছে। তুই থাক।"

দুটো কপাটের ফাঁকে টাঙ্গিটা ঢুকিয়ে দোরের খিলটা বাইরে থেকে খোলবার চেষ্টা করছিল ঘনা। একটু এদিক-ওদিক করতেই খুলে গেল।

শঙ্কর বললে, "আয়।"

বলে সে নিজেই আগে ঢুকে পড়ল। তার একহাতে ছিল টর্চ, আর একহাতে ছোট একটি লাঠি। টর্চ ফেলে সুইচটা দেখে নিয়ে বারান্দার আলোটা জেবলে ফেললে।

কিন্তু কোথায় মানুষ? দু'খানি মাত্র ঘর। সুমুখে একটুখানি বারান্দা। বারান্দার পাশে টিনের একটি ছোট্ট ঘরের একপাশে রান্নার উনোন পাতা, আর তার পাশেই জলের কল আর চৌবাচ্চা।

দু'খানা ঘরেই তালা বন্ধ। টেনে টেনে দেখলে। খোলা গেল না।

"দোরে আর মিছেমিছি পরশুরাম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেন?"

ঘনাও ঘবে ঢুকল।

ছ'জন লোক তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগল। কিন্তু মানুষ ত ইঁদুর নয় যে, গর্তে ঢুকল, পাখি নয় যে, উড়ে পালাল। মানুষ একটা ছিল নিশ্চয়ই। নইলে ভিতর থেকে সদব দরজায় খিল বন্ধ করলে কে?

কে একজন বললে, "ছাতে গিয়ে ওঠেনি ত?"

কিন্তু ছাতে ওঠবার কোনও ব্যবস্থাই নেই কোথাও।

বাথরুমটা পর্যন্ত টর্চ ফেলে দেখে আসা হল। সেখানেও নেই।

পালিযেছে তাহলে।

শঙ্কর রান্নাঘরের টিনটা তার হাতের লাঠি দিয়ে খুঁচে খুঁচে দেখছিল। সবাই তখন বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। শঙ্কর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, "পেয়েছি!—উঠে আয় ব্যাটা, উঠে আয়!"

হুড়মুড় করে সবাই তার পিছনে গিযে দাঁড়াল। দেখা গেল, ফাঁকা চৌবাচ্চার ভেতর জড়সড় হয়ে বসে আছে একটি মানুষ। বয়স তিরিশ

পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। লাঠির খোঁচা খেয়ে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। মুসলমান যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া। মুখে দাড়ি-গোঁফ।

হঠাৎ 'জয় মা!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো ঘনা। দেখা গেল, হন্তারকের মত দুহাত দিয়ে টাঙিগটা সে তখন তুলে ধরেছে।

শঙ্কর বললে, "না।"

"না কি? আমাদের অনেককে ওরা এমনি করে মেরেছে। চৌবাচ্চার ওপর মাথাটা চেপে ধর, আমি দিই বলিদান করে।"

শঙ্কর বললে, "চুপ কর।"

লোকটা তখন চৌবাচ্চা থেকে নেমে শঙ্করের পাদুটো জড়িয়ে ধরেছে।

শঙ্কর তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে এনে ফেললে বারান্দায়। বারান্দায় ভাল আলো ছিল। লোকটা কাঁদছে, আব থর থর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ভাল কবে কথা বেরুচ্ছে না। খালি বলছে, "জানে মারবেন না বাবু, আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে।"

লোকটা তোতলা। ভয়ে যেন আরও তোতলা হয়ে গেছে।

শঙ্কবকে সবিয়ে দিযে তারু এগিয়ে এল। ঠাস ঠাস করে দুটি চড় মেরে তারু জিজ্ঞাসা করলে, "দলে ক'জন আছিস তোবা বল। কী মতলব করেছিলি? সঙ্গে কী এনেছিস? ছুরি? কই দেখি।"

কোমরে হাত দিয়ে দেখলে কিছু নেই।

লোকটা বললে, "আমি ও-দলের নই, বাবুমশাই। আমি গজুভাই-এর কাছে এসেছিলাম।"

"চোপ, ব্যাটা বলে কি না গজুভাই! গজুভাইকে ছুরি মারতে এসেছিলি?"

লোকটার পকেটে ছুরির খোঁজ করতে গিয়ে তারু বেব কবলে দুটি দশ টাকাব নোট, আর একটি পাঁচ টাকাব। পঁচিশ টাকা। আর এক পকেট থেকে বার হল চারটি বিড়ি আর একটি দেশলাই।

ঘনা বললে, "ওই পঁচিশটে টাকা কেড়ে নিয়ে দে ব্যাটাকে ছেড়ে দে।"

তারু বললে, "সেই ভাল।"

টাকা পঁচিশটা শঙ্করের হাতে দিয়ে তারু তাকে মারতে মারতে দোরের বাইরে টেনে এনে বললে, "তোদের দলের লোককে বলিস, এদিকে যেন হাঙ্গামা কবতে না আসে। এলে আর বেঁচে ফিরে যেতে হবে না।—ভাগ্!"

বলে এক লাথি মেবে তাকে ছেড়ে দিতেই লোকটা প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল।

বোসবাগানে হাঙ্গামা বিশেষ কিছু হল না।

সবাই বলতে লাগল, "ভাগ্যিস লোকটা সেদিন ধরা পড়ে গেল, নইলে নিশ্চয়ই একটা কিছু হতো।"

তার কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া পঁচিশটি টাকা গজার বউয়ের হাতে দিযে শঙ্কর বলেছিল, "এই দিয়ে চালাও কয়েকটা দিন। ফুরোবার আগেই গজাদার টাকা এসে যাবে।"

গজাদার টাকা আসবার আগে কিন্তু গজা নিজেই এসে হাজির হল। মেদিনীপুর পেঁাছেই সে শুনতে পেলে কলকাতায় নাকি একটা ভারী বিশ্রী ব্যাপার শুরু হয়েছে। দিনে-দুপুরে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঢুকে দুর্বৃত্তেরা নাকি মেয়েছেলে সব কুচি কুচি করে কেটে দিয়ে যাচ্ছে। শহবের পথে রক্তগঙ্গা বইছে। দিনে-দুপুরে পথে পথে শেয়াল-শকুনের জটলা চলছে। আরও সব দোকান-পাট লুটতরাজের ছোটখাটো ভাল ভাল খবরও সে পেয়েছিল, কিন্তু সে সব কথা এখানে অবান্তর। তার শুধুই মনে হতে লাগল, বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, তার ওপর শঙ্করের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে, সুতরাং এই সর্বনাশা হত্যাকান্ড তার বাড়িতেও যে সংঘটিত হয়েছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চোখের সুমুখে নানারকম ভয়াবহ চিত্র ক্ষণে ক্ষণে উপস্থিত হতে লাগল। তাব স্ত্রীর বয়স বেশী নয়, দেখতেও সুশ্রী, অবিবাহিতা যুবতী ভগিনী পরমাসুন্দরী, তাদের সর্বনাশ যা হবার তা ত হযেই গেছে। আব নয়ত ছুটে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে, তক্ষুণি একটা পা দিয়েছে কেটে, তারপর কেটেছে হাত, তারপর খানিকটা মাংসপিন্ডের মত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রক্তের স্রোতে ভেসে চলেছে তারা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটো হয়ত-বা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। দুটো বর্শা দিয়ে বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় কবে তাদের চুপ করিযে দিয়েছে জন্মেব মত। তারপর বাড়ির সুমুখের গাছেব ডালে টাঙিয়ে দিযেছে তাদেব মৃতদেহ।

কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে মন তাব উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু কপর্দকহীন নিঃসম্বল অবস্থায় সেখানে গিয়েই বা কী করবে সে?

আপিসের বড়বাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ সময় আপনাব বাড়ি ছেড়ে আসা উচিত হয়নি গজেনবাবু।"

মাত্র এইটুকু সহানুভূতি! গজেনেব চোখেব সামনে সেই কাল্পনিক ভয়াবহ চিত্র ভেসে উঠল—ছেলেমেয়ে দুটোর মৃতদেহ গাছে টাঙানো, তাব দিকে যেন হাত বাড়িয়ে আছে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল গজা। তারপর কান্না থামিয়ে বললে, "কী করব বলুন! টাকার বড় অভাব—"

কথাটা শেষ করতে হল না। বড়বাবু লোকটি দয়ালু। তৎক্ষণাৎ চল্লিশটি টাকা তার হাতে দিযে বললেন, "এক্ষুনি চলে যান। গিয়ে চিঠি দেবেন।"

চল্লিশটি টাকার একটি পয়সাও খরচ করেনি সে। ট্রেনের টিকিটও কেনেনি, খায়ওনি কিছু। হাওড়া স্টেশনে নেমে সত্যিই দেখেছে—শহরের সেই ভয়াবহ রূপ। কেমন করে কোন্‌দিক দিয়ে কুখ্যাত পল্লীর পথ এড়িয়ে গজা তাদের বোসবাগানে এসে ঢুকেছে তার মনে নেই। বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল সে ছুটতে ছুটতে, পথে সুরপতির সঙ্গে দেখা। বন্দুক নিয়ে সেদিনও সে রাউণ্ডে বেরিয়েছিল।

থম করে থেমে গেল গজা। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে সেই দুর্ধর্ষ গজেন সমাদ্দার। চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। কোনও কিছু প্রশ্ন করতে ভয় করছে।

সুরপতি নিজেই বললে, "বাড়িতে আপনার কেউ নেই।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল গজা।—"যাঃ, সব শেষ হয়ে গেছে?"

সুরপতি বললে, "না না, সবাই ভাল আছে। তবে আপনার বাড়িতে কেউ নেই। আছে ওই ক্লাব-ঘরে।"

গজা উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। জিজ্ঞাসা করলে, "হামলা হয়েছিল বুঝি?"

সুরপতি বললে, "হয়নি। হতে পারত। যে-শঙ্করকে আপনি শয়তান বলে তাড়িয়ে দিলেন, সেই শঙ্করই বাঁচিয়েছে আপনার বাড়ির সবাইকে। বাঁচিয়েছে এই পাড়াটাকে।"

গজা তাব মুখ দিয়ে একবার উচ্চারণ করলে, "শঙ্কর?"

শঙ্কর বলতেই শঙ্কর!

ঘনা আব তারুকে সঙ্গে নিয়ে শঙ্কর বোধকরি সেইদিকেই আসছিল। সুবপতি বলে উঠল, "ওই ত শঙ্কর!—অনেকদিন বাঁচবে তুমি। এই মাত্তর তোমার নাম হচ্ছিল।"

সে-কথায় কান দিলে না শঙ্কর। গজা কখন এল, কেমন করে এল, তাও জিজ্ঞাসা কবলে না। শুধু বললে, "ছি গজাদা, একটা পয়সাও দিয়ে যাওনি বউদিব হাতে?"

গজা বললে, "দেব কোত্থেকে?"

এই বলে একটু থেমে ঢোঁক গিলে বললে, "একটা ব্যবস্থা আমি কবে গিয়েছিলাম, এই হাঙ্গামাটা না বাধলে হয়ত সে দিযে যেত তোর বউদির হাতে।"

শঙ্কর বললে, "কোথায় সে থাকে বল, আর একখানা চিঠি লিখে দাও, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

গজা বললে, "কাছেই থাকে ওই খালপারে, কিন্তু আর হবে না; সে মুসলমান।"

"মুসলমান!"

গজা বললে, "হ্যাঁ। তোরাব আলিকে বলে গিয়েছিলাম—পঁচিশটে টাকা তোর বৌদির হাতে দিয়ে যেতে।"

কথাটা ধক করে এসে বাজল শঙ্করের বুকে। বললে, "তোরাব আলি? কেমন চেহারা বল দেখি? দেখতে কেমন?"

গজা বললে, "দেখতে আর পাঁচজন যেমন হয়। মুখে গোঁফ আছে, এইখানে চারটি দাড়ি আছে, রোগা পাতলা চেহারা, ভাল করে কথা বলতে পারে না। তোতলা।"

বুঝতে কারও বাকী রইল না। ঘনা, তারু, শঙ্কর—তিনজনেই বুঝতে পারলে। লোকটা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "জানে মেরো না বাবু, বাড়িতে আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে।"

বলেছিল, "আমি গজুভাই-এর কাছে এসেছিলাম।"

তারা কেউ সেকথা বিশ্বাস করেনি।

তারুর হাতটা কেমন যেন ঝিন্-ঝিন্ করে উঠল। এই হাত দিয়ে সে তাকে চড় মেরেছিল।

শঙ্কর বললে, "পঁচিশটে টাকা সে দিয়ে গেছে। আমি বউদির হাতে দিয়েছি।"

শঙ্করের গলাটা মনে হল যেন ধরা-ধরা। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা তাই-বা কে জানে!

কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয় এই পৃথিবীতে।

প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। থেমে গেল।

নরমেধ যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল সত্যাশ্রয়ী এক বৃদ্ধ তাপস। মুণ্ডিতমস্তক স্খলিতদন্ত নির্ভীক এক ভিখারী এসে দাঁড়াল মানুষের দরজায়। বললে, বনেব হিংস্র পশুব কাছে আসিনি আমি। এসেছি মানুষের কাছে। মানবতার পূজারী আমি। পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে তোমবা এসে দাঁড়াও আমার সম্মুখে। আমি তোমাদের সেবা করব। পূজা করব তোমাদের।

হোমাগ্নিশিখা নির্বাপিত হল।

শঙ্করের আর কোনও কাজ নেই।

সুরপতি ধরলে তাকে। বললে, "এস তুমি আমার সঙ্গে। তোমাকে আমি রাইফেল চালাতে শেখাব। আজকালকার দিনে এ-সব শিখে রাখা ভাল।"

রাইফেল, রিভলভার শিখতে শঙ্করের মোটেই দেরি হল না। দশদিন যেতে-না-যেতেই সুরপতি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে, শঙ্কর তার বন্দুক দিয়ে একটা উড়ন্ত পাখিকে নামিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে শঙ্করের টারগেট প্র্যাকটিস অব্যর্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে এই শঙ্কর।

তারপর কোথায় যে সে ডুব মারলে, সুরপতি তার আর কোনও সন্ধানই পেলে না।

মায়ের তাড়া খেয়ে আবার তাকে ইস্কুলে যেতে হল।

কিন্তু ইস্কুল তখন তার নাম কেটে দিয়েছে। অনেকগুলো টাকা লাগবে।

লজ্জায় সে তার মাকে কিছু বলতেও পারলে না।

অতগুলো টাকা মা তার পাবেই-বা কোথায়।

ইচ্ছে করলে টাকা সে অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে তার কিছুতেই হল না।

ক্লাসে গিয়ে বসতেও তার ভাল লাগে না। মনে হয় যেন ছেলেগুলো সবাই তার চেয়ে বয়েসে ছোট।

চারিদিকে সেদিন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। অসম্ভব গরম। শঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বইখাতা নিয়ে। মা জানে সে ইস্কুলে গিয়েছে।

ইস্কুলের বাইরে বাঁদিকের একখানা বাড়ির ছায়ায় নতুন একখানা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার সামনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পা দুটো দোরের বাইরে বেরিয়ে আছে। গাড়িখানা কার—শঙ্কর জানে। তাদেরই ক্লাসে পড়ে নরেন—মস্ত বড়লোকের ছেলে। লেখাপড়া করে না। পিছনের বেঞ্চে বসে থাকে। গাড়ি নিয়ে ইস্কুলে আসে। আবার সেই গাড়ি করেই বাড়ি যায়।

শঙ্কর সময়টা কাটাবার জন্যে গাড়ির দোর খুলে পিছনেব সিটে গিয়ে বসল। ফুরফুর করে হাওয়া বইছিল। বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেনি।

ঘুম যখন ভাঙল. দেখলে গাড়ি তখন চলছে। পাশে বসে আছে নরেন।

নরেন হাসছে ফিক্-ফিক্ করে।

শঙ্কব বললে, "দাঁড়াতে বল, আমি নেমে যাব।"

নবেন বললে, "নামতে হবে না। চল আমাদের বাড়িতে ক্যারাম খেলবি।"

শঙ্কর বললে, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়াবি ত যাই।"

নবেন বললে, "খাওয়াব। কিন্তু হাঁ রে, তুই এতদিন ইস্কুলে আসিসনি কেন? আজও ত দেখলাম ক্লাসে ঢুকেই পালিয়ে এলি।"

শঙ্কব বললে, "একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা লাগবে। দেব কোত্থেকে?"

নরেন কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, "আমি যদি দিই!"

"ধেৎ! তোর টাকা আমি নেব কেন? আমার আর পড়তে ভাল লাগে না।"

নরেন বললে, "ঠিক বলেছিস মাইরি, আমারও ভাল লাগে না। কিন্তু মা ছাড়ে না যে!"

শঙ্কর চুপ করে রইল। নরেন তার কাছে একটু এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, "চেহারাটা আচ্ছা বাগিয়েছিস কিন্তু। কী করে বাগালি বল ত?"

শঙ্কর বললে, "তোর এমনি হতে ইচ্ছে করে?"

নরেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "করে না আবার! তুই পারিস করে দিতে?"

শঙ্কর বললে, "নিশ্চয় পারি।"

"কী করতে হবে বল। খুব খেতে হবে?"

শঙ্কর হাসলে। বললে, "না।"

গাড়ি এসে দাঁড়াল নরেনদের বাড়ির দরজায়। চমৎকার বাড়ি। কিন্তু লোক নেই বাড়িতে। নরেনের বিধবা মা আর সে। বাকী সব দাসদাসী।

শঙ্করকে নিয়ে গিয়ে নরেন প্রথমেই তার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে, "মা, আমরা একসঙ্গে পড়ি। এর নাম শঙ্কর। আমরা কিন্তু এক্ষুনি মাংস আর লুচি খাব।"

মা বললেন, "মাংস ত এক্ষুনি হয় না বাবা, দোকান থেকে তাহলে আনিযে দিতে হয়।"

"তাই দাও।"

লুচি-মাংস আনাতে দেরি হল না, কিন্তু শঙ্কর কী যে দেখলে এই মা আর ছেলেটির ভিতর, তার পরদিন থেকে তার আব টিকিটি দেখা গেল না। নরেন তার বাড়ির ঠিকানাও জানে না যে খুঁজে বের করবে।

নরেনের মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কই হে, তোর সেই বন্ধুটি কোথায় গেল?"

নরেন বললে, "টাকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত। ভারি গবিব। টাকার অভাবে ইস্কুলে যেতে পারছে না।"

"কত টাকা?"

"জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিছুতেই বলতে চাইলে না।"

মা বললেন, "ভাল ছেলে। জিজ্ঞেস করবি কত টাকা। আহা, টাকাব অভাবে পড়তে পারছে না! টাকা আমি দেব।"

সেইদিন থেকে নরেন খুঁজে বেড়াতে লাগল শঙ্করকে।

শঙ্করের আর এক বন্ধু বিজন। বড়লোকের ছেলে—নতুন একটি বাইক কিনেছে। হঠাৎ তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

বাইকটি শঙ্করকে দেখাবার জন্যে বিজন বাইক থেকে নামল।

"দ্যাখো কেমন সুন্দর বাইক। কত দাম জানো?"

শঙ্কর বললে, "জানবার দরকার নেই। গরিব মানুষ, কোনদিন কিনতে ত পারব না। তবে বাইকে চড়া যদি শিখিয়ে দিস ত শিখতে পারি তোর বাইকে।"

বিজন বললে, "এস। একদিনেই শিখিয়ে দেব। বোস এইখানে।"

শঙ্কর প্রস্তুত। বিজনের বাইকের পেছনে চড়ে তক্ষুনি চলে গেল সে বাইক চড়া শিখতে।

শঙ্করের শিখতে অবশ্য দেরি হল না।

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা নেশা আছে। বিজনের বাইক চড়ে শঙ্কর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শেষে একদিন বললে, "দিন কয়েকের জন্যে দিবি তোর বাইকটা?"

"কেন দেব না? নিয়ে যাও।"

সেই বাইক নিয়ে শঙ্কর এসেছিল। এসেছিল অরিন্দম ঘোষালের বাড়িতে। একদিন নয়, দিনের পর দিন বিজনের বাইকটি ছিল তার সঙ্গে।

রাস্তায় বিজনের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল, বিজন ফেরত চেয়েছিল তার বাইক। শঙ্কর বলেছিল, "দাঁড়া না। অত ছটফট করছিস কেন?"

বিজন হয়ত ভেবেছিল, শঙ্কর তার বাইকটা আর দেবে না। তাই সে ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঘোষাল-বাড়ির সামনে যে-কেলেঙ্কারি করে এল, শঙ্কর সেকথা ভুলবে না কোনদিন।

ঘোষাল-বাড়ি তাকে ছাড়তে হল চিরদিনের জন্যে।

এই ছাড়াব ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল নবেন।

নরেনের মার হাতে লুচি আব মাংস খেয়ে যে-নরেনকে সে পরিত্যাগ করে এসেছিল, আবার একদিন হঠাৎ সে তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, "আমাকে টাকা দিবি বলেছিলি, কই দে।"

নবেন জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা?"

শঙ্কর বললে, "আপাতত পঞ্চাশ টাকার কম নয়।"

নবেন তারপর মার কাছ থেকে পঞ্চাশটি টাকা এনে শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "আমার শরীরটাকে তোর মত করে দিবি বলেছিলি, তার কী হল?"

শঙ্কর বললে, "আমি যা বলব শুনবি ত?"

নরেন বললে, "শুনব।"

"পরশু সকালে এসে তোকে নিয়ে যাব। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবি।" বলেই শঙ্কর চলে গেল।

নবেন ভেবেছিল হয়ত সে আর আসবে না।

ভাবনাটা তার আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল, যখন দেখলে, যার জন্যে টাকা নেওয়া, সেই ইস্কুলেও সে যায়নি। শঙ্করের ওপর মনটা তার বিরূপ হয়েই রইল। ভাবলে, ছেলেটা জোচ্চোর।

শঙ্কর কিন্তু সেই টাকা নিয়ে প্রথমেই গেল বোসবাগানে। উত্তর দিকে

ছোট যে বস্তিটি ছিল, খুঁজে বের করলে সেখানে একখানি ছোট ঘর। মাকে তার ঘোষাল-বাড়ি থেকে আনতেই হবে।

নিয়েও এল মাকে। কিন্তু যে দাম দিয়ে আনতে হল সে-কথা মনে তার গাঁথা হয়ে রইল চিরজীবনের মত। বড়লোকেরা হয়ে রইল তার দু'চক্ষের বিষ।

নরেনকে সে কথা দিয়ে এসেছে। সে-কথা তাকে রাখতেই হবে।

বোসবাগানের ক্লাব-ঘরে তখন তালা ঝুলছে।

শঙ্কর গিয়ে দাঁড়াল সুরপতির কাছে। চাবিটা চেয়ে এনে ক্লাব খুললে। বন্ধুদের বললে, "ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার কর। আমি আসছি।"

নরেনকে নিয়ে এল বোসবাগান ক্লাবে। শুধু নরেনের জন্যেই বোসবাগান ক্লাব আবার চালু হল।

নরেনকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগল শঙ্কর। শরীরটাকে তার শক্ত করে তুলতে হবে। সানন্দে সে-দায়িত্ব শঙ্কর গ্রহণ করেছে তার অর্থের বিনিময়ে।

নরেন একদিন চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলে শঙ্করকে, "ইস্কুলে যাওয়া তুই ছেড়ে দিয়েছিস, না রে?"

শঙ্কর বললে, "হ্যাঁ।"

"আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু মার ভয়ে পারি না।"

"মাকে তুই ভয় করিস নাকি?"

নরেন বললে, "কচু! বল না তোর কত টাকা চাই। আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

টাকার জন্যে তখন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শঙ্কর। নরেনের দেওয়া পঞ্চাশ টাকা তার কবে খরচ হয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর বললে, "কেমন করে আনবি? মা তোর বকবে না?"

নরেন বললে, "মা জানলে ত!"

শঙ্করের মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। বললে, "চুরি করে আনবি? ছি, চুরি করিস না।"

নরেন বললে, "চুরি কেন করব? গাড়ি, বাড়ি, টাকাকড়ি সবই ত আমার। আমিই মালিক। আমারই ত সব।"

শঙ্কর আর-কিছু জানতে চাইলে না। বললে, "তাহলে আরও পঞ্চাশটা টাকা এনে দে।"

পরের দিন সকালে নরেন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। অন্যদিন গাড়ি নিয়ে আসে, সেদিন এল পায়ে হেঁটে। শঙ্কর তখন খালি গায়ে ক্রমাগত ডন টেনে টেনে শরীরটাকে গরম করছে।

নরেন বললে, "উঠে আয় দেখি একবার।"

শঙ্করকে সে ক্লাব-ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল, মনে হল, যেন সে দিগ্বিজয় করে এসেছে।

শঙ্কর বললে, "হাসছিস কেন? কি বলবি বল।"

নরেন বললে, "আমার মা ত লেখাপড়া জানে না, তাই ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা থাকে না। মায়ের সিন্দুকে, আলমারিতে, যেখানে-সেখানে শুধু তাড়া তাড়া নোট।"

শঙ্কর বললে, "থাকবেই ত! তোরা বড়লোক।"

নরেন আবার হাসলে। বললে, "তুই ত পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলি, আমি সেই নোটের একটা বাণ্ডিল থেকে পাঁচখানি নোট বের করে আনলাম তোর জন্যে। কিন্তু বাইরে এসে দেখি কি পাঁচটাই একশ টাকার নোট।"

শঙ্কর বললে, "তাতে কী হয়েছে? একখানা নোট ভাঙিয়ে আমাকে দে পঞ্চাশটা টাকা।"

নরেন তার পকেট থেকে ভাঁজকরা পাঁচখানা নোটই বের করলে, তারপর পাঁচখানাই শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "এই নে, আর ভাঙাতে পারি না। এখন কিন্তু আর চাইবি না।"

নরেন ভেবেছিল, মাসখানেক পরিশ্রম করলেই তার শরীরটা ঠিক শঙ্করের মত হয়ে যাবে। কিন্তু জন্মাবধি আদরের দুলাল শরীরটা তার গড়তে চায় না কিছুতেই। দুবার ডন টেনেই থপ করে শুয়ে পড়ে। পাঁচবার ওঠ-বোস করলেই কোমরে হাত দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে। বলে, "দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নিই।"

শঙ্করের চেষ্টাব ত্রুটি নেই। নিজে বার-বার দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

শেষে সব চেয়ে যা সহজ—ছোট ছেলেরা যা করতে পারে—শঙ্কর তাকে তাই শেখায়।

দিন চার-পাঁচ শেখবার পরেই নরেন তার হাতখানা যার-তার কাছে বাড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, "দ্যাখ ত, মাসেলটা কী রকম শক্ত হয়েছে।"

বুক চিতিয়ে চিতিয়ে চলে আর বলে, "এবার মেরে দিয়েছি।"

শঙ্কর একদিন তাকে তিরস্কার করলে। বললে, "এরকম করলে কিচ্ছু হবে না।"

নরেন বলে, "তোর হল কেমন করে?"

শঙ্কর বলে, "একদিনে হয়নি। এর জন্যে আমাকে অনেক কিছু করতে হয়েছে।"

নরেন বলে, "অনেককিছু করেছিস মানে ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস,

এই ত? আমিও ছেড়ে দিচ্ছি, দ্যাখ না! তখন হোল-টাইম এই শরীর নিয়েই থাকব।"

শঙ্কর বলে, "না না, ইস্কুল ছাড়িসনি। আমি ভাল কাজ করিনি।"

নরেনকে নিয়ে শঙ্কর সত্যিই একটু বিপদে পড়ল। তারই দয়ায় তাকে আজকাল সংসারের কথা ভাবতে হচ্ছে না, বিনিময়ে সে যদি তার শরীরটা একটু ভাল করে না দিতে পারে ত অন্যায় হবে।

শঙ্কর বললে, "কাল থেকে তোকে আমি 'আসন' শেখাব।"

'আসন' অভ্যাস করতে গিয়ে নরেন একদিন চিৎকার করে উঠল, "ওরে বাবারে, পাদুটো আমার ভেঙে গেল। এ আরও শক্ত। এ আমি পারব না।"

"পারবি না, মর।" বলে রাগের মাথায় শঙ্কর তার মাথার ওপর একটা চড় মেরে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারপর তিন দিন আর নরেনের দেখা নেই।

চারদিনের দিন যদি-বা এল ত বসে রইল চুপটি করে।

শঙ্কর বললে, "গায়ের জামাটা খোল। আরম্ভ কর।"

নরেন বললে, "আজ থাক। ব্যায়াম করছি তাই একটু খাওয়া-দাওয়া বেশী হচ্ছে কি না—পেটের অবস্থা ভাল নয়।"

শঙ্কর বললে, "তোর কিছু হবে না নরেন।"

"না হোক গে।" বলেই নরেন তার পকেট থেকে রুপোর একটা সিগারেটের কৌটো বের করে ফেললে। তারপর কৌটোটা শঙ্করের সামনে খুলে ধরে বললে, "খাবি?"

শঙ্কব বললে, "এ আবার কবে ধবলি?"

একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে নরেন বললে, "ধরেছি।"

দেখেশুনে মনে হচ্ছে, নরেনের আর তেমন গা নেই।

একদিন আসে ত পাঁচদিন আসে না।

শঙ্করও হাল ছেড়ে দিয়েছে।

এমনদিনে শঙ্কর একদিন ক্লাবে গিয়ে শুনলে, নরেন নাকি আজকাল প্রতিদিন বইখাতা নিয়ে দশটার সময় ক্লাবে আসে, দুটো বেঞ্চি জোড়া করে তার ওপর পড়ে পড়ে সারা দুপুরটা ঘুমোয়, তারপর চারটের আগেই উঠে পালিয়ে যায়।

দুপুরে একদিন শঙ্কর তাকে গিয়ে ধরলে। "ইস্কুলে যাস না বুঝি?"

নরেন বললে, "না, ভাল লাগে না।"

শঙ্কর বললে, "ভাল কাজ করছিস না নরেন।"

নরেন বললে, "ভাল মন্দ আমি বুঝব। তুই থাম।"

শঙ্কর থামল। আর কোনও কথাই সে বললে না।

নরেনের মোটরটা একদিন সকালে ক্লাবের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর ভেবেছিল, নরেন আসছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভার। ক্লাবের দরজায় এসে বললে, "শঙ্করবাবু আছেন?"

শঙ্কর বেরিয়ে এল।

ড্রাইভার বলে, "মা আপনাকে ডাকছেন।"

শঙ্কর গাড়ির কাছে এসে দেখে, নরেনের মা বসে আছেন গাড়িতে।

শঙ্করকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "আমার নরেনকে তুমি কী বলেছ?"

শঙ্কর বললে, "কিছু করছে না বলে একটু বকেছি।"

মা বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছিলেন। বললেন, "থাক, আর সাধু সাজতে হবে না। নরেনকে তুমি ইস্কুলে যেতে বারণ করেছ। বলেছ, চব্বিশ ঘণ্টা প্রাক্‌টিস না করলে শবীর ভাল হবে না।"

শঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলে, "কে বললে এ-কথা?"

"যাকে বলেছ সেই বলেছে।"

শঙ্কর বললে, "নরেনকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস কবব।"

নবেনেব মা বললেন, "সে আব আসবে না এখানে। তোমার ভয়ে সে একেবাবে সিঁটিয়ে গেছে। তুমি তার হাত মুড়ে দিযেছ, পা ভেঙে দিয়েছ, টাকাকড়ি কত যে নিয়েছ তা তুমিই জান। তুমি একটি গুণ্ডা, তুমি জোচ্চোর, তুমি শয়তানের একশেষ।"

মাথা হেঁট করে শঙ্কর দাড়িযে বইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার ঝিমঝিম কবছে। এ সময নবেনকে হাতের কাছে পেলে কী যে সে করত বলা যায় না। কিন্তু নবেনেব মাকে কিছুই সে বলতে পারলে না।

নবেনের মা বললেন, "তুমি আর কোনদিন আমাব বাড়ির দরজা মাড়াবে না। আবাব যদি নরেনের সঙ্গে তোমাকে দেখতে পাই ত আমি কিছু বাকী রাখব না বলে দিচ্ছি।"

এই কথা বলে তিনি ড্রাইভাবকে বললেন, "চল।"

গাড়ি চলে গেল। শঙ্কর তখনও সেইখানে দাঁড়িযে।

নরেন বড়লোক! অরিন্দম ঘোষালেব বড় ছেলেও বডলোক।

জনকতক ছেলে ছিল ক্লাবের ভিতর বসে। তারা সবই শুনেছে। একজন বেবিয়ে এল। ডাকলে, "শঙ্কর-দা!"

"উঁ।"

"তুলে আনব একদিন নবেনকে?"

শঙ্কর চুপ করে কি যেন ভাবছে। জবাব দিলে না।

"দেব নাকি আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে?"

শঙ্কর বললে, "না।"

ক্লাব-ঘরের দোরের কাছে গিয়ে বললে, "বন্ধ কর।"

"এক্ষুনি?"

"হ্যাঁ।"

ক্লাব-ঘর বন্ধ করে চাবিটা হাতে নিয়ে শঙ্কর বললে, "আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

অরিন্দম ঘোষালের বড় ছেলে তাকে মেরেছিল। সে জ্বালা সে তখনও ভোলেনি। আজ নরেন তাকে যে-মার মারলে, সে-মারের জ্বালা যেন আরও মর্মান্তিক।

ক্লাব-ঘর বন্ধ করে শঙ্কর তার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল, পথের মধ্যে নাদুশ-নুদুশ এক প্রিয়দর্শন যুবক তাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

"চিনতে পারছেন?"

শঙ্কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। চেনা-চেনা মনে হল। মনে হল কোথায় যেন দেখেছে তাকে। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে পড়ল না।

শঙ্কর বললে, "না, ঠিক চিনতে পারছি না।"

ছোকরা বললে, "আমি মডার্ন প্রিন্টিং থেকে আসছি।"

শঙ্করের মনে পড়ল। বললে, "ও, আপনাদের সেই হ্যান্ড বিল ছাপানো বিলের দরুন পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়নি।"

"আজ্ঞে না। পঁচিশ টাকা নয়, কুড়ি টাকা। পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন। মাঝে আমি একবার আপনার খোঁজে এসেছিলাম। শুনলাম ক্লাবটা বন্ধ হয়ে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "আবার বন্ধ করে দিলাম।"

ছেলেটি একটু অবাক হয়ে গিয়ে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে "আবার বন্ধ করে দিলেন?"

শঙ্কর বললে, "তা হোক। তোমাদের টাকা আমি মারব না। নেবে এস।"

শঙ্করের মন-মেজাজের ঠিক ছিল না, তাই সে আপনি বলতে গিয়ে তুমি বলে ফেলেছে। বলেই কিন্তু সে তার ভুলটা বুঝতে পারলে। বললে "আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে 'তুমি' বলে ফেললাম।"

ছেলেটি বললে, "তুমি আমাকে তুমিই বল শঙ্করদা, আমিও তোমাকে 'তুমি' বলব। শোন শঙ্করদা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

এই বলে ছেলেটি শঙ্করের একখানি হাত ধরে মিনতিকাতরকণ্ঠে তাকে অনুনয় করে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বসালে। প্রথমেই নিজের পরিচয় দিলে।

বললে, "আমার নাম শ্রীহরি। মডার্ন প্রিন্টিং আর টাইপ ফাউনড্রির যিনি

মালিক আমি তাঁর ছোট ছেলে। আমি কিন্তু তোমার কাছে বিলের টাকা চাইতে আসিনি শঙ্করদা। ও-টাকা তোমাকে দিতে হবে না। ওরকম কত মোটা টাকা আমাদের মারা যায়। আমি এসেছি অন্য কারণে।”

শ্রীহরি প্রথমেই তার কারণটি সবিস্তারে বর্ণনা করলে। প্রথম যেদিন সে ছাপাখানার বিল নিয়ে এসেছিল, শঙ্করকে দেখে সেইদিনই সে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছে। চুপি চুপি কতদিন সে তার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে শঙ্করকে দূর থেকে দেখিয়েছে, কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে কথা বলবার সাহস তার কোনদিন হয়নি।

শ্রীহরির কথা বলবার ভঙ্গীটিও অপরূপ। ফোলা-ফোলা গাল আর ছোট ছোট দুটি চোখ। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলবার সময় আনন্দের উত্তেজনায় তার সেই চোখদুটি গালের ভিতব ঢুকে কেমন যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। কালো কালো দুটি চোখের তারা শুধু গর্তের ভিতর থেকে জ্বল জ্বল করতে থাকে।

“তোমাকে আমার কী ভাল যে লেগেছে শঙ্করদা, তা আর কী বলব? তোমাব দেখাদেখি আমিও একটা ক্লাব করে ফেলেছি, আর সেইদিন থেকে খালি খালি ভাবছি, কেমন করে তোমাকে আমাদের ক্লাবে একদিন নিয়ে যাব। এই ক্লাবটা বন্ধ হয়ে গেল শুনে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে শঙ্করদা, আমি মাইরি বলছি!”

এই বলে শ্রীহরির সে কি হাসি!

গোলাকার একটা মাংসপিণ্ডের ভিতর সাদা সাদা দাঁতগুলি দেখা যায়, খিক খিক করে হাসে, আব দুলতে দুলতে দুহাত দিয়ে শঙ্করের গায়ের ওপর ক্রমাগত চড় মারতে থাকে।

শঙ্করের মুখে কিন্তু হাসি নেই। সে যেন আরও শক্ত হয়ে গিয়েছে। ভাবছে, এ-ও নরেনের মত আর-এক বড়লোকের ছেলে।

শঙ্কর বললে, “দাও, তোমার ঠিকানা দাও। আমি একদিন যাব তোমাদের ক্লাবে।”

সংবাদটা শুনে শ্রীহবির আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে আর তার কথা বেরুল না মুখ থেকে। বললে, “এই ত গঙ্গার ধারে ঝিলপাড়ায় আমাদের বাড়ি। ক্লাবটা ওইখানেই। তের নম্বর সুধাকান্ত রায় লেন।”

পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে ঠিকানাটা শঙ্কর লিখে নিলে।

শ্রীহরি বললে, “ক্লাবে আমাদের টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমরা চালাতে পারছি না, শঙ্করদা। বলতে ভরসা হচ্ছে না, তবু একটা কথা বলব?”

“বল।”

"তুমি আমাদের সেক্রেটারি হবে?"

শঙ্কর বললে, "সে-সব পরে দেখা যাবে। তুমি এখন যাও।"

শ্রীহরিকে বিদায় করে দিয়ে শঙ্কর তার বাড়ি গেল। মাকে গিয়ে বললে, "এখান থেকে চল মা, অন্য জায়গায় যাই।"

বিমলা বললে, "কেন রে, এখানে ত আমরা ভালই আছি।"

শঙ্কর বললে, "না মা, আরও ভাল থাকতে হবে।"

আবার একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশী দেরি হল না শঙ্করের।

এবারেও এক গরিবের বস্তির একটেরে ছোট একখানি বাড়ি।

কোথায় যে উঠে গেল বোসবাগানের কেউ জানল না শুনল না, ক্লাব-ঘরের চাবিটা শুধু একজনের হাতে দিয়ে সুরপতির কাছে পাঠিয়ে, শঙ্কর চলে গেল সেখান থেকে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় ঝিলপাড়ায় গিয়ে তের নম্বর সুধাকান্ত রায় লেনের বাড়িটা খুঁজে বের করলে শঙ্কর। টিনের একখানা লম্বা ঘর, পিছনের দিকে অনেকখানি জায়গা পড়ে আছে—আগাছার জঙ্গলে ভরা।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে শঙ্কর দেখলে, ঘরের ভিতর একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে জন দশ-বারো ছোকরা বসে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে হিন্দী সিনেমার একটা গান গাইছে, আর শ্রীহরি একটা চেয়ারে বসে বসে তাল ঠুকছে।

শঙ্কর ডাকলে, "শ্রীহরি!"

মুখ বাড়িয়ে শঙ্করকে দেখেই শ্রীহরি লাফিয়ে উঠল। "ওরে থাম থাম, তোদের গান থামা। ওই দ্যাখ কে এসেছে। এস এস শঙ্করদা, ভেতরে এস। আজ আমাদের কী সৌভাগ্য!"

দুহাত দিয়ে টানতে টানতে শঙ্করকে ভিতরে নিয়ে এসে চেয়ারের ওপর বসালে শ্রীহরি। সবাইকার সঙ্গে পরিচয় করে দেবার দরকার হল না। শ্রীহরির মুখে শঙ্করদার নাম আর প্রশংসা শুনে শুনে তারা হয়রান হয়ে গিয়েছে।

শঙ্করের মুখের দিকে হাঁ করে সবাই তাকিয়ে রইল।

তা তাকিয়ে থাকবার মত চেহারাই বটে।

শ্রীহরি বললে, "আমাদের ক্লাবের নাম দিয়েছি—'ঝিলপাড়া শক্তি মন্দির।' ভাল নাম হয়নি শঙ্করদা?"

শঙ্কর এতক্ষণ পরে একটা কথা বললে। বললে, "না।"

শ্রীহরির গালের মাংসপিণ্ডের ভিতর চোখ দুটি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কেন শঙ্করদা?"

শঙ্কর বললে, "যা দেখছি তাতে ত মনে হচ্ছে—সঙ্গীত-মন্দির।"

শ্রীহরি কিন্তু অপ্রস্তুত হল না। বললে, "এস তবে, দেখবে এস।"

বলেই ফট করে একটা আলোর সুইচ টিপে শঙ্করকে তুলে নিয়ে গেল পিছনের সেই আগাছার জঙ্গলে। বললে, "দেখেছ কত জায়গা পড়ে আছে! আমার ইচ্ছে আছে এখানে অনেক-কিছু করবার, কিন্তু—"

বলেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "কেমন করে করতে হয় কিছুই ত জানি না। তবে আর তোমাকে ডাকছি কেন?"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "টাকা আছে ক্লাবের?"

শ্রীহরি বললে, "আছে।"

"কত?"

"তা প্রায় একশ'র কাছাকাছি।"

শঙ্কর মৃদু একটু হাসলে। বললে, "কাল আমি আসব। টাকাটা আমার হাতে দিও। দেখি কি করতে পারি।"

পরের দিন শঙ্কর এল। টাকাটা নিলে। কাজও আরম্ভ করলে।

প্রথমে মজুর লাগিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করলে। দুটো হরাইজণ্ট্যাল বার বসানো হল। বড় একটা আমগাছের ডালে শক্ত দড়ি দিয়ে রিং টাঙানো হল। কুস্তির জায়গা ঠিক হল। নিজের হাতে শঙ্কর মাটি তৈরি করলে। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে শ্রীহরির দেওয়া 'ঝিলপাড়া শক্তি মন্দির' নামে চমৎকার একটি সাইন বোর্ড লিখিয়ে টাঙিয়ে দিলে দোরের মাথায়।

তারপর একদিন খুব ঘটা করে 'ঝিলপাড়া শক্তি মন্দিরের' উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

শ্রীহরি তাদের ছাপাখানা থেকে কার্ড ছাপিয়ে আনলে। সভায় সভাপতিত্ব করলেন শ্রীহরির বাবা। প্রধান অতিথি হলেন পাড়ার একজন ধনী ব্যক্তি। যাঁরা এলেন, খুব করে তাঁদের সন্দেশ খাওয়ান হল।

টাকা জোগালে শ্রীহরি।

টাকা সে কোত্থেকে আনলে শঙ্কর কিছু দেখল না। জানতেও চাইলে না।

তবে শঙ্করকে জানলে সবাই।

সবাই দেখলে প্রিয়দর্শন স্বাস্থ্যবান এক যুবক এর উদ্যোগী। পাড়ার ছেলে শ্রীহরিকে সামনে রেখে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে সে।

শ্রীহরি ত আনন্দে আটখানা হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার ফুলো ফুলো গাল দুটি যেন আরও ফুলে উঠল।

পাড়ার ছেলেরা স্বাস্থ্যের চর্চায় মন দিলে। সবাই বলতে লাগল, বাহাদুর ছেলে শ্রীহরি!

শঙ্কর রইল তার অন্তরালে। কিছুতেই চাইলে না সে নিজেকে জাহির করতে।

শঙ্কর না চাইলে কি হবে, সবারই নজর গিয়ে পড়ল তারই ওপর।

শ্রীহরি একদিন বললে, "টাকার কী হবে শঙ্করদা? আর যে টাকার জোগাড় করতে পারছি না।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন চালালি কেমন করে?"

শ্রীহরি বললে, "বাবা, মা, দাদা—সবারই কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা নিয়েছি। আর কিন্তু কেউ একটা পয়সা দিতে চাচ্ছে না।"

শঙ্কর বললে, "মেম্বার ত অনেক। তার ভেতর বড়লোকের ছেলে ত দেখি অনেক। তারা টাকা দেয় না?"

শ্রীহরি বললে, "টাকা দেবে! চাঁদাব টাকা পর্যন্ত দেয় না।"

"সব তাড়িয়ে দে।"

শ্রীহরি চুপ করে রইল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কি? ইচ্ছে করছে না?"

শ্রীহরি বললে, "না, তাড়াব কেমন কবে? বলতে কেমন যেন—"

শঙ্কর বললে, "লজ্জা করছে?"

"হ্যাঁ।"

শঙ্কর বললে, "আমি তাড়িয়ে দেব। সব গবিবের ছেলেকে মেম্বার করব। চাঁদা না দিয়ে থাকে ত তারাই থাকবে।"

শ্রীহরি বললে, "শক্তি-মন্দিরের অ্যারিস্টোক্রেসি চলে যাবে না? ছোট-লোকেব ছেলেতে ভর্তি হয়ে যাবে যে!"

শঙ্কর যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। "ছোটলোক কাকে বলছিস? গরিব হলেই ছোটলোক হয় না। আমিও গরিব।"

নিষ্ঠুর নির্মম শঙ্কব—পাথবের মত শক্ত শঙ্কর যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেল বড়লোকের বখাটে ছেলেদের অপমান কববার।

"ভাল ভাল কাপড়-জামা পরতে পার, সিগারেট ফুঁকতে পার, আর ক্লাবের চাঁদা দিতে পার না? বেরোও সব, দূর হয়ে যাও এখান থেকে!"

কতকগুলো সত্যিই চলে গেল। দু-একজন বেঁকেও দাঁড়াল। কিন্তু বাঁকাকে সোজা কবতে দেবি হল না শঙ্করের। মার খেয়ে তারা আর সে-রাস্তা মাড়ালে না। দূরে থেকে শঙ্করকে গালাগালি দিতে লাগল।

আবাব কেউ কেউ চাঁদার টাকা জমা দিয়ে শঙ্করেব আনুগত্য স্বীকার করলে।

শঙ্কর একদিন শ্রীহরিকে বললে, "চাঁদার একটা মোটা বই ছাপিয়ে নিয়ে আয় তোদের ছাপাখানা থেকে। তাতে লেখা থাকবে—দরিদ্র-ভাণ্ডার। ঝিলপাড়া শক্তি-মন্দির দ্বারা পরিচালিত। বড়লোক যারা, টাকা যারা খরচ করতে পারে,

তাদের ধরবি। বলবি, চাঁদা দাও। যে দেবে না, আমাকে দেখিয়ে দিবি তাকে।”

শ্রীহরি খাতা ছাপিয়ে আনলে। তারপর চলতে লাগল—চাঁদা আদায়। যেখানে যার বাড়িতে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন, শ্রীহরির দল দরিদ্র-ভান্ডারের খাতা নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হয়। টাকা আদায় না করে ছাড়ে না। বিয়ের কোন শোভাযাত্রা ঝিলপাড়ার কোন রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছে, খবর পাবামাত্র শক্তি-মন্দিরের ছেলেরা গিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। বলে, “আমাদের দরিদ্র-ভান্ডারে ভিক্ষা দিয়ে যান কিছু।” যাঁরা দেন, তাঁরা নির্বিবাদে পার হয়ে যান, দিতে যাঁরা চান না, তাঁদের হয় বিপদ। শক্তিমান যুবকদের হঠিয়ে দিয়ে পার হওয়া সম্ভব হয় না। শঙ্কর থাকলে ত নয়ই।

সেদিন ছিল এক মস্ত বড়লোকের ছেলের বিয়ে। খুব ঘটা করে ব্যান্ড বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা পার হচ্ছে। শক্তি-মন্দিরের ছেলেরা গিয়ে দাঁড়াল। বরকর্তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে শঙ্কর বললে, “দরিদ্র-ভান্ডারে কিছু দিয়ে যান।”

বরকর্তা হিসেবী মানুষ। কথাটাকে গ্রাহ্যই করতে চাইলেন না। বললেন, “কনের বাপ তোমাদের পাড়ার লোক, তাঁর কাছ থেকে নাওগে।”

শঙ্কর বললে, “তিনি যা দেবার দিয়েছেন আজ সকালে।”

বরকর্তা বললেন, “আমরা বাইরের লোক, আমরা তোমাদের চাঁদা দিতে যাব কোন্ দুঃখে?”

শঙ্কর বললে, “আপনি বড়লোক, তার ওপর আজ আপনার আনন্দের দিন। আপনি না দিলে দেবে কে?”

বরকর্তা কিছুতেই দেবেন না। ঘাড় নেড়ে বললেন, “না, দেব না। পথ ছাড়। বেআইনী পথ আটকে রেখো না। ভাল কাজ হবে না।”

অনেকক্ষণ ধরে অনুনয়-বিনয় করলে শঙ্কর। অনেক ভাল ভাল কথা বললে। বরকর্তার সঙ্গে যারা ছিল, তারাও বললে, “দিয়ে দাও কিছু।”

কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। বরকর্তা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, “একটি পয়সা ওরা যদি আদায় করতে পারে আমার কাছ থেকে, তাহলে জানব বাপের ব্যাটা।”

শঙ্কর এবার অন্য মূর্তি ধরলে। বললে, “বড়লোক আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত ছোটলোক, চামার আমরা এই প্রথম দেখলাম।”

“কি বললি?” বলে একজন নেমে এল গাড়ি থেকে। নেমে এল বোধ-হয় শঙ্করকে মারবার জন্যে। যেই সে হাত তুলেছে, শঙ্কর তার হাতখানা চেপে ধরলে। লোকটা ‘গেলাম গেলাম’ বলে চেঁচিয়ে উঠল। শঙ্কর তার

হাতখানা ছেড়ে দিতেই সে তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে চিৎকার করে লোক জড় করতে লাগল। বললে, "গুণ্ডা—ব্যাটা শয়তান! মার ব্যাটাকে।"

চার-পাঁচখানা গাড়ি খালি করে বরযাত্রীর দল হৈ হৈ করে ছুটে এসে আগলে দাঁড়াল শক্তি-মন্দিরের ছেলেদের। কিন্তু কেউ কারও গায়ে হাত তুলতে সাহস করলে না। মুখে যা আসে তাই বলে অপমান করতে লাগল।

ওদিকে ফুল পাতা দিয়ে হাঁসের মত সাজানো বরের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে পিছনে। বরযাত্রীদের ভিতর কে একজন তখন টেলিফোন করে থানায় খবর দিয়ে দিয়েছে।

গোলমাল তখনও থামেনি। থানা থেকে একখানা জিপগাড়ি এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামল দুজন কনস্টেবল। সঙ্গে একজন অফিসার।

বরকর্তা নিজে গাড়ি থেকে নেমে এসে থানা-অফিসারকে নমস্কার ক[রে] বললেন, "দেখুন স্যার, দেখুন, এই গুণ্ডা ছোঁড়াগুলো রাস্তার মাঝখানে আমাদের কিরকম বেইজ্জত করছে দেখুন। আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায়।"

কে একজন বললে, "ওদিকে বিয়ের লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, আর এদিকে পাবলিক রোডের ওপর দাঁড়িয়ে এই গুণ্ডামি।"

শক্তি-মন্দিরের জন-পাঁচ ছেলে মাত্র শঙ্কর আর শ্রীহরির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তখন, বাকী সব পুলিস দেখেই পালিয়েছে।

পুলিস-অফিসার শ্রীহরিকে বোধহয় চিনতেন। বললেন, "ছি-ছি, ব[ড়] অন্যায় করেছ তোমরা। ওঁদের ছেড়ে দাও।"

শ্রীহরি বললে, "আমরা কিছু অন্যায় করিনি স্যার। অত বড়লোক প্রসেশন করে ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, আমরা দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্যে কিছু ভিক্ষা চেয়েছিলাম। এরকম সবাইকার কাছেই চাই। হাসিমুখে সবাই কিছু কিছু দিয়ে যান। উনিই রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা পয়সা যদি আদায় করতে পার ত জানব বাপের ব্যাটা।"

থানা-অফিসার কৌশল করে বললেন, "থাক, তোমাদের কথা পরে শুনছি তোমরা বোস আমার এই জিপে।" বলেই তাড়াতাড়ি শঙ্কর আর শ্রীহরিকে জিপে তুলে দিয়ে বরকর্তাকে নমস্কার করে বললেন, "যান, আপনারা চলে যান।"

এই বলে নিজেও চট করে জিপে উঠে জিপ চালিয়ে দিলেন থানার দিকে। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?"

অফিসার বললেন, "থানায়।"

বরকর্তা বললেন, "কেমন জব্দ!" বলেই তিনি তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সবাইকে হুকুম দিলেন হাসতে হাসতে। বললেন, "চল।"

চল বললেই চলা যায় না। এদিকে তখন আর-এক সর্বনাশ হয়ে বসে আছে। ড্রাইভারেরা এতক্ষণ গাড়ি থেকে নেমে মজা দেখছিল। গাড়ি চালাতে গিয়ে দেখে, দু-খানা চাকায় একবিন্দু হাওয়া নেই। চাকাদুটো একেবারে মাটিতে বসে গিয়েছে।

বরকর্তা বললেন, "স্টেপনি লাগাও।"

ড্রাইভার বললে, "স্টেপনি ত একটা মশাই, এদিকে দুটো চাকাই যে পাংচার।"

ওদিকে হাঁসমার্কা বরের গাড়িখানাও তাই। সে-গাড়িরও দুটো চাকায় হাওয়া নেই।

থানার গাড়িটাও তখন নাগালের বাইরে।

রাগে ফুলতে লাগলেন বরকর্তা।

থানার সামনে জিপ গিয়ে দাঁড়াল। শ্রীহরি আর শঙ্করকে থানা-অফিসার থানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "ওখানে কিছু বললাম না। কিন্তু তোমরা খুব অন্যায় করেছ।"

কৌশল করে জিপে বসিয়ে থানায় টেনে আনার জন্য শঙ্করের মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। বললে, "আজ্ঞে না, দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু চাওয়া অন্যায় নয়।"

অফিসার বললেন, "তাই বলে রাস্তার ওপর গাড়ি আটক করে?"

শঙ্কর বললে, "গাড়ি আমরা আটকাইনি। শোভাযাত্রা কিসের জন্য জানি না, দাঁড়িয়েছিল, আর ঠিক সেই সময় আমি নিজে গিয়েছিলাম বরকর্তার গাড়ির কাছে।"

থানা-অফিসার কথা বলছিলেন আর একটা কাগজে কি যেন লিখছিলেন। লিখতে লিখতে বললেন, "তাহলেও অন্যায় করেছিলে। বাড়িতে যেতে পারতে।"

শঙ্কর বললে, "কেন যাইনি তা আপনি বুঝবেন না।"

অফিসার তাঁর চোখদুটো বড় বড় করে তাকালেন শঙ্করের দিকে। বললেন, "আমি বুঝব না?"

"আজ্ঞে না। বুঝলে জিজ্ঞেস করতেন না। কন্যাকর্তা আমাদের চেনা মানুষ, সকালে দশ টাকা দিয়েছেন, তার ওপর যখন দেখতেন তাঁর নতুন বেয়াইকে ধরেছি, তিনি তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে আসতেন, আর নয়ত দু-একটা টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়েই আমাদের বিদেয় করে দিতেন। যাক, আমরা চললাম। শ্রীহরি, ওঠ!"

অফিসার বললেন, "দাঁড়াও।"

বলেই তিনি তাঁর হাতের কাগজটা শঙ্করের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন. "এইখানে একটা সই করে দিয়ে যাও।"

অফিসার বললেন, "কিছু না। ওতে লেখা আছে শুধু পথের ওপর গাড়ি আটকে চাঁদা চাইতে যাওয়া অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের। আর কখনও এমন কাজ করব না।"

"এইতে সই কবতে হবে আমাকে? একা?"

"হ্যাঁ। শক্তি-মন্দিবেব হযে। অন্ বিহাফ অব্ ঝিলপাড়া শক্তি-মন্দির।"

শঙ্কর বললে, "শক্তি-মন্দিরের আমি কেউ নই।"

এই বলে চট্ করে থানা থেকে সে বেরিয়ে গিযে রাস্তা থেকে ডাকলে. "শ্রীহরি, সই করিসনি, চলে আয়।"

শ্রীহরিও বেরিয়ে যাচ্ছিল।

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, চিৎকার করে বললেন, "সই তুমি করবে না?"

শঙ্কবও তেমনি চেঁচিয়ে জবাব দিলে, "না।"

"তোমার নামে আমি কেস করব।"

"কবতে পাবেন।"

শ্রীহরি তখন তাব পাশে গিয়ে দাঁডিয়েছে। শঙ্কর তার হাত ধরে বললে, "আয়!"

যাবার জন্যে তারা পিছন ফিরল।

পিছন থেকে ও-সিব গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "ভাল কাজ করলে না কিন্তু। মনে থাকে যেন।"

শঙ্কর কথাটার জবাব দিলে না।

পরের দিন সকালে একটা ভাবী মজাব ব্যাপাব ঘটে গেল।

কলকাতার কাছাকাছি কোন একটা জাযগা থেকে বর এসেছিল বিয়ে কবতে। লগ্ন ছিল একটু দেরিতে। বরযাত্রীবা খেযে-দেযে স্টেশনে গিযে ট্রেন ধরে বাডি ফিবে গেল। কথা বইল, পবেব দিন সকালে এইখানে কুশণ্ডিকা সেরে টানা গাডিতে বরকর্তা বব-কনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।

রাত্রে বিযেব পর বর-কনেকে খাইযে কনের বন্ধুবা হৈ চৈ করে বরকে টেনে নিযে গিযেছিল বাসর-ঘরে। সারারাত তারা নিজেরাও ঘুমোয়নি, ববকেও ঘুমোতে দেয়নি। চাবিদিক ফর্সা হয়ে যাবার পর তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুযে বব-ছোকরাটি বেরিয়ে পড়েছিল কলকাতার রাস্তায়। চায়েব পিপাসা পেযে-ছিল বেচারাব। রাত্রি জেগে বিয়ে-বাড়িতে সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। লজ্জায চায়েব কথা কাউকে বলতে পাবেনি। ভেবেছিল, পথেব ধাবে কোনও দোকানে বসে চট করে এক পেযালা চা খেয়ে নিযেই বাড়িতে ফিরে আসবে।

কাছেই গঙ্গা। চা খেয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে বর গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। রাত্রি-জাগরণের পর গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া মন্দ লাগছিল না। তাই সে একটুখানি বসেছিল গঙ্গার কিনারে। বসে ভাবছিল গত রাত্রির আনন্দের কথা। ঘুমে কিন্তু চোখ তখন তার ভরে এসেছিল।

বেলা আটটায় কুশণ্ডিকা বসবে। আয়োজন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বরকে ডাকতে গিয়ে দেখে বর নেই। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

বাড়ির একটা ছেলে গিয়েছিল শক্তি-মন্দিরে। ফিরে এসে বললে, "ওরা বলছে, বরকর্তাকে চাঁদাটা দিতে বল, বর আমরা এক্ষুনি খুঁজে এনে দিচ্ছি।"

বরকর্তা চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ ঠিক ওদেরই কাজ। আমি এক্ষুনি থানায় খবর দেব।"

সর্বনাশ! তার চেয়ে কেলেঙ্কারির ব্যাপার আর কি হতে পারে? পাড়ায়-পাড়ায়, ঘরে-ঘরে, জানাজানি হয়ে যাবে, এই নিয়ে বিশ্রী আলোচনা চলবে, এমন কোন্ কঞ্জুসের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে হরিশ মুখুজ্যে, যে-লোকটা সামান্য চাঁদা না দিয়ে পাড়ার ছেলেগুলোকে এমন ক্ষেপিয়ে দিলে যে, কুশণ্ডিকার দিন জামাই চুরি হয়ে গেল? মেয়েও ত চুরি হয়ে যেতে পারত!

রাত্রে মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ এখন পাকা। হরিশ মুখুজ্যে ছুটে গিয়ে বেয়াই-মশাইয়ের হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "যাক, আর থানা-পুলিস করে কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না বেয়াই, ছেলেদের চাঁদা আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

বরকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দিতে হবে?"

হরিশ মুখুজ্যে বললেন, "ওরা যা চায়, যাতে খুশী হয়।"

"এমনি করে করে আপনারাই মাথায় তুলেছেন ওদের।"

হরিশ মুখুজ্যে বললেন, "না বেয়াই, ওরা আমাদের অনেক উপকার করে। এই পাড়াটা ছিল চোরের আড্ডা। মোটরকার যাদের আছে, তারা ত পাগল হয়ে গিয়েছিল। রোজ রোজ পার্টস চুরি যেতে লাগল। পশুপতি ভট্টাচার্যের গাড়িকে গাড়ি সাফ। ওই ছেলেরাই বাঁচালে। শঙ্কর বলে যে-ছেলেটি আছে, একদিন সে বামাল সমেত ধরে ফেললে এক-ব্যাটা চোরকে, তারপর তাকে এই ক্লাব-ঘরে-না-ঢুকিয়ে এমন মার মারলে যে, ব্যাটা তিনদিন পড়ে রইল ওইখানে। বাস্, চুরি গেল বন্ধ হয়ে।"

বরকর্তা বললেন, "ওদের শুধু মারলে কিছু হয় না। যে অভাবের জন্যে চুরি করে, সেই অভাবটা ওদের মিটিয়ে দিতে হয়।"

হরিশ মুখুজ্যে মুখ টিপে একটু হাসলেন শুধু। যে-কথা এর জবাবে

বলা উচিত, নিজে কনের বাপ হয়ে বরের বাপকে সে-কথা সাহস করে বলতে পারলেন না। তাঁর ভাগ্নে শক্তি-মন্দিরের একজন সভ্য। ডাকলেন, "সুধা!"

সুধা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বললে, "বলছেন কিছু?"

হরিশ মুখুজ্যে বললেন, "ডাক বাবা ওদের কাউকে। আমি এই হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলি।"

বরকর্তা বললেন, "হ্যাঁ, মিটিয়ে ফেলুন। কুশণ্ডিকার যত দেরি হবে, আমাদের ফিরে যেতেও তত দেরি হয়ে যাবে।"

সুধা বললে, "ওরা কেউ এখানে আসবে না মামা, টাকা নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে।"

বরকর্তা আবার বললেন, "হ্যাঁ যান। যা লাগে আপনিই এখন দিয়ে দিন। আমার টাকা বের করা আবার অনেক হাঙ্গামা, সুটকেশে চাবি বন্ধ করে রেখেছি। চাবিটা আবার মনের ভুলে কাল চলে গেছে আমার বড় ছেলের সঙ্গে।"

এবার হাসতে গিয়েও পারলেন না হরিশ মুখুজ্যে। কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোধকরি একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি।

সুধাকে বললেন, "একটু দাঁড়া বাবা, আমি আসছি।"

দোতলায় উঠে গিয়ে টাকা সঙ্গে নিয়ে হরিশ মুখুজ্যে নিজে গেলেন শক্তি-মন্দিরে। তারপব তাঁর বড়লোক বেয়াইএর সম্মান রক্ষা করে তাঁরই নামে চাঁদা দিয়ে এলেন পঞ্চাশ টাকা।

নির্বিঘ্নে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হয়ে গেল।

এই মজার ব্যাপারটা নিয়ে ঝিলপাড়াব ঘরে ঘরে আলোচনা চলতে লাগল। শঙ্করকে যারা চিনত না তারাও চিনলে। তার খ্যাতি যেন আর-একটু বেড়ে গেল ঝিলপাড়ায়।

এদিকে যখন এই অবস্থা, ওদিকে শঙ্করের সংসারে তখন দারুণ অনটন।

বিমলা বললে, "বেশ ত চালাচ্ছিলি, এখন আবার এ কিরকম হল বল দেখি?"

শঙ্কর বললে, "ভাল লাগছে না মা।"

বিমলা এতদিন বাড়িতেই বসেছিল। শঙ্কর তাকে কাজ করতে দেয়নি। এবার আর সে শঙ্করকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। বেরিয়ে গেল কাজের সন্ধানে।

কলকাতা শহরে বিমলার মত মেয়ের কাজের অভাব হল না। তিনদিন এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে বেড়াবার পর চারদিনের দিন তার কাজ জুটে গেল।

যত বয়স বাড়ছে, কিরকম যেন হয়ে যাচ্ছে শঙ্কর। কেমন যেন রূঢ়,

নির্মম, নিষ্ঠুর একটা মানুষ। কেমন যেন অশিক্ষার ছাপ পড়ছে তার মুখে।

মার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

বিমলা চঞ্চল হয়ে উঠল। এর প্রতিকার করতে হবে।

কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথই ত তার জানা নেই। মমতাময়ী মা হলে কি হবে, তারও ত শিক্ষাদীক্ষার একান্ত অভাব।

যে-বাড়িতে কাজ পেয়েছে বিমলা, সে-বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াতে দেয় না শঙ্করকে। দুবেলা সে গামছায় বেঁধে খাবার নিয়ে আসে। মা ছেলে বসে বসে খায়।

বাড়ির গিন্নী বলেন, "হ্যাঁ গা মেয়ে, তুমি এইখানে খেয়ে গেলেই পার। বাড়িতে মাছ-মাংস রান্না হয়, শুনছি তুমি ও-সব কিছু নিয়ে যাও না। ছেলেকেও রোজ রোজ নিরামিষ খাওয়াচ্ছ কেন মা?"

বিমলা বলে, "মাছ-মাংস আমার ছেলে তেমন পছন্দ করে না।"

"ছেলে কত বড়?"

বিমলা বলে, "তা কুড়ি-বাইশ বছরের হল।"

গিন্নী বলেন, "ছেলে লেখাপড়া শিখছে?"

"না মা, পয়সা নেই, লেখাপড়া শেখাতে পারলাম না।"

গিন্নী বলেন, "কাজকর্ম কিছু শেখালে না কেন? রোজগার করত।"

বিমলা বলে, "রোজগার যে একেবারে করে না তা নয়। তবে বুঝতেই ত পারছ মা, আজকালকার দিনে মাথার ওপর একজন কেউ না থাকলে কিছু হয় না।"

গিন্নী বললেন, "ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে কলকাতা শহর, ছেলে খারাপ হয়ে যাবে।"

বিমলা বললে, "ঠিক বলেছ মা। সেই চেষ্টাই করি।"

কথাটা বিমলার বেশ মনে ধরে গেল। গিন্নী-মা ঠিকই বলেছে। শঙ্করের মাথার ওপর একটা দায়িত্ব থাকা ভাল।

তাছাড়া নিজেরও ত একটা সাধ-আহ্লাদ আছে। ছেলে-বউ নিয়ে ঘর করবার ইচ্ছে কার না হয়?

বিমলা শঙ্করকে কিছু জানালে না। ভিতরে ভিতরে একটি মেয়ের সন্ধান করতে লাগল।

গিন্নী-মার দাসীকে একদিন সেকথা বলেছিল বিমলা। অনেককেই বলেছিল একটি মেয়ের কথা।

কিন্তু রাঁধুনী-বামনীর ছেলের জন্য বউ পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। গিন্নীর দাসীকে বিমলা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "একটি মেয়ের কথা তোমাকে বলেছিলাম, সন্ধান করেছিলে?"

দাসী তার মুখটা কেমন যেন অদ্ভুত রকমের করে বললে, "না মা, যে-সব

বাড়িতে যাই, সে-সব বাড়িতে কি তোমার ছেলের জন্যে মেয়ে পাওয়া যায়? তোমার ছেলের বউ খোঁজা আমার কম্ম নয়।"

নাপিত-বউ এসেছিল গিন্নী-মাকে আল্‌তা পরাতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা সে শুনলে। বললে, "এ-কথা আমাকে বলনি কেন মা? আমার হাতে একটি মেয়ে আছে। আমার বাড়ির পাশেই থাকে।"

নাপিত-বউকে বিমলা একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "মেয়েটি কত বড়?"

নাপিত-বউ বললে, "তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে, পরমা সুন্দরী, দেখলে মনে হয় পনর-ষোল বছর বয়েস। বাপ কিন্তু খুব গরিব, সে-কথা আমি আগেই বলে রাখছি।"

বিমলা বললে, "আমার ছেলে কিন্তু রাজপুত্রের মত দেখতে। নিজের ছেলের কথা নিজের মুখে বলা সাজে না। তুমি যদি একদিন বেড়াতে বেড়াতে আসতে পার আমার বাড়িতে ত দেখিয়ে দিই আমার ছেলেকে।"

নাপিত-বউ কিন্তু আগে ছেলে দেখতে রাজি হল না। বললে, "না মা, আগে তুমি বরং একদিন এস আমার বাড়িতে। মেয়েটি তোমাকে দেখিয়ে দিই। এই ত কাছেই আমার বাড়ি। নয়ান সুর লেন ধরে সোজা চলে যাবে। রাস্তার বাঁদিকে দেখবে একটা কেষ্টচুড়োর গাছ। সেই গাছটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে—খ্যাপার বস্তি কোন্‌দিক দিয়ে যাব। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে। তারপর খ্যাপার বস্তিতে ঢুকে বাঁদিকে দেখবে একটা পুকুরে ধোপারা কাপড় কাচছে। সেইখানে গিয়ে নেত্য নাপতিনীর বাড়ি খুঁজবে। ছোট ছেলেটি পর্যন্ত জানে আমার বাড়ি।"

সেই কথাই ঠিক রইল।

বিমলা বললে, "আমি আর দেরি করতে চাই না মা। কালই যাব।"

বিমলা ভেবেছিল শঙ্করকে কিছু জানাবে না। কিন্তু না জানিয়ে থাকতে পারলে না। নেত্য নাপতিনীর বাড়ি যাবার আগে ছেলেকে জানিয়ে যাওয়াই ভাল। ছেলে যদি শেষে বেঁকে বসে ত সব কিছু তার মিছে হয়ে যাবে।

মা আর ছেলে দুজনেই খেতে বসেছিল। বিমলা বললে, "আমার একটা কথা রাখবি বাবা?"

শঙ্কর বললে, "তোমার কথা কবে রাখিনি মা?"

বিমলা বললে, "মানুষের মরা-বাঁচার কথা কিছু বলা যায় না বাবা, আমি যদি ঝট করে কোনদিন মরে যাই ত আমার মনের সাধ মনেই থেকে যাবে।"

শঙ্কর ভেবেছিল মা বুঝি তার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করবার কথা বলছে। বললে, "না মা, তুমি এখন মরবে না, মরতে তোমাকে আমি দেব না। ময়না-

বুনি আমি একদিন যাবই। তারপর তোমার অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব, তুমি দেখে নিও।"

বিমলা বললে, "সেকথা আমি বলিনি শঙ্কর। বর্ধমান জেলায় ময়নাবুনি তোকে একদিন যেতেই হবে। সম্পত্তি ফেরাতে পারবি কিনা জানি না, তবে সেখানে তোর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা একটা হবেই তা আমি জানি। আমি কিন্তু অন্য কথা বলছি।"

শঙ্কর বললে, "কি কথা, বল।"

বিমলা বললে, "বউ নিয়ে ঘর করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে বাবা, এবার তোমার একটি বিয়ে দেব। খুব ভাল একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি।"

শঙ্কর কেমন যেন একটুখানি চিন্তিত হয়ে উঠল। "বিয়ে?"

"হ্যাঁ বাবা, নিজের মেয়ে নেই, কত সাধ হয়, মেয়ের মত পিছু পিছু ঘুরবে, মা মা বলে ডাকবে, ঘরেব কাজকর্ম করবে—"

কথাটা শঙ্কর তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, "সবই বুঝলাম মা, কিন্তু তোমার তাহলে আর পরের বাড়িতে কাজ করা চলবে না।"

বিমলা বললে, "খুব চলবে। যে আসবে সে খুব গরিবেব মেয়ে। আমি কাজ করব, ওইখানে খেয়ে আসব। ভাত না আনলে ওবা আমাকে তিরিশ টাকা মাইনে দেবে। তাব ওপব তুই যদি আর কুড়ি পঁচিশটে টাকা আনতে পারিস, তাহলেই তোদেব দুটি মানুষেব খরচ দিব্যি চলে যাবে। বউমা তোদের দুজনের রান্না করবে। আমি সব গুছিয়ে-টুছিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব। তুই আর অমত কবিস না বাবা।"

কথাটা শঙ্কবেব বেশ ভালই লাগছে। ভাল লাগবারই বয়স। সুন্দরী একটি ছোট্ট মেয়ে হবে তার জীবনসঙ্গিনী। মায়ের মনেব সাধ পূর্ণ হবে। মন্দ কি?

শঙ্কর সম্মতি দিলে।

নেত্য নাপতিনীব বাড়ি খুঁজে বেব কবতে একটুখানি বেগ পেতে হয়েছিল অবশ্য বিমলাকে। কৃষ্ণচূড়ার গাছও পেয়েছিল, খ্যাপাব বস্তিও পেয়েছিল, পুকুরও পেয়েছিল—ধোপাও পেয়েছিল, কিন্তু যে-লোকটিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে ছিল হিন্দুস্থানী। বাংলা "বাত" সে বোঝে না বলেই হোক কিংবা কাপড় কাচতে কাচতে অন্যমনস্ক ছিল বলেই হোক, নেত্য নাপতিনীব বাড়িটা যেদিকে, ঠিক তার উলটো দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল সে। শেষে সারা বস্তিটা ঘুরে ঘুরে একে জিজ্ঞাসা করে ওকে জিজ্ঞাসা করে হয়রান হয়ে গিয়ে আবার ঠিক সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে।

সামনেই নেত্যব বাড়ি। বিমলাকে দেখেই সে আহ্লাদে একেবারে আট-খানা হয়ে গিয়ে একটা আসন পেতে দিয়ে বললে, "বোস মা, আগে একটু

জিরিয়ে নাও। তারপর আমি ডেকে আনছি মেয়েটাকে। পছন্দ যদি হয় ত তখন দেখা করব ওর বাপের সঙ্গে।"

বিমলা বললে, "নেত্য, তুমি আমাকে একঘটি জল দাও আগে। পা দুটো ধুয়ে নিই। ধুলোয় কাদায় পায়ের কি অবস্থা হয়েছে দ্যাখো।"

নেত্য বললে, "এস আমার সঙ্গে।"

খোলার ছোট ছোট তিনটি ঘর, কিন্তু বেশ গুছানো সংসার। বাড়িতে জলের কল নেই। বাইরের টিউবওয়েল থেকে জল ধরে আনতে হয় নেত্যকে। ছোট্ট একটুখানি জায়গা বাঁশের দরমা দিয়ে ঘিরে স্নানের ঘর করা হয়েছে। বড় বড় দুটো টিনের ড্রামভর্তি জল দেখিয়ে দিযে নেত্য বললে, "হাত-পা ধুয়ে এস মা, আমি মেয়েটাকে ডেকে আনি।"

পাশেই দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে বাপ আর মেয়ে। বাপের অবস্থা একসময় নাকি বেশ ভালই ছিল। নিজের একখানা ট্যাক্সি ছিল, নিজেই চালাত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোগে শোকে ভদ্রলোক একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সিটা দিয়েছে তাব এক শালাকে। সে-ই এখন দয়া করে যা দিয়ে যায তাইতে তাদেব সংসার চলে।

নেত্য গিয়ে ডাকলে, "ডলি।"

ডলি একটা ঝাঁটা হাতে নিযে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। বললে, "কী!"

নেত্য দেখলে তার পরনের শাড়িটা ময়লা। কাছে গিয়ে বললে, "চট কবে একটা ফর্সা জামা-কাপড় পরে এস ত একবার আমার সঙ্গে।"

ডলি তক্ষুনি হাতের ঝাঁটাটা নামিযে রেখে ঘরে গিযে ঢুকল।

ডলির বাবা একটু দূরে বসে বসে বিড়ি টানছিল আর কাশছিল। কাশির ধমকটা একটু থামলে জিজ্ঞাসা করলে, "ডলিকে কি বলছ নেত্য?"

নেত্য বললে, "ওকে একবার নিযে যাব আমার বাড়িতে। বিয়ের একটা সম্বন্ধ এনেছি।"

বাপ বললে, "মেলগোত্র মিলবে ত ঠিক? আমবা চাটুজ্যে। কাশ্যপ গোত্র।"

নেত্য বললে, "ও-সব পরে মেলাবে দাদা, আগে পছন্দ হোক।"

বাপ আবার খানিকটা কেশে নিলে। তারপর বললে, "আগেই বলে রাখছি নেত্য, একটি পয়সা আমি দিতে পারব না।"

নেত্য এবার তার কাছে এগিয়ে এল। বললে, "তা বললে চলবে কেন দাদা? ছেলের বিয়ে ত নয়, মেযের বিয়ে, কিছু খরচ করতে হবে বইকি।"

"পাব কোথায়?"

নেত্য বললে, "কেন, তোমার সেই শালা দেবে।"

বাপ বললে, "সে ত সবই দিচ্ছে গো। সেই ত এখন ওর গার্জেন।"...

এই বলে আবার সে কাশতে লাগল।

কাপড় ছাড়তে এত দেরি কেন হচ্ছে?

নেত্য ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখলে, ডলি কাপড়-জামা ছেড়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

ডলিকে দেখে বিমলার ভারী পছন্দ!

"ও মা, এ যে বেশ মেয়ে!"

নেত্য বলে, "প্রণাম কর ডলি, ইনি তোমার শাশুড়ী হবেন।"

ডলি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাত বাড়িয়ে বিমলার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বিমলা আশীর্বাদ করে মুখখানি তার তুলে ধরে বললে, "না নেত্য, বয়েস তের-চোদ্দ বলেছিলে, তা নয়, আর-একটু বেশী।"

নেত্য বললে, "কি জানি মা, বলে ত চোদ্দ।"

মেয়ে বেশ স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, মাথায় একমাথা চুল, গায়ের রং ফর্সা, হাত-পায়েব বেশ নিটোল গড়ন। সব রকমেই ভাল, শুধু বয়স একটু যেন কম হলেই ভাল হতো।

বিমলা ভাবে, সেরকমটি পাচ্ছি-বা কোথায়?

তা শঙ্কর তার বয়েসের তুলনায় যেবকম জোয়ান, এ-মেয়ে তার সঙ্গে বেমানান হবে না।

বিমলা ডলিকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "গরিবের ঘরে যেতে তোমার আপত্তি নেই ত মা?"

কথাটার জবাব দিতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ডলি। তবু সে লজ্জাশবমের মাথা খেয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে তার আপত্তি নেই।

বিমলা নেত্যর দিকে ফিবে তাকিয়ে বললে, "দেখা আমার শেষ হয়ে গেছে নেত্য। দেনা-পাওনার কথা কি আর বলব। মেয়ের বাবা কিছু দিতে পারবে না তা আমি শুনেছি। আমার ছেলেকে ওঁরা কবে দেখতে যাবেন জিজ্ঞেস কবে এস।"

ডলিকে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে নেত্য ফিরে এল।

বিমলা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিল, নেত্য বললে, "না মা, ডলির বাবা কিছু করতেও পারবে না, কিছু বলতেও পারবে না। ডলির এক মামা আছে, আমি দেখেছি—মিনষে ট্যাক্সি চালায়। সে-ই ওদের সব দেখাশোনা করে, টাকাকড়ি দেয়। ডলির বাবা বললে, আসছে রবিবার-দিন দুপুরে সে যাবে আপনার বাড়ি। ছেলেকে দেখে একেবারে আশীর্বাদ সেরে দিন-টিন করে আসবে। লোকটা কিন্তু ভাল নয়, মদ খায়।"

"তা খায় ত খায়, আমাদের কী?"

বলে বিমলা উঠল। বললে, "তাহলে এই কথা রইল। রবিবার আমি তাহলে সকাল-সকাল বাড়ি চলে যাব।"

এই বলে চলে যেতে যেতে বিমলা দোরের কাছে ফিরে দাঁড়াল। বললে, "এই দ্যাখো, আসল কথাটাই যে তোমরা ভুলে গেছ।"

নেত্য জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

"আমি কিন্তু ভুলিনি।"

বিমলা তার কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা একটি কাগজের টুকরো বের করে নেত্যর হাতে দিয়ে বললে, "আসবার সময় শঙ্করকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছি। আমার বাড়ির এই ঠিকানাটি ওদের দিও। নইলে ডলির মামাই বল আর বাবাই বল- যাবে কেমন করে?"

নেত্য বললে, "এর জন্য আটকাত না মা। ঠিক সময়ে আমি নিয়ে আসতাম তোমার কাছ থেকে।"

বিমলার বাড়ির দোর পর্যন্ত গাড়ি যায় না।

রবিবার দুপুরে একখানা ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল বড় রাস্তায়। ট্যাক্সি থেকে নামল দুজন লোক। একজন ডলির মামা পল্টুবাবু, সঙ্গে আর-একজন ছোকরা—বোধকরি তার সাকরেদ।

বিমলার কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে পল্টুবাবু ঠিক এসে হাজির হল শঙ্করের বাড়ির দরজায়।

এরা আসবে বলে দোরটা খুলেই রেখেছিল শঙ্কর। তবু সেই খোলা দরজার শিকল ধরে বারকতক নাড়া দিয়ে পল্টু বললে, "কে আছেন বাড়িতে?"

গলাটা কেমন যেন ধরা-ধরা।

মা ও ছেলে তৈরি হয়েই ছিল। শঙ্কর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে, "আসুন!"

বছর-চল্লিশেক বয়স, বেঁটে খাটো কালো রঙের একটা শক্ত চেহারার মানুষ। বললে, "নাম-টাম কিসসু জানি না স্যার, এসেছি পাত্তোর দেখতে। আমি ডলির মামা। মানে, আপন-মামা নই, সম্পর্কে আঙ্কেল।"

লোকটির গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতদুটো গুটনো, পায়ে কালো রঙের পাম্প্-শু চকচক করছে, একেবারে নতুন।

শঙ্করের পিছু পিছু আসতে আসতে আঙ্কেল একবার হোঁচট খেলে। সঙ্গের লোকটি তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেললে। শঙ্কর পিছন ফিরে দেখলে। দেখলে, তার চোখদুটো লাল, কথাগুলোও কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। তবে কি এই ভরা দুপুরে সে মদ খেয়েছে নাকি?

পল্টু নিজেই সামলে নিলে। বললে, "পায়ে চলা ত অভ্যেস নেই, হরদম মোটরেই থাকি। গাড়ি চালাই, তাই বলে গাড়োয়ান নই। ড্রাইভার। ট্যাক্সি-ড্রাইভার। নাও, জলদি জলদি সারো, এইখানে বসব?"

ঘরের ভিতর একটা চৌকি সরিয়ে দিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসবার জায়গা করা হয়েছে। শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওখানেই বসুন।"

পল্টু জুতো খুলে বসল। সঙ্গের লোকটি তাকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসল তার পাশে।

দুটি রেকাবিতে কয়েকটি রসগোল্লা আর সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকল বিমলা। রেকাবি দুটি হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বোধকরি জল আনতে গেল।

পল্টু তাকিয়ে দেখলে। বললে, "ও, তুমিই বুঝি ছেলের মাদার?"

তাকাবার, কথা বলবার ভঙ্গি দেখে শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলে গেল। লোকটি মদ খেয়েছে কিনা কে জানে, কিন্তু অভদ্র যে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জলের গ্লাস দুটি নামিয়ে দিতেই পল্টু আবার তাকালে বিমলার দিকে। বললে, "এ-সব কেন?"

বিমলা বললে, "মিষ্টিমুখ করতে হয়।"

পল্টু বললে, "আমার এ-সময় চলবে না। হাবা, তুই খা।"

সঙ্গের ছোকরাটির নাম হাবা। তাকে বলবার দরকার ছিল না, সে তখন খেতে আরম্ভ করেছে। বলবামাত্র পল্টুর রেকাবির মিষ্টিগুলি সে তার নিজের রেকাবিতে তুলে নিলে।

পল্টু বললে, "কই, দেখি এবার, ছেলেটিকে দেখি। আমার কাজ আছে। তবে হ্যাঁ, দেখবার আগেই বলে রাখি—ডলিকে আমি যেখানে-সেখানে দেব না। এতে যদি তার বিয়ে না হয় ত না হবে।"

বিমলা এবার কথা বললে। "যেখানে-সেখানে দেবেন না বলছেন, ওদিকে মেয়ের বাপ ত বলেছেন—একটি পয়সা খরচ করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

পল্টু বলে উঠল, "হু ইস্ দি মেয়ের বাপ? আমি সব। আমি যা বলব তা-ই হবে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা খরচ করবেন আপনি?"

পল্টু বললে, "নাথিং। ইংলিশ-মেক গাড়ি—যত বয়েসই হোক, বাজারদর তার চড়েই আছে। ডলির মতন সুন্দরী মেয়ে—কত ব্যাটা লুফে নেবার জন্যে হাঁ-হাঁ করছে। সিনেমা-কোম্পানীতে দিতে চাই না, তবু ব্যাটারা খবর পেয়ে সেদিন আমাকে শ্যামবাজার ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে ধরেছে। বলে, দিন ওকে, আমরা হিরোইন করব। .কই দেখি, তোমার ছেলে দেখি।"

আবার 'তুমি!'

বিমলা বললে, "ছেলে ওই আপনার চোখের সামনে বসে।"

পল্টু এবার শঙ্করের দিকে ভাল করে তাকালে। তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে, "হুঁ, চেহারা ত দেখছি পাকাপোক্ত। ফিফ্‌টিন হর্স পাওয়ার। কি করা হয় শুনি?"

শঙ্কর যা-হোক কিছু একটা বলে দিতে পারত, কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই তার মা এগিয়ে এল। বললে, "ছেলে আমার মস্ত বড়লোকের ছেলে বাবা। কপালদোষে আজ এইখানে এসে পড়েছি। বর্ধমান জেলার ময়না-বুনিতে ওর বাবার যে সম্পত্তি আছে তা যদি ও উদ্ধার করতে পারে ত ওর আর কিছু করবার দরকার হবে না, ও-ই কত লোককে খেতে দেবে।"

বড়লোকের ছেলে?

পল্টু তার লাল চোখদুটো তুলে একবার তাকালে বিমলার দিকে।

বিমলা বললে, "ময়নাবুনিতে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে পারেন।"

"দরকার হবে না।" পল্টু বললে, "সম্পত্তি যদি উদ্ধার করতে পারে—সেই আশায় বসে আছে যে-ছেলে, সেই ছেলের সঙ্গে ডলির বিয়ে দেব? ওরে হাবা!"

সঙ্গের ছোকরাটি তখন এক গ্লাস জল শেষ করে আর একটা গ্লাসে হাত দিয়েছে।

পল্টু বললে, "এর দেখছি ইঞ্জিনেই গোলমাল। এ চালু হতে দেরি আছে। নে আর ঢক্-ঢক্ করে জল খেতে হবে না। ওঠ।"

উঠে দাঁড়াল পল্টু। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী হাবাও উঠল।

বিমলা বললে, "এরই মধ্যে উঠে পড়লেন?"

পল্টু বললে, "আমার গাড়ির হ্যাণ্ডেল মারতে হয় না। সেল্‌ফে হাত দিয়েছে কি চোঁ—সট। আমার সব কাজেই এমনি।"

বিমলা কি বলবে কিছুই যেন বুঝতে পারলে না। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, "তাহ'লে কি—"

কথাটা শেষ হল না। শেষ করতে দিলে না পল্টু। বললে, "ছেলে তার বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করুক আগে। তারপর কথা হবে।"

বিমলা এবার স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, "বিয়ে কি তাহলে আপনারা দেবেন না?"

পল্টু পরিষ্কার জবাব দিলে। বললে, "না। চাকায় পাঞ্চার-টাঞ্চার হতো ত না-হয় সারিয়ে-সুরিয়ে নেওয়া যেত। এ হচ্ছে গিয়ে ইঞ্জিনে গোলমাল। এ-গাড়িতে আমরা হাত দিই না।"

হাবা ডিটো মারলে। ঘাড় নেড়ে বললে, "ঠিক।"

বিমলা বললে, "মেয়েটাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল বাবা।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে কটমট করে তাকালে।

পল্টু বললে, "হেঁ-হেঁ বাবা, মেয়ে একেবারে রোল্‌স-রয়েস্‌! যেমন বডি তাব তেমন ইঞ্জিন।"

বিমলা বললে, "কি জানি বাবা। আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি না।"

শঙ্কর রাগে ফুলছিল। এবার সে চিৎকার করে উঠলো, "মা!"

পল্টু বললে, "অমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল। রাগ হচ্ছে?"

জবাব দিতে পারলে না শঙ্কর। একটা জবাব মাত্র তার জানা ছিল। একটি ঘুঁষি মেরে লোকটার দাঁতগুলো সে ভেঙে দিতে পারত। সেইটেই হতো এর একমাত্র জবাব। কিন্তু সে-জবাব সে দিতে পারলে না। কোথায় যেন বাধল।

পল্টু কিন্তু থামল না। জুতো দুটো পায়ে দিতে দিতে বললে, "নেত্য নাপতিনীর কাছে আমি সব শুনেছি। মা তোমার কোন্‌ এক বাড়িতে রান্না করে আর তুমি সেই মায়ের রোজগারে বসে বসে খাও। শুধু চেহারা দেখিয়ে বিয়ে হয় না। বাপের সম্পত্তি উদ্ধার কর আগে। তারপর বিয়ের কথা হবে। এখন থাক।"

শঙ্কর এবার কথা না বলে পারলে না। বললে, "তখন তোমার মত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ভাগ্নীকে বিয়ে সে করবে না—এই যা দুঃখু।"

পল্টু বললে, "আচ্ছা দেখা যাবে। মিটার চালু রইল। তখন না হয় তুলে দেব।"

এই বলে তারা দুজনেই চলে গেল।

শঙ্কর গিয়েছিল সদর দরজাটা বন্ধ করতে। ফিরে এসে দেখলে, মা তার বসে বসে কাঁদছে।

শঙ্কর অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। তাকে দেখেই বিমলা তাব চোখের জল মুছে ফেলছিল। শঙ্কর বললে, "ছি ছি, কাঁদবার কি হয়েছে মা? তুমি কাঁদছ?"

বিমলা বললে, "মানুষ করতে এনেছিলাম তোকে কলকাতায়। তা এমনি মানুষ হলি যে কেউ তোর হাতে মেয়ে পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না!"

শঙ্কর বললে, "আচ্ছা দেয় কি না দ্যাখো।"

বিমলা উঠে দাঁড়াল। বললে, "আর দেখতে চাই না বাবা। দেখতে অনেক কিছু চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম, তোর বিয়ে দেব, ছেলে-বউ নিয়ে দেশে যাব। তোর বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করে তোদের সেখানে বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তা সে সব ত আমার সবই হল। এখন মরণ হলেই বাঁচি।"

শঙ্কর আর যাই করুক, মাকে সে ভালবাসে। মা এই সব কথা বললে সত্যিই তার কষ্ট হয়। বললে, "মরতে তোমায় দেবে কে?"

এত দুঃখেও মা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "দিবি না মরতে?"

শঙ্কর বললে, "না। তুমি যাতে না মব, তার ব্যবস্থা আমি করছি।"

তা ব্যবস্থা একটা সে করলে।

ঝিলপাড়া শক্তিমন্দিরের হয়ে একদিন একটা বিয়ে বাড়িতে চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিল শঙ্কর। সেখানে পরিচয় হয়েছিল একজন ঘটকের সঙ্গে। রোগা-পট্‌কা নিতান্ত দরিদ্র একটি মানুষ। বিয়ের ঘটকালি আর লটারিব টিকিট বিক্রি করা ছিল তার পেশা। নাম ছিল দাসু।

দাসু সেইদিন শক্তিমন্দিরেব খোঁজ পেয়ে গেল। জানতে পারলে, রোজ সেখানে অনেকগুলি ভাল ভাল অবিবাহিত ছেলে-ছোকরা আসে ব্যায়াম শিখতে।

তারপর থেকেই শক্তিমন্দিরে দাসুর শুভাগমন হতে লাগল খুব ঘন ঘন।

শঙ্কর একদিন তাকে ধবে বসল, "বোজ রোজ কী জন্যে আস তুমি এখানে?"

দাসু বললে, "লটারির টিকিট বিক্রি করতে।"

শঙ্কর বললে, "ওটা তোমার ছল। তুমি আস তোমার মক্কেল পাকড়াতে।

দাসু নির্লজ্জের মত হাসতে লাগল।

তা সত্যি বলতে কি, লজ্জাশরমেব বালাই তার ছিল না।

দাসু নিজেই একদিন বলে বসল, "ও-সব থাকলে আমাদেব চলেও না।"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, তুমি আর এখানে এস না। আমার ক্লাবেব ছেলেদের আর বিয়েব লোভ দেখিয়ো না। বিয়ে ওরা কেউ করবে না।"

দাসু বললে, "আচ্ছা, আর আসব না।"

কিন্তু তবু আসে।

রঙিন কাপড়ের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিযে পা টিপে-টিপে এসেই আগে দেখে, শঙ্কর আছে কিনা, তারপর হাসতে হাসতে ক্লাব-ঘরেব ভিতরে ঢুকে বেশ জাঁকিয়ে বসে বিড়ি ফুঁকতে থাকে।

আসর জমাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ।

কত মজার মজার গল্প শোনায়। কত বিয়ের ব্যাপারে কত লোককে সে ফাঁকি দিয়েছে, কত কুলীনেব সঙ্গে কত শ্রোত্রীয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, কত জায়গায় ধরা পড়ে কত মার খেয়েছে—নিঃসঙ্কোচে এইসব কথা বলে আব ফিক ফিক করে হাসে।

শঙ্কর তাকে দেখতে পেলেই তার ঘাড়ে একটি রদ্দা মেরে তাকে অভ্যর্থনা করে। তাই শঙ্করকে দেখলেই হয় সে খানিকটা দূরে সরে যায়, আর নয়ত হাত দুটো আড়াল করে বলে, "মের না, মের না ভাই, মরে যাব। কি শক্ত হাত রে বাবা, মাথা ঝনঝন করে ওঠে।"

দাসু একদিন শঙ্করকে একা পেয়ে বললে, "তোমার যদি একটি বিয়ে দিতে পারতাম মাইরি, মেয়েটা আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিত।"

শঙ্কর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

দাসু বললে, "আরে ভাই, ছেলে কোথায় আমাদের দেশে? সব ত আমার মতন রোগা-পট্‌কা, আর নয়ত নাদুশ-নুদুশ একটা মাংসপিণ্ড। জোয়ান-জোয়ান সুন্দর মেয়ের সঙ্গে এইসব ছেলের বিয়ে দিই। সত্যি বলছি, দেখে কষ্ট হয়।"

শঙ্কর সেদিন বলেছিল, "থাক, আর আমার বিয়ে দিতে হবে না। তুমি যাদের বিয়ে দিচ্ছ তাদেরই দাওগে যাও।"

তারপর হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, দাসু আর শক্তিমন্দিরে আসে না। সবাই ভাবলে, বুঝি এখানে তার বিশেষ কিছু সুবিধা হল না বলে সে তার আসা বন্ধ করেছে।

শঙ্কর সেদিন একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ল, দাসু ট্রাম থেকে নামছে। কাঁধে তার সেই কাপড়ের ঝুলিটা ঠিক তেমনিই আছে। দেখে মনে হল আর একটু যেন রোগা হয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর তারই দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু শঙ্করকে প্রথমে সে দেখতে পায়নি। যেই মুখ তুলে তাকিয়ে সে শঙ্করকে দেখেছে, আর অমনি পিছন ফিরে দে ছুট।

শঙ্কর ডাকলে, "দাসু!"

দাসু শুনেও শুনলে না।

বাধ্য হয়ে শঙ্করকেও ছুটতে হল।

একটুখানি ছুটেই দাসু তখন হাঁপিয়ে পড়েছে। শঙ্কর কাছে আসতেই দাসু দুহাত তুলে বলে উঠল, "মের না ভাই, মাইরি বলছি মরে যাব। আমার কোনও দোষ নেই, মাইরি বলছি তুমি শোন আগে।"

শঙ্কর তার হাতখানা চেপে ধরে বললে, "আমি তোমাকে মারবার জন্যে আসিনি দাসু। শোন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মজা দেখবার জন্যে রাস্তায় লোক জড় হয়ে গিয়েছিল। শঙ্কর তাকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। দাসুর ভয় তখনও যায়নি। সে তখনও বলে চলেছে, "আমি কি করব, আচ্ছা তুমিই বল না, আমার হচ্ছে গিয়ে এই

পেশা। জলজ্যান্ত অত বড়লোক বাপ বেঁচে রয়েছে, আমি বললাম তা বিয়ে করবি ভাল কথা, চল আমি তোর বাপের কাছে যাই। তা সে বললে, না. আমি বাবাকে না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করব। ওর ধারণা বি-এ পাশ না করলে বাপ বিয়ে দেবে না, আর ইদিকে ছেলে একেবারে অঘামারা অচৈতন্য—বি-এ পাশ সে কখনই করতে পারবে না জানে।"

শঙ্কর কিছুই বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কার কথা বলছ?"

দাসু বললে, "কেন চালাকি করছ? তুমি জান না? তোমার কেলাবের ননী তোমাকে বলেনি? আমি ত তোমারই ভয়ে কেলাবে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।"

শঙ্কর বললে, "ননী কাউকে কিছু বলেনি। আর আমিও ওদিক দিয়ে বড়-একটা যাই না।"

এতক্ষণ পরে দাসুর মুখে হাসি ফুটল। বললে. "মাইরি বলছ—কিছু জান না?"

"না, সত্যি বলছি, জানি না।"

দাসু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "চল না একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি। ননীর গল্পটা তোমাকে বলি। ভারী মজার গল্প।"

শঙ্কর বললে, "চা আমি খাই না। তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে। চল তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই।"

শঙ্করের বাড়ি এখান থেকে খুব কাছে নয়। চট করে একটা রিকশা ডেকে বললে, "ওঠ।"

দাসুর অপরাধী মন আবাব কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মারবে নাকি?

তবু শঙ্করের ভয়ে তাকে উঠতে হল রিকশায়।

রিকশায় উঠে দাসু একেবারে চুপ। ননীর যে মজার গল্পটা সে আরম্ভ করেছিল, সেটাও কেমন যেন শেষ করবার প্রবৃত্তি তার হল না। ক্রমাগত সেই একটা কথাই তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "তারপর? ননীর বিয়ে দিয়ে দিলে?"

দাসুর ভয় এবার যেন আরও বাড়ল। ননীর ব্যাপারটা শঙ্কর নিশ্চয়ই সব জানে। ননীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার অত বড় সর্বনাশ দাসু করে ফেলেছে। সেকথা কি আর ননী বলেনি শঙ্করকে?

শঙ্কর আবার বললে, "কি ভাবছ দাসু? আমার বাড়ি যেতে কি তোমার ইচ্ছে করছে না?"

দাসু বললে, "না না, তা কেন? এই ত যাচ্ছি।"

বলেই সে কথার ধারাটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বললে, "শঙ্কর, তুমি কখনও লটারির টিকিট কিনেছ?"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, কখনও কিনিনি।"

দাসু বললে, "মাঝে-মাঝে এক-আধটা কেনা ভাল। কখন যে কার ভাগ্যে কি লেগে যায় কিছু বলা যায় না। এই ধর না কেন, ভুতোবাবু—চল্লিশটি টাকা মাইনে পেত, সংসার চলত না কিছুতেই। আমি জোর করে কেনালাম তাকে একখানা এক টাকা দামের টিকিট। সেদিন পেয়ে গেল পনের হাজার টাকা। তা ব্যাটার কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কিছু তোমার দেওয়া উচিত। পনের হাজার পেলি তুই, পনেরটা টাকা দে? দিলে না কিছুতেই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।"

ভুতোবাবুর লটারির টাকা পাওয়ার গল্প শঙ্কব শুনতে চায়নি। চুপ কবে শুনেই গেল শুধু। কোনও মন্তব্যই করলে না।

দাসু জিজ্ঞাসা করলে, "কিনবে নাকি একটা টিকিট?"

শঙ্কব বললে, "কিনব।"

দাসু রিকশায় বসেই তার ঝুলিতে হাত ঢুকিয়েছিল। শঙ্কর তাব হাতটা চেপে ধরে বললে, "রিকশায বসে কেন? বাড়িতে চল, সেখানেই দেবে।"

তাবপর দুজনেই চুপ।

দাসু আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলবার মত।

কিন্তু পথ অনেকখানি।

শঙ্কর বললে, "ননীর বিয়ের কথা বললে না?"

দাসু এবাব না বলে পারলে না। বললে, "বিয়ে করবার জন্যে ননী একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। আসল ব্যাপার কি জান? ননীর মা মরে যাবার পর, ননীর বাবা বুড়ো বয়েসে আবাব একটি বিয়ে করে বসেছেন। তাই ননীর ধারণা হল, সৎমা তার বিয়ে দেবে না কিছুতেই। বি-এ পাশ-টাস ছুতো। হাতে তখন আমাব একটিমাত্র মেযে। তবে মেয়েটি খুব সুন্দরী। ননী দেখলে মেযেটিকে। দেখে অবধি নিজে ত পাগল হলই, আমাকেও পাগল করে তুললে। তখন আব কি করব, বললাম, নে, কর তবে বিয়ে। কন্যে পক্ষের আপত্তি হল না। ননী দেখতে-শুনতেও ভালো, বড়লোকের একটি মাত্র ছেলে। তবে হ্যাঁ, বিয়ের আগে ননী তাদের বলে দিলে, বিয়ে করছি, কিন্তু তোমাদের মেয়েকে আমি এখন আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পাবব না। আমি নিজে তোমাদেব এখানে আসা-যাওয়া করব, তারপর বাবা বুড়ো হয়েছে, সে আব কত দিন? বিয়েটা চুকে গেল।"

শঙ্কর বললে, "ভালই হল। এব জন্যে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন, আর লুকিয়ে লুকিয়েই বা বেড়াচ্ছ কেন?"

দাসু এইবার শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসি হাসলে। বললে, "মের না মাইরি, আমি বলছি তাহলে সত্যি কথা শোন।"

শঙ্কর বললে, "বল।"

দাসু একটু চাপা গলায় বললে, "বিয়েটা 'অসবন্ন' বিয়ে হয়ে গেল।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়ের আগে ননী সে-কথা জানত না?"

"না।"

শঙ্কর বললে, "তুমি তাকে জানাওনি?"

দাসু অম্লানবদনে বললে, "না।"

শঙ্কর কি যেন ভাবলে, তারপব জিজ্ঞাসা করলে, "মেয়েটি ত বলছ সুন্দরী, ননীও দেখতে খারাপ নয়। তাদের দু'জনের ভাব-ভালবাসা হয়েছে ত?"

দাসু বললে, "ওরে বাবা! সে খুব। লুকিয়ে লুকিয়ে খবব নিয়ে জেনেছি, ননী আজকাল দিনরাত বউয়েব কাছে পড়ে থাকে।"

শঙ্কর বললে, "তাহলে হোক না অসবর্ণ। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

দাসু এতক্ষণে যেন ভাব মনে একটু শান্তি পেলে। বললে, "ভয় পাব না, না? আমিও ক'দিন থেকে সেই কথাই ভাবছি।"

এ-রাস্তা ও-বাস্তা, এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে রিকশা এসে দাঁড়াল শঙ্করের বাড়িব কাছে।

দাসু কোনদিন শঙ্করের বাড়ি দেখেনি। আজ দেখলে।

দেখলে, বস্তির ভিতর একখানা বাড়ি। দোরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘরদোর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে শঙ্কর বললে, "বোস।"

দাসু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। শঙ্কর বললে, "কি দেখছ?"

"তুমি এইখানে থাক?"

"তবে তুমি কী ভেবেছিলে আমি বাজবাড়িতে থাকি?"

দাসু বললে, "না, তা ভাবিনি। তুমি একাই থাক এখানে?"

শঙ্কব বললে, "না। আমি থাকি আর আমাব মা থাকে। মা বেবিয়ে গেছে। থাকলে তোমাকে দেখাতাম।"

বলেই সে বসল দাসুর পাশে। বললে, "দাসু, তুমি একদিন আমাবে বিয়ে করতে বলেছিলে, মনে আছে?"

বিয়ের নাম শুনে দাসু উৎসাহিত হযে উঠল। বললে, "বিয়ে করবে তুমি?"

শঙ্কর বললে, "সেইজন্যেই ত তোমাকে ডাকলাম।"

দাসু চোখ বুজে কি যেন ভাবলে। বললে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাবতে দাও। এ বাবা আর কারও বিয়ে নয়। ভাল বিয়ে না দিতে পারলে জানে মেরে ফেলবে।"

এই বলে সে তার ঝুলিতে হাত ভরে একটি খাতা বের করল। খাতার পাতায় লেখা ছিল তার মক্কেলদের নাম-ঠিকানা। তাই থেকে খুঁজে খুঁজে একটি নাম-ঠিকানা বেব করে বললে, "এই একটিই আছে বামুনের মেয়ে--যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া চলে।"

শঙ্কর বললে, "মাত্র একটি?"

দাসু বললে, "হ্যাঁ ভাই, আপাতত এই একটিই আছে। বিধবা মায়ের এই একটিমাত্র মেয়ে।"

শঙ্কর আনন্দিত হল। বললে, "বা রে বা, বেশ মিলে গেছে ত! আমারও ত তাই। আমিও আমার মায়ের একটিমাত্র ছেলে।"

দাসু বললে, "না, মেয়েটির আব একটি ছোট ভাই আছে। কিন্তু খুব গবিব।"

"গরিবই আমি চাই!"

দাসু এইবার ভাল করে চেপে বসল। বললে, "শোন, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। জবাব দাও।"

দাসু এইবার হাতে পেয়েছে শঙ্কবকে। তার ভাবভঙ্গী দেখে শঙ্কর মনে মনে হাসলে। বললে, "বল, জবাব দিচ্ছি।"

দাসু জিজ্ঞাসা কবলে, "তুমি আমার সঙ্গে একদিন যেতে পারবে কিনা বল।"

"কোথায়?"

"এই কালীঘাটে। শুধু যাবে। কোনও কথা বলবে না। দূর থেকে একবার তোমাকে দেখিয়ে দেব। বাস্, মুণ্ডুটি ঘুবে যাবে মেয়ের মায়ের।"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, তা পারব না। তোমার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে—তা হবে না।"

এ-সব ব্যাপারে দাসুব মাথা খুব সাফ। বললে, "তাহলে এক কাজ কর। আমি তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে ভেতবে ঢুকে পড়ব। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে তুমি সেই বাড়িতে ঢুকে ডাকবে, দাসু! বেশ মানুষ ত তুমি! আমাদের গাড়িতে যাবে বলে এইখানে ঢুকে গল্প কবতে বসে গেলে? যাবে ত এস তাড়াতাড়ি।"

শঙ্কব বললে, "তা হতে পারে।"

দাসু তার নিজের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় নিজেই যেন মুগ্ধ হয়ে

গেল। বললে, "তারপর আর একটি কথা। তুমি কতদূর পড়েছ বল দেখি?"

শঙ্কর এবারে সত্যিই একটু বিপদে পড়ল। বললে, "আবার ও-সব কথা কেন? বলবে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।"

দাসুর মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গেল। বললে, "এইখানে একটু মুশকিলে পড়তে হবে।"

শঙ্কর কথাটাকে গ্রাহ্যই করলে না। বললে, "যাঃ! ইস্কুলের সার্টি-ফিকেট দেখতে চাইবে নাকি?"

দাসু বললে, "না। তা অবশ্য দেখতে চাইবে না। তবে মেয়েটি ম্যাট্রি-কুলেশন পাশ করেছে। মেয়ে চায় কলেজে পড়তে, আর মা চায় মেয়ের বিয়ে দিতে।"

শঙ্কর একটু ভাবনায় পড়ল। কিন্তু ভাবনার সময় তার আর নেই।

শঙ্কর বললে, "দ্যাখো দাসু, এই মাসের ভেতর বিয়ে আমাকে করতেই হবে। তোমার হাতে আর কোনও মেয়ে নেই?"

দাসু বললে, "না ভাই, বামুনের মেয়ে আপাতত এই একটিই আছে। 'অসবর্ন' বিয়ে ত তোমার দিতে পারব না।"

শঙ্কর বললে, "না। আমার মা তাহলে আত্মহত্যা করবে।"

দাসু বললে, "তাহলে কী করি বল দেখি?"

শঙ্কর বললে, "করবে আবার কি? এখানেই লাগিয়ে দাও। আর দেরি নয়। কালীঘাটে যেতে বলছিলে, চল কালই যাই।"

দাসু বললে, "কিন্তু মেয়ের মা যে রোজগেরে ছেলে চায়। সে চায় মেয়ে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে।"

"কেন, আমার হাতে মেয়েকে দিয়ে নিশ্চিন্ত না হবার কী আছে? বড়লোকের মেয়ে ত নয়! আর আমিই যে একদিন বড়লোক হব না তাই-বা কে বললে?"

দাসু বললে, "তাহলে কিন্তু আমাকে কতগুলো মিছে কথা বলতে হবে।"

"সেদিক দিয়ে ত তুমি ওস্তাদ। তোমার যা খুশি তাই বোল। আমার চাই বিয়ে।"

দাসু বললে, "কিছুদিন অপেক্ষা করতে পার না?"

শঙ্কর বললে, "এইবার তুমি আমার কাছে মার খাবে। অপেক্ষা করবার সময় আমার নেই।"

দাসু আবার চোখ বুজলে। ধ্যানস্থ হয়ে ভেবে নিলে বোধহয়, কেমন করে কি করবে। বললে, "ধর, সবকিছু ঠিক করে ফেললাম। বিয়েটাও চুকে গেল। কিন্তু তোমার যে কিছু খরচ আছে।"

শঙ্কর বেশ জোরে জোরেই বলে উঠল, "আমি কুলীন ব্রাহ্মণ—ব্যাটাছেলে. বিয়ে করব—আমার খরচ আছে মানে?"

দাসু আবার চোখ বুজলে। কিন্তু এবার কিছু চিন্তা করবার জন্য নয়। এবার সে চোখ বুজল ভয়ে।

শঙ্করের কথা শেষ হতেই দাসু চোখ খুলে রীতিমত ভয়ে ভয়ে বললে, "না না, আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি—" বলেই একটা ঢোঁক গিলে ভয়ের ধাক্কাটা সামলে নিলে। সামলে নিয়ে বললে, "ধর আমাকে বলতে হবে—ছেলেটি আই-এস্-সি পাশ করে একটি বিলিতী ফার্মে কাজ করছে। এখন অ্যাপ্রেন্টিস্। হাত-খরচ পায় দেড়শ টাকা। একবছর পরে মাইনে হবে—পাঁচশ টাকা। সাহেব বলছে—বিলেত পাঠাবে। বছরখানেক যদি বিলেতে থেকে ফিরে আসতে পারে তাহলে দেড়হাজার টাকা পাবে এখানে আসবামাত্তর। কিন্তু বিধবা মায়ের একটিমাত্র ছেলে, তার ওপর গোঁড়া বামুন—মা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। মা বলছে, বিয়ে দিয়ে দেব! অমন রাজপুত্রের মত ছেলে—ওব আবার বিয়ের ভাবনা? বহুত লোক পেছনে লেগে গেছে। আমার খুব চেনা ছেলে। একরকম বন্ধুর মত। খবর পেয়ে ছুটলাম। ছেলে আমাকে দেখেই বললে, ভারী বিপদে পড়ে গেছি দাসু। মা বলছে আমবা গরিব মানুষ, গরিবের মেয়ে চাই। লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে চলবে না। কিন্তু আজ-কালকার দিনে, আচ্ছা তুমিই বল ত দাসু, মেয়ে একেবারে লিখতে পড়তে জানবে না, সেরকম মেয়েকে বিয়ে আমি করি কেমন করে? আমি বললাম, ঠিক তুমি যেরকমটি চাইছ, সেইরকম একটি গরিবের মেযে আছে আমার হাতে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। ছেলে রাজি হয়ে গেল। বললে, আমি এইখানেই বিযে করব।"

দাসু এই এতগুলো মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে বলে গেল। একটুকু কোথাও আটকাল না, কোথাও থামল না।

শঙ্কর কেমন যেন একটু হকচকিযে গেল। বললে, "তাবপর? এব ঠ্যালা সামলাবে কেমন করে? বিয়ের পর যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে?"

দাসু অম্লানবদনে বললে, "জানাজানি ত হবেই। তা হোক না। বিয়ের পর শাশুড়ী হয়ত জিজ্ঞেস করবে. কই বাবা, চাকরি ত তুমি কবছ না? তখন বলতে পার, বিলেত যেতে রাজি হলে না বলে চাকরিটা গেল।"

কথাটা বলেই শঙ্করের মুখের দিকে একবার তাকালে দাসু। সেখানে কি ভাবান্তর হয়, দেখবার জন্যই বোধকরি তাকিয়েছিল। কিন্তু মুখ দেখে কিছুই সে বুঝতে পারলে না।

শঙ্কব কি যেন ভাবছিল। দাসু বললে, "বেশ ত এ মিথ্যেটুকুও যদি

বলতে না চাও বোল না। বলবে, চাকরির কথা কই আমি ত বলিনি! কে বলেছিল? ডাকো তাকে। ঘটককে তখন কেউ খুঁজেও পাবে না। কাজেই তাড়াতাড়ি বিয়ে যদি করতে চাও, বল আমি চেষ্টা করি।"

শঙ্কর বললে, "কর। বিয়ে আমাকে করতেই হবে।"

দাসু বললে, "নিশ্চয়ই করবে। বউ হবে খুব সুন্দরী। আর তোমাদের কীরকম ভাব-ভালবাসা হয় দেখো।"

শঙ্কর বললে, "আমি কিন্তু পাশ-টাশ কিছু করিনি।"

দাসু বললে, "না করলে ত বয়ে গেল। এমন কত হয়।"

"কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জান দাসু, এ-বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবে না।"

দাসু জিজ্ঞাসা করলে, "কেন হবে না?"

শঙ্কর বললে, "বিয়ের আগে মেয়ের মা যদি আমার মার কাছে আসেন তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমার মা কখনও মিথ্যা কথা বলবে না।"

দাসু বললে, "যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করব। তবে হ্যাঁ, একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। বিয়ের পরেই এ-বাড়িতে বউকে এনে তুলবে না। কয়েকটা দিনের জন্যে আর-একটি ভাল দেখে বাড়ি তোমাকে ভাড়া নিতে হবে। তারপর ভাব-সাব হয়ে গেলে বউকে তুমি নবকে নিয়ে যেতে চাইলেও তোমার সঙ্গে সেইখানেই সে চলে যাবে।"

শঙ্কর বললে, "বাড়ি ভাড়া, বউভাত, খাট-বিছানা, আমার জামা-কাপড়, বউয়ের কিছু কাপড়-জামা—এই সব খরচের টাকাগুলি দিতে হবে মেয়ের মাকে।"

দাসু বললে, "বললাম ত মেয়ের মা গরিব। এখন দেখি কী সে দিতে পারে।"

দাসু সেইদিনই চলে গেল কালীঘাটে। ইন্দ্রাণীর মাকে গিয়ে এমনভাবে কথাটা সে বললে, যেন সে হঠাৎ একটি দুর্লভ রত্নের সন্ধান পেয়েছে তার কন্যার জন্যে। এ-রত্ন যদি হাতছাড়া হয়ে যায় ত ইন্দ্রাণীর ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ বলতে হবে।

যে-গল্প সে শঙ্করকে বলে এসেছিল, সেই গল্পই সবিস্তারে বর্ণনা করে ইন্দ্রাণীর মাকে সে এই বলে সাবধান করে দিলে যেন সে ঘুণাক্ষরে এ-কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে। কারণ, তার মত বিবাহযোগ্যা অনেক কন্যার বাপ-মা এই রত্নটির দিকে হাত বাড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে টাকার।

দাসু সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন বলুন মা, আপনি কীরকম খরচ করতে পারবেন। তারই ওপর সব-কিছু নির্ভর করছে।"

ইন্দ্রাণীর মা বললে, "তোমাকে ত বলেছি বাবা, গরিব বিধবার মেয়ে, টাকার অভাবে মেয়েটাকে কলেজে পড়াতে সাহস হল না, তাই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত

হতে চাই। ছোট ছেলেটাকে পড়াতে হবে, তার জন্যেও আমার কিছু রাখা উচিত। কাজেই আমি যা দেখছি, নগদ একটি হাজার টাকা ছেলেকে আমি দিতে পারি।”

দাসু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, “না মা, এরকম ছেলে এত সস্তায় পাওয়া যায় না। ছেলের মা চেয়েছে নগদ দুটি হাজার টাকা। ছেলেটি আমার খুব পরিচিত। দেখি বলে-কয়ে কিছু করতে পারি কিনা।”

দাসু সেদিন চলে গেল সেখান থেকে।

একদিন পরে আবার এল।

ইন্দ্রাণীর মা জিজ্ঞেস করলে, “কিনারা কিছু করলে বাবা?”

দাসু বললে, “মনে মনে একটা ফন্দি এ'টেছি মা, কিন্তু সেটা কী ভাল হবে? সেদিন ত আপনাকে বললাম ছেলে চায় একটি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, আর মা চায় লেখাপড়া-না-জানা মেয়ে। ছেলে তার জন্যে মাকে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করতেও রাজী। আমি বলি কি, কোনো-রকম ফন্দি-ফিকির করে ছেলেটিকে আনি এইখানে। আপনি দেখুন তাকে। দেখে যদি আপনার পছন্দ হয়, তখন কথা কইব। আগে থেকে কিছু বলব না।”

ইন্দ্রাণীর মা তখন ছটফট করছে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে। বললে, “তাই কর বাবা, ছেলেটিকে দেখি আমি। তুমি ত দেখেছ আমার ইন্দ্রাণীকে। রূপে গুণে সাক্ষাৎ ইন্দ্রাণী। যার-তার হাতে ত দিতে পারব না তাকে।”

দাসু বললে, “ছেলেকে দেখলে মাথাটি আপনার ঘুরে যাবে মা। আপনি দেখুন শুধু, কোনও কথা বলবেন না।”

“সেই ভাল।”

শঙ্করকে সব-কিছু বলাই ছিল। দেখাবার ব্যবস্থা তার পরের দিনই হয়ে গেল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। দিনের আলোয় দেখাই ভাল।

দাসু তার আগেই ইন্দ্রাণীর মার কাছে আসর জমিয়ে বসেছে।— “কোম্পানির গাড়ি করে বুঝি বালিগঞ্জ যাচ্ছিল শঙ্কর। পথে দেখা হতেই বললাম, আমিও ওই দিকে যাব, দয়া করে যদি নামিয়ে দাও ত ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হয় না। তা ছেলেটা খুব ভাল। বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। যাবার সময় আবার তুলে নিয়ে যাবে বলেছে। এই কাছেই গেছে, এক্ষুনি আসবে। আপনি দেখবেন শুধু। আজ আর কিছু বলবেন না। কাল আমি জেনে যাব আপনার মতামত।”

আগেই সব ঠিক করা ছিল। শঙ্কর বাড়ির সদর পেরিয়ে একেবারে ভেতরে এসে ডাকলে, “দাসু!”

"ওই এসেছে! দেখুন মা দেখুন।"

চুপি চুপি কথাটা বলে দাসু তার ঝুলিটা খোঁজবার ছুতো করে খানিকটা দেরি করলে। ওদিকে শঙ্করও তার বুকটা ফুলিয়ে সার্টের কলারটা বারকতক নেড়েচেড়ে বাড়িটা ভাল করে দেখে নিলে।

"কাল আবার আসব মা, আজ চলি।"

দাসু তার ঝুলিটা কাঁধে ফেলে, চটি পায়ে দিয়ে শঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে গেল সেদিন।

শঙ্করকে কতক্ষণই-বা দেখেছিল ইন্দ্রাণীর মা। ইন্দ্রাণীকে ডেকে দেখালে বড় ভাল হতো, এই আফসোসই সে করছিল, এমন সময় দাসু এল তার পরের দিন মার মতামত জানতে।

মুণ্ডুটি সত্যিই তার ঘুরেছে বলেই মনে হল।

দাসু একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেনি। ইন্দ্রাণীর মা তাকে দেখেই বলে উঠল, "যেমন করে হোক, এই ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও ইন্দ্রাণীর। তোমাকে আমি খুশি করে দেব দাসু।"

"কত দেবেন মা আমাকে?"

"পঞ্চাশটি টাকা।"

"না মা, একশটি টাকা দিন, আমি সব ব্যবস্থা কবে দিচ্ছি।"

"একশ টাকা? বিয়ের দিন তাহলে বরযাত্রী কিছু কম করে আনতে বোল।"

দাসু বললে, "তাহলে শুনুন মা। ওর মাকে বলে যদি বিয়ে দিতে হয়, তাহলে আপনার খরচ পড়বে চার হাজার টাকা। দু'হাজার নগদ, মেয়েব বিশ ভরি সোনা, ছেলের সোনার বোতাম, রিস্ট-ওয়াচ, গরদের জোড়, তারপব বরযাত্রী অন্তত জন-তিরিশেক, গায়ে হলুদের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, খাট, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি—হেন-তেন সাত-সতেরো চার হাজার টাকা কম করে বললাম, পাঁচ হাজার টাকার কম হবে না। দিতে যদি রাজি থাকেন ত বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মা বললে, "না বাবা, অত টাকা আমার নেই।"

দাসু বললে, "তাহলে ও-ছেলের আশা ছেড়ে দিন।"

"তবে যে বললে একশ টাকা পেলে তুমি সব ব্যবস্থা করে দেবে?"

দাসু বললে, "সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার মনের কথা। শঙ্করকে একবার আমি জিজ্ঞেস কবব, সে যদি রাজি হয়, আর আপনি যদি পছন্দ কবেন, তাহলে হতে পারে।"

"সে কী রকম বাবা?"

"সেই যে বলেছিলাম আপনাকে। ছেলের মাকে না জানিয়ে চুপিচুপি বিয়েটা সেরে দেব। তারপর ছেলে একবারে বউ নিয়ে বাড়ি ঢুকবে।"

ইন্দ্রাণীর মা বললে, "মা যদি তখন রাগ করে? যদি বলে, ও-মেয়েকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না?"

"একটিমাত্র ছেলে, তা অবশ্য বলবে না। তবে শঙ্করকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। সে যদি রাজি হয় ত—ব্যস, মেরে দিতে পারি কম খরচে। বিয়ের আগে শ'দুয়েক টাকা ধরিয়ে দেব শঙ্করের হাতে, বলব, নিজের জামা-জুতো কিনে নাও। তারপর বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা নিয়ে আসব একখানা ট্যাক্সি করে। না বরযাত্রী না কিছু, বড় জোর ওদের পুরুত আসবে সঙ্গে। এখানে আমরা বিয়ের সব ঠিক করে রাখব। বিয়ে হয়ে যাবে, পরে, পরের দিন কুশণ্ডিকা হবে, আপনি আমার হাতে হাজারটি টাকা দেবেন, আমি চুপি চুপি শঙ্করের হাতে দিয়ে বলব, তোমার গরিব শাশুড়ী ঠাকরুন লজ্জায় এ-টাকা নিজে দিতে পারলে না, তোমার উপযুক্ত সম্মান-দক্ষিণে এ নয়, তবু তোমাকে এই হাজারটি টাকা নিয়ে হাসিমুখে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে তোমার মায়ের কাছে যেতে হবে। তোমার মাকে খুশি করবার ভার তোমার ওপর।—এতে আপনি রাজি থাকেন ত বলুন—আমি শঙ্করকে গিয়ে বলি। আর যদি রাজি না হন ত ওর আশা ছেড়ে দিন। আমি অন্য ছেলে দেখি।"

ইন্দ্রাণীর মা কিন্তু শঙ্করের আশা ছাড়তে পারলে না সহজে। বললে, "তাই দ্যাখো বাবা শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে।"

দাসু বললে, "রাজি যদি হয় ত আর দেরি করব না মা। আসছে সোমবার ভাল একটি দিন আছে। সেইদিনই সেরে ফেলতে হবে, নইলে মত আবার বদলে যেতেই-বা কতক্ষণ!"

·

তাই হল শেষ পর্যন্ত।

সোমবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রাণীদের কালীঘাটের বাড়ির নীচের তলার একটি ঘরে শঙ্করের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিয়েটা চুকে গেল।

মাকে না জানিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে শঙ্করের এই গোপন বিবাহের কারণ যে শুধু ইন্দ্রাণীর মার অর্থাভাব সে কথাটা দাসু কতবার কতরকম করে মাকে শোনালে তার ইয়ত্তা নেই।

বিবাহের অনুষ্ঠান-আচরণের কোথাও কোনও ত্রুটি হল না। শঙ্কর একজন ভাড়া-করা পুরোহিত সঙ্গে এনেছিল। কন্যাপক্ষের পুরোহিত ছিল, নাপিত ছিল, একান্ত অন্তরঙ্গ প্রতিবেশিনী কয়েকজন ভদ্রমহিলা ছিলেন, আর ছিল ইন্দ্রাণীর চারজন ইস্কুলের বান্ধবী।

এই বান্ধবী চারজনেই জমিয়ে রাখলে বিয়ে-বাড়িটা।

সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, এমন রাজযোটক সহজে হয় না। যেমন বর, তেমন কনে।

নিতান্ত ছোট বাড়ি। মাত্র খানতিনেক ঘর। তার ভেতর ইন্দ্রাণী আর ইন্দ্রাণীর ছোট ভাই যে-ঘরখানায় থাকে, সেই ঘরটিই সবচেয়ে ভাল। সেই ঘরটি ভাল করে সাজিয়ে বাসর-ঘর তৈরি করেছিল ইন্দ্রাণীর বান্ধবীরা।

বিয়ের পর বর-কনেকে নিয়ে তারা সেই ঘরে গিয়ে সারা রাত ধরে হৈ-হুল্লোড় চালালে। শঙ্করকে নিয়ে কী যে তারা করবে বুঝতে পারলে না। শঙ্করের কাছে নিজেদের জাহির করবার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে, ইন্দ্রাণী বলে যে একটি মেয়ে আছে সেখানে, সেকথা তারা ভুলেই গেল। ভুলে গেল, নববিবাহিত দম্পতির তখনও পরিচয় হয়নি।

নিজেরাই তারা নেচে-গেয়ে নিজেদের ভেতর রেষারেষি করে রাত কাবার করে দিলে। ইন্দ্রাণী খাটের একপাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমুল।

পরদিন সকালেই কুশণ্ডিকা।

তার আগে দাসুর সঙ্গে শঙ্করের দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দাসু বসে বসে চা খাচ্ছিল, শঙ্কর তাকে বাইরে রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, "কি হল?"

দাসু বললে, "সব ঠিক আছে। দেখছ না তোমার শাশুড়ী কী রকম ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। তা ছাড়া তোমার মাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বিয়ে হচ্ছে। ভাবছে হয়ত কুশণ্ডিকা চুকে যাক, তার পরেই দেবে।"

"কত দেবে?"

"পাঁচশ টাকা ত নিশ্চয়ই। হাজারও দিতে পারে।"

এই বলেই দাসু চট্ করে তার পকেট থেকে একশ টাকার একখানি নোট বের করে শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "এইটে রাখ তোমার কাছে। আমার ঘটকালির দরুণ এই একশ টাকা আমাকে দিয়েছে।"

"এ-টাকা আমি রাখতে যাব কেন? তোমার টাকা তুমি রাখ।"

দাসু বললে, "ঝুলিটা আমি আনিনি দেখছ না? রাখ তোমার কাছে। আমি আবার চেয়ে নেব।"

শঙ্কর বললে, "এখান থেকে গিয়েই বাড়িওলাকে বলেছি দেড় শ টাকা দেব। তার ওপর মা বউভাতের আয়োজন করবে। খরচ কম হবে না।"

দাসু বললে, "কিচ্ছু ভেবো না তুমি। সব ঠিক হযে যাবে। বউ কেমন হয়েছে বল।"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

কুশণ্ডিকা চুকে গেল।

সকাল-সকাল চারটি খাইয়ে দিতে হবে মেয়ে-জামাইকে। তার পরেই

ইন্দ্রাণীকে নিয়ে শঙ্কর চলে যাবে তার মার কাছে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যাবে তার ছোট ভাই সমর।

শঙ্করকে খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বসলেন তার সম্মুখে একটি পাখা হাতে নিয়ে। বললেন, "তোমারই ওপর ভরসা করে ইন্দ্রাণীকে আমি দিলাম তোমার হাতে। তুমি ওকে দেখো বাবা। তোমার মাকে যা বলবার তুমিই বোল।"

থেমে থেমে তিনি বলতে লাগলেন, "বেয়ানের সঙ্গে পরিচয় করতে দিলে না বাবা, কি আর করব বল, আমার অদৃষ্ট। তোমার মায়ের উপযুক্ত সম্মান আমি করতে পারলাম না বাবা শঙ্কর। তোমার মা দু হাজার টাকা চেয়েছিলেন, আমি অত টাকা কোথায় পাব বাবা, আমার যা-কিছু ছিল বিক্রি করে এক হাজার টাকা দিলাম।"

শঙ্কর এতক্ষণ মাথা হেঁট করে খেতে খেতে সব শুনছিল। এবার মুখ তুলে তাকালে। জিজ্ঞেস করলে, "দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, কাল বিয়ের আগেই দিয়েছি দাসুর হাতে। দাসু বললে, জামাই-এর হাতে দেবেন না মা, মায়ের ভয়ে সে কি নিতে পারবে? দরকার হয় আমি নিজে গিয়ে আপনার বেয়ানের হাতে দিয়ে ওঁকে যা বলবার বলে ঠাণ্ডা করে আসব। তারপর আপনাদের বেয়ানে বেয়ানে দেখা করিয়ে দেব।"

শঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে, "কাল রাত্রে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, কাল রাত্রে দিয়েছি এক হাজার। বিয়ের আগে তোমার জুতো কাপড় কেনবার জন্যে দিয়েছি দু'শ। আর আজ সকালে ওর ঘটকালির জন্যে দিয়েছি একশ।"

শঙ্কর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেই উঠে পড়ল।

শঙ্কর দাসুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু কোথায় দাসু?

রাস্তায় পানের দোকান, চায়ের দোকান পর্যন্ত দেখে এল, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিয়ের আগে পঞ্চাশটি টাকা সে তাকে দিয়েছে। দেড়শ মেরেছে সেই দিন। তার পর এক হাজার। আর শুধু সেই জন্যেই তার নিজের ঘটকালির টাকা একশ তার হাতে দিয়ে দাসু পালিয়েছে। ইন্দ্রাণীকে দেখে শঙ্করের মন ভরে গিয়েছিল, ভেবেছিল মাকে সে খুশি করতে পারবে। দেড় শ টাকা দেবে বলে এক মাসের জন্যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সে। নিয়েছে দাসুর কথা শুনে। বউভাতের আয়োজন করতে বলে এসেছে মাকে। দোকান থেকে ধারে জিনিসপত্র কিনে দিয়ে এসেছে। বাবুদের বাড়ি থেকে পাঁচ-সাত দিনের ছুটি

নিয়েছে তার মা। নেত্য নাপ্‌তিনীকে খবর দিতে বলে এসেছে, আর বলে এসেছে বস্তির মেয়েটার মাতাল ট্যাক্সি-ড্রাইভার যে-মামাটা তাকে আর তার মাকে অপমান করে গিয়েছিল, তাকে যেন খবরটা জানিয়ে দেয় নেত্য। ইচ্ছে করলে বউভাতের নেমন্তন্ন সে খেয়ে যেতে পারে।

এ-সবই করেছে সে দাসুর কথা শুনে।

রাগে তার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। এ কী বোকার মত কাজ করলে সে! দাসুকে চিনেও চিনলে না। দাসু কোথায় থাকে কিছুই সে জানে না। তার বাড়িটাও অন্তত তার দেখে রাখা উচিত ছিল।

হতাশ হয়ে শঙ্কর ফিরে এসে বসতেই তার পুরোহিত এসে দাঁড়াল তার কাছে। বললে, "আমার পাওনাটা তাহলে মিটিয়ে দিন, আমি চলে যাই।"

"ও, হ্যাঁ।" শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। পকেটে দাসুর দেওয়া একশ টাকার নোটখানা রয়েছে। বললে, "আসুন, নোটটা ভাঙিয়ে দিই।"

একশ টাকার নোট ভাঙাতে হলে একটা বড় দোকানে যেতে হয়। কাছেই একটা বড় স্টেশনারী দোকান। কিন্তু শুধু ভাঙানি চাইলে দেবে না। কি কিনবে? ইন্দ্রাণীকে কিছুই সে দেয়নি। কি দেবে? চট্‌ করে বলে বসল, "খুব ভাল সেণ্ট আছে আপনার দোকানে?"

দোকানী বের করে দিলে দশ টাকা দামের ভাল একটি সেণ্টের শিশি। বললে, "এর চেয়ে ভাল কিছু আপাতত নেই।"

একশ টাকার নোটটি তার হাতে দিয়ে সেণ্টের শিশিটি সে কিনে ফেললে।

পুরোহিতমশাইকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনার পাওনা কত?"

পুরোহিত বললেন, "ঘটকমশাইয়ের সঙ্গে আমার ত কথাই হয়ে গিয়ে ছিল। তিনি বলেছিলেন, কুড়ি টাকা দেবেন। আসলে ব্যাপারটা কি হয় জানেন? আমরা আমাদের প্রাপ্য পাই কন্যাপক্ষের তরফ থেকে। আর পাত্রপক্ষ দেয় কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে। কিন্তু ঘটকমশাই সে-নিয়ম বদলে দিলেন। বললেন, না, পাত্রপক্ষ দেবে পাত্রপক্ষের পুরুতকে আর কন্যাপক্ষ দেবে কন্যা-পক্ষের পুরুতকে।"

অত কথা শোনবার অবসর নেই শঙ্করের। কুড়িটি টাকা পুরোহিতের হাতে দিয়ে বললে, "আসুন।"

পুরোহিত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শঙ্কর বললে, "যান, আপনি এবার ট্রামে চড়ে বাড়ি চলে যান।"

"ট্রামের ভাড়াটা? আসবার সময় অবশ্য আপনাদের সঙ্গে গাড়িতেই এসেছিলাম।"

খুচরো কিছু ছিল না শঙ্করের হাতে। একটি টাকা পুরোহিতকে দিয়ে বললে, "দাসু ঘটকের বাড়ির ঠিকানা জানেন?"

পুরোহিত বললে, "আজ্ঞে না, তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় ছিল না। গঙ্গার ঘাটে আমি একটা লোকের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি দেওয়াচ্ছিলাম। উনি আমাকে সেইখানে গিয়ে ধরলেন। আমি অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর নিবাস কোথায়? তিনি বলেছিলেন, নবদ্বীপে। আপাতত থাকেন বুঝি বেহালায়। আজ্ঞে আর কিছু আমি জানি না।"

শঙ্কর বললে, "আচ্ছা, যান আপনি।"

ভদ্রলোক তবু যান না!

"আবার কী?"

পুরোহিত বললেন, "আপনি আমাকে ট্রাম ভাড়ার দরুণ একটা টাকা দিলেন। আমার কাছে খুচরো পয়সা কিছু নেই, আপনাকে কত ফেরত দিতে হবে বলুন, আমি চট করে এই দোকান থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে আনি।"

শঙ্কর বললে, "থাক আর ফেরত দিতে হবে না, আপনি যান।"

খুশী হয়ে পুরোহিত চলে গেলেন।

বাড়ির দরজায় ইন্দ্রাণীর ভাই সমর দাঁড়িয়েছিল। বললে, "আপনি ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিলেন?"

শঙ্কর বললে, "না, আমি দাসু ঘটককে খুঁজছি।"

সমর বললে, "এই দেখুন, আপনাকে বলতে আমি ভুলে গেছি—সে বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় আমাকে বললে, তুমি তোমার জামাইবাবুকে বলে দিও, আমি তার বাড়িতেই যাচ্ছি। সেখানেই দেখা হবে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আমি তখন কোথায় ছিলাম?"

"আপনি তখন মন্ত্র বলছিলেন আব দিদির মাথায সিঁদুর দিচ্ছিলেন।"

"হুঁ।" বলে শঙ্কর দাঁডিযে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

সমর বললে, "ট্যাক্সি ওদিকে পাওয়া যায় না। এই দিকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ডাকব?"

শঙ্কর বললে, "তোমার দিদি তৈরি হয়েছে?"

সমর বললে, "হ্যাঁ। দিদি জামা কাপড় প'রে মার কাছে বসে বসে কাঁদছে।"

শঙ্কর চমকে উঠল। "কাঁদছে? কেন?"

সমর বললে, "কাঁদতে হয় যে! মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কাঁদে না?

এত দুঃখেও হেসে ফেললে শঙ্কর। বললে, "ডাক একটা ট্যাক্সি।"

শঙ্কর নতুন যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে, সেটাও ঝিলপাড়ায়। সেই বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

দোরে দাঁড়িয়েছিল নেত্য নাপতিনী। ছুটে গিয়ে বাড়ির ভিতর খবর দিলে সে।

বিমলা বেরিয়ে এল জলের একটা ঘটি হাতে নিয়ে। নেত্যর হাতে ঘটিটা ধরিয়ে দিয়ে বিমলা এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। শঙ্কর গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দোর খুলে ইন্দ্রাণীর সুটকেসটি হাতে নিয়ে বললে, "নাম।"

ইন্দ্রাণী নামল, সমর নামল।

শঙ্কর ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বললে, "প্রণাম কর। এই আমার মা।"

ইন্দ্রাণী সেইখানেই মাথা হেঁট করে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। বিমলা তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "থাক মা থাক। জন্মএয়োস্ত্রী হও, সুখে থাক। এই ত কেমন সুন্দর বউ হয়েছে আমার। নেত্য, দ্যাখো ভাল করে। সেই মিনষেকে গিয়ে বলবে।"

একতলা বাংলোর মত বাড়ি। তিন চারখানা বড় বড় ঘর। একদিকে মস্ত বড় রান্নার জায়গা, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর। সামনে একটুখানি উঠোন। চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

সামনের একখানা ঘরে বউয়েব বসবার জায়গা করাই ছিল। বিমলা তাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে বসল তার ভাই সমর।

পাশের ঘরে গিয়ে ইন্দ্রাণীর সুটকেসটা নামিয়ে শঙ্কর ডাকলে, "মা. শোন।"

বিমলা নেত্যকে বউমার কাছে রেখে শঙ্করের কাছে গেল।

মাকে শিখিয়ে রাখা হয়েছিল, বউ দেখে তুমি একটু অবাক হয়ে যাবে। বলবে, সে কিরে, তুই কি তাহলে আমাকে না জানিয়েই বিয়ে করে ফেললি? তার পর বউ দেখে খুশি হয়ে বললে, তা বেশ করেছিস। আমি বউ চেয়েছিলাম, ঘব আলো-করা বউ পেলাম। এস মা, এস।

কিন্তু বিমলা সেসব কথা বোধহয় ভুলেই গিয়েছে। অভিনয় সে একেবারে করতে পারলে না। এমন করে বাড়ি থেকে বেরিযে এল, এমনভাবে কথা বললে, মনে হল যেন সবই সে জানে।

ইন্দ্রাণী নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। সে জানে, স্বামী তার মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে। এখন সে ভাববে হয়ত—এদের সব মিছে কথা। হয়ত-বা ভাববে এরা মানুষ ভাল নয়।

বিমলা এসে দাঁড়াল শঙ্কবের কাছে। শঙ্কর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বললে, "তুই যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি সব ভুলে গেলাম। তাছাড়া ও-সব আমি ভালও বাসি না।"

শঙ্কর বললে, "চুপ! আস্তে কথা বল। শুনতে পাবে।"

"শনুক না! ক'দিন লুকিয়ে রাখবি? জানবে আমরা গরিব। জানুক না। বড়লোক সেজে ক'দিন থাকতে পারবি তুই?"

"আঃ, চুপ কর না।" শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "দাসু এসেছিল?"

বিমলা বললে, "না, আসেনি। বাড়িওলাকে কী বলে গিয়েছিলি? দু-দুবার এসেছিল। লোকটার খুব মুখ খারাপ!"

শঙ্কর মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

"কি ভাবছিস?" এই দ্যাখ্, বলতে ভুলে যাচ্ছি, দোকান থেকে ধারে জিনিস এনেছিস, তাদের লোক এসেছিল। তা এত এত ঘি ময়দা কি হবে? কত লোককে নিমন্তন্ন করবি?"

শঙ্কর বললে, "তা করতে হবে বৈকি!"

বিমলা বললে, "তাহলে আমিও কিছু করি?"

"হ্যাঁ কর। কিন্তু তুমি যেখানে কাজ কর, তাদের কাউকে বোল না।"

এই বলে শঙ্কর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ইন্দ্রাণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "দাসু আগেই তোমাকে খবর দিয়েছে! তাই বল!"

বিমলার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি একটু ঘুরে আসি মা। নেমন্তন্নটা সেবে দিয়ে আসি। খাওয়াবার ব্যবস্থা কাল রাত্রে।"

দোরের কাছ পর্যন্ত গিযে আবার ফিরে এল শঙ্কর। পকেট থেকে দশ টাকাব একটি নোট বের করে মাব হাতে দিয়ে বললে, "আজ তোমার বাড়িতে দুজন নতুন মানুষ এসেছে। রাত্তিরে একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কব।"

ইন্দ্রাণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সমর চুপি চুপি বললে, "জামাই-বাবু গরিব মানুষ, নয় দিদি!"

ইন্দ্রাণী বললে, "চুপ।"

ঠিক শ্রীহরির কাছে যাবে বলে যায়নি শঙ্কর। ভেবেছিল শক্তি-মন্দিরে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করে আসবে আর সেই সঙ্গে ক্লাবের যে-সব ছেলেরা তার অনুগত—তাদের জানিয়ে দেবে।

কলকাতার পথে পথে সে বৃথাই সন্ধান করে ফিরছিল দাসুর। শঙ্কর মনে মনে জানে সে পালিয়েছে। হয়ত-বা কলকাতা ছেড়েই চলে গেছে।

তবু সে একবার থমকে থামল ঠিক সেই জায়গাটায়—দাসু যে-জায়গাটায় একদিন ট্রাম থেকে নেমেছিল।

এরই কাছাকাছি কোথাও সে থাকে নিশ্চয়ই। একদিন-না-একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। মাত্র এক হাজার টাকা মেরে দিয়ে সে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

ইলেক্‌ট্রিক পোস্টের গায়ে একটা হাত রেখে শঙ্কর এমনি-সব নানা কথা ভাবছে। ভাবছে, কিছু টাকার তার একান্ত প্রয়োজন। টাকা না হলে ইন্দ্রাণীর কাছে তার সম্মান থাকবে না।

বাড়িওলাকে টাকা দিতে হবে। দোকানীকে টাকা দিতে হবে। তা ছাড়াও এতগুলি লোককে ভাল করে খাওয়াতে হলে আরও সব অনেক কিছু কেনা দরকার।

এই সব কথা ভাবছে আর মনে হচ্ছে, দাসুকে এখন যদি সে হাতের কাছে পায় ত তাকে এমন শিক্ষা দেবে যে, সে এমন কাজ আর জীবনে কখনও করবে না।

হঠাৎ তার গায়ে হাত পড়তেই চমকে সে পিছন ফিরে দেখলে, শ্রীহরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। গাল দুটো তার তেমনি ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো তার তেমনি ছোট হয়ে গিয়েছে।—"শক্তি-মন্দিরে আর যাচ্ছ না কেন শঙ্করদা, কি হয়েছে তোমার?"

"একটা লোক আমাকে ঠকিয়েছে। আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"তোমাকে ঠকিয়েছে?"

কথাটা সে এমনভাবে বললে, মনে হল, শঙ্করদাকে ঠকানো তার কাছে যেন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

শঙ্কর বললে, "চল, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।"

শ্রীহরি বললে, "আমি এখন ছাপাখানায় যাচ্ছি শঙ্করদা।"

"চল, ওই দিকেই যাই।"

ছাপাখানার কাছাকাছি গিয়ে শঙ্কর বললে, "শক্তি-মন্দিরের তহবিলে টাকা আছে?"

শ্রীহরি বললে, "তুমি ত জান।"

"না, আমি অনেকদিন দেখিনি।"

"আছে গোটা চল্লিশেক।"

"আর দরিদ্র-ভাণ্ডারে?"

শ্রীহরি বললে, "দরিদ্র-ভাণ্ডারে আছে বোধহয় নব্বই টাকা।"

কথাটা বলতে কেমন যেন আটকাচ্ছিল শঙ্করের, তবু বললে, "তুই আমাকে শ' দুই টাকা কোথাও থেকে এনে দিতে পারিস? তিন-চার দিন পরে ফেরত দেব।"

শ্রীহরি বললে, "তুমি আমাদের ছাপাখানার দোরে দাঁড়াও, আমি দেখছি।"

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল গেটের সামনে।

শ্রীহরি খানিক পরেই বেরিয়ে এল—দশটাকার কুড়িখানা নোট হাতে নিয়ে।

শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "ক্যাসিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। গুনে দ্যাখো।"

শঙ্কর নোট গুনছে, এমন সময় শ্রীহরির দাদা এসে শঙ্করকে বললে, "কই দেখি নোটগুলো।"

নোটগুলো একরকম সে কেড়েই নিলে শঙ্করের হাত থেকে। তারপর শ্রীহরির দিকে তাকিয়ে বললে, "তোর বেশ আক্কেল ত? ভাগ্যিস আমি দেখলাম।" বলেই নোটগুলো সে পকেটে রাখলে। তারপর শঙ্করকে বললে, "না ভাই, টাকা এখন দেওয়া হবে না। তুমি অন্য কোথাও দ্যাখো। কাল শনিবার, আমাদের পেমেণ্টের দিন।"

শ্রীহরির দাদা ভিতরে চলে গেল। শ্রীহরি তার দাদাব পিছনে ছুটল: "দাদা! দাদা!"

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখলে, শঙ্কর চলে গিয়েছে।

নেত্যকে বউমার কাছে রেখে বিমলা নিজেই গিয়েছিল বাজারে। বাড়িতে সবই সে ঠিক করে রেখেছে। রাত্রে খাবার লোক মাত্র তিনজন। ভাল দেখে আধসের মাংস কিনে আনলেই চলবে।

তার বস্তির বাড়িটা বেশী দূরে নয়। যদিও তালা-বন্ধ করে এসেছে, তবু একবার দেখে যাওয়া ভাল।

বাড়ির আশেপাশে যারা থাকে, তারা সবাই তাকে ভালবাসে। বড় গরিব তারা। পেট ভরে দুবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না। বাড়িতে তার বউ এসেছে। কাল বউভাত। এত এত জিনিস এসেছে বাড়িতে। এত লোক খাবে, আর এই সুযোগে তাদের কয়েকজনকে যদি ভাল-মন্দ দুটো খাইয়ে দিতে পারে, তার ছেলে-বউকে তারা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

আজ না হয় সে একটা বড় বাড়িতে বাস করছে, দুদিন বাদে ওই বউ নিয়েই তাকে তার বস্তির বাড়িতে উঠে যেতে হবে। কাজেই তার প্রতিবেশী কয়েকজনকে বলে যাওয়া ভাল।

বাজারে যাবার পথে তাই সে ছেলেতে মেয়েতে জন দশবারো লোককে বলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল, কাল সন্ধ্যেবেলা তোমরা যাবে আমার ওই বাড়িতে, কাজকম্ম কিছু করে দেবে আর আসবার সময় চারটি খেয়ে আসবে।

পেট ভরাবার জন্য দুবেলা দুটি অন্ন আর লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্রই যাদের জীবনের একমাত্র চাওয়া, বিয়ে-বাড়িতে চারটি খেয়ে আসবার নিমন্ত্রণ পাওয়াকে তারা দুর্লভতম সৌভাগ্য ছাড়া আর কী ভাবতে পারে?

বাজার থেকে বিমলা ফিরে আসবার আগেই দেখলে, ফিরিওলা রামু এসে হাজির হয়েছে।

বিমলা আসতেই নেত্য বললে, "আমি এবার আসি।"

বিমলা বললে, "কাল একটু সকাল-সকাল এস নেত্য। তোমার কত্তাটিকেও আসতে বোলো। এইখানেই খাবে তোমরা।"

"আসব।" বলে নেত্য চলে গেল।

"বউমা কোথায়?"

"চানের ঘরে গেছে। ওই ত এসেছে।"

রামু ফিরিওলা বুড়ো মানুষ। মুখে মাত্র দুটি কি তিনটি দাঁত। মাথার চুল সব সাদা। হাতজোড় করে উবু হয়ে বসে আছে দোরের বাইরে। ইন্দ্রাণীকে দেখেই বলে উঠল, "আ হা হা হা, ই যে পিতিমের মতন বউ হয়েছে দিদিঠাকরুণ! যেমন ছেলে, তেমনি বউ।"

বিমলা বললে, "তুমি ছিলে না বাড়িতে, তাই তোমার নাতনীকে বলে এসেছিলাম।"

রামু বললে, "তাই শুনেই ত ছুটে আসছি দিদি, বলি, বউ-ঠাকরুণকে দেখে আসি। কাল আবার আসব। চারটি পেসাদ পেয়ে যাব। নাতনীটাকেও নিয়ে আসব ত দিদি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার নাতনীকেও নিয়ে আসবে বৈকি।"

রামু জিজ্ঞেস করলে, "তা ই বাড়িটি কদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছ দিদি?"

"সে-সব আমি জানি না রামু, শঙ্কর জানে।"

রামু বললে, "তা এইরকম বাড়ি না হলে কি চলে? বেয়াই বাড়ির কুটুমজন সব আসবে, বস্তিতে বিয়ে দিলে তাদের বসবার দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত দিতে পারতে না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে বেশ বড়লোকের বাড়িতেই ছেলের বিয়ে দিলে।"

"হ্যাঁ, তা দিলাম।" বলেই বিমলা চলে গেল রান্নাঘরে।

রামু কিন্তু থামল না। বললে, "তা হ্যাঁ গা মা-লক্ষ্মী, গরিবের বাড়িতে বিয়ে হল, বস্তিতে গিয়ে থাকতে পারবে ত? হাঁড়ি ধরতে পারবে ত?"

ইন্দ্রাণী শুনলে সব। জবাব দিলে না।

রামু বললে, "তবে দুজনের রান্না। শঙ্কর দাদাবাবুর আর নিজের। শাশুড়ী ত চলে যাবে বাবুদের বাড়িতে রান্না করতে।"

ইন্দ্রাণী কথা বললে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "শাশুড়ী রান্না করে?"

রামু বললে, "কী আর করবে মা? দাদাবাবু যতদিন রোজগার না করবে, ততদিন মাকে এ-কাজ করতেই হবে। হ্যাঁ, বাহাদুর তোমার শাশুড়ী বৌরানী। দুটি বেলা গামছায় বেঁধে ভাত-ডাল-তরকারি ছেলের জন্যে বয়ে বয়ে আনছে। কিন্তু ছেলেও রাজপুত্তুরের মতন দেখতে, গায়ের ক্ষেমতা খুব। ও-ছেলে

একদিন বড় হবে, মেলা টাকা রোজগার করবে। তখন আর কোনও দুঃখ থাকবে না। তাই যেন হয়, হে ভগবান, তাই যেন হয়!"

এই বলে সেইখানেই মাথাটি মাটিতে ঠেকিয়ে রামু ইন্দ্রাণীকে একটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

"আজ চলি মা-লক্ষ্মী। কাল আবার আসব। কোথায় গো দিদিঠাকরুন, আমি চললাম দিদি, দুয়োরটি বন্ধ করতে হবে যে।"

বিমলা বোধকরি রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল না।

সমর চোখ বুজে শুয়ে ছিল ইন্দ্রাণীর কাছে। তাকে তুলে দিয়ে ইন্দ্রাণী বললে, "যা সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।"

রামু চলে গেল। কিন্তু দরজাটি বন্ধ কবতে গিয়ে সমর বিপদে পড়ল। আবার একজন ভদ্রলোক দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"শঙ্করবাবু কোথায়?"

সমর বললে, "বেরিয়ে গেছেন।"

"নে বাবা, এ আমি কার পাল্লায় পড়লাম! তার মা কোথায়?"

সমর বললে, "রান্না করছে।"

ভদ্রলোক সেইখান থেকে চিৎকার করে বললেন, "ওগো মা, শুনছেন? আমি আবার এসেছিলাম। ছেলেটিকে না-জেনে না-শুনে শুধু চেহারা দেখে ভুলে গেলাম আমি। অগ্রিম টাকা না নিযে কাউকে আমি ভাড়া দিই না। আর এইখানে গেলাম ফেঁসে।"

"এ কী কথা বলছেন আপনি?"

বিমলা বেরিয়ে এল বান্নাঘর থেকে। "কখন আপনাব ভাড়া দেবার কথা ছিল?"

ভদ্রলোক বললেন, "আজ সকালে।"

বিমলা বললে, "না, বিয়ের কনে কুশণ্ডিকা সেরে সকালে আসতে পারে না। আসে বিকেলে। এখনও সন্ধ্যে হয়নি। টাকা যে দেবে, এসেই সে বেরিয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে তার এখনও দেখা হয়নি। আর আপনি একেবারে পাগল হয়ে গেলেন?"

"পাগল হয়েছি কি সাধে মা? লোকজনের কাছে আপনার ছেলেটি সম্বন্ধে যা শুনছি তাতে পাগল হবারই কথা।"

বিমলা বেশ রেগে রেগেই জিজ্ঞেস করলে, "কী শুনছেন?"

"শুনছি যা, সে আর আপনাব শুনে কাজ নেই। আমাব আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। শুনছি ছেলেটি গুণ্ডা। ভাড়া ত পাবই না। এমনকি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বলছি কি, হাত জোড় করে বলছি—ভাড়া আমার চাই না। আপনারা আজ আমার বাড়িটি ছেড়ে দিন।"

বিমলা বললে, "বেশ কথা আপনার! কাল আমার বউভাত। আর আজ আমার বাড়িটি ছেড়ে দিন! যান, আপনি কাল আসবেন। কাল আমার বাড়িতে কাজ। পরশু আসতে পারেন ত আরও ভাল হয়।"

এই বলে বাড়িওলা ভদ্রলোককে একরকম জোর করে বের করে দিয়ে বিমলা দোরটা দিলে বন্ধ করে।

"ছেলে আপনার গুণ্ডা! ভাড়া হয়ত না পেতে পারি! কথা শোনো মিনষের!"

গজগজ করতে করতে বিমলা আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

শ্রীহরির কাছে টাকা না চাইলেই ভাল করত শঙ্কর।

অথচ টাকা তার চাই। টাকা না পেলে তার সম্মান থাকবে না। হঠাৎ মনে পড়ল বোসবাগানের সুরপতিবাবুকে। সুরপতিবাবু তাকে ভালবাসেন। টাকা চাইলে হয়ত-বা দিতেও পারেন।

এদিকে বাড়িতে রয়েছে তার সদ্য-বিবাহিতা তরুণী স্ত্রী। পরমা-সুন্দরী ইন্দ্রাণী। এখনও তার সঙ্গে ভাল করে তার পরিচয় পর্যন্ত হয়নি।

বোসবাগানের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েও শঙ্কর ফিরে এল। আজ থাক, কাল যাবে সুরপতিবাবুর কাছে।

বাড়ি ফিরেই শঙ্কর দেখলে, একটা ঘরের মেঝেয় শতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে আছে ইন্দ্রাণী। সমর তাকে দরজা খুলে দিয়ে আবার তার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রান্নাঘরে ছিল বিমলা। শঙ্কর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিমলা বললে, "কীরকম ছেলে রে তুই! বাড়িওলার টাকাটা ওখান থেকে এসেই ফেলে দিলিনে কেন? যা-তা বলে অপমান করে গেল।"

"অপমান করে গেল?"

"হ্যাঁ। বললে আজ সকালে দেবার কথা ছিল। বললাম না তোকে, সকালে একবার এসেছিল? আবার এখন এসে একেবারে গুণ্ডা-ফুণ্ডা কত কী! ছি ছি, বউমার সামনে—আমার মাথা কাটা গেল।"

একে শঙ্করের মনের অবস্থা খারাপ ছিল, তার ওপর আরও খারাপ হয়ে গেল।

মা আবার বললে, "টাকা নিয়ে এলি শ্বশুরবাড়ি থেকে, আমার হাতে দিয়ে গেলেই পারতিস, ফেলে দিতাম মিনষের মুখের ওপর। আর তোকেই-বা কী বলব বাবা? একবারে দেড়শ টাকার বাড়ি ভাড়া করে বসলি! এইবার বিয়ে হল, ভালই হল—নিজে এবার যা একবার ময়নাবুনিতে, ভাল করে দেখে-

শুনে আয়, তারপর কিছু রোজগারপাতি কর। আমার আর ভাল লাগে না বাবা।"

কথাগুলো শঙ্করের ভাল লাগছিল না। বললে, "তুমি থাম ত মা। কাল ওর টাকা আমি দিয়ে দেব।"

"হ্যাঁ, তাই দিয়ে দিস।"

এই কথা বলেই মা অন্য কথা পাড়লে। "শাশুড়ী কেমন বললি না ত?"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

বিমলা বললে, "বউমা খুব ছেলেমানুষ নয় কিন্তু। তোর চেয়ে বছর-খানেকের ছোট হবে হয়ত।"

"হুঁ।"

"লেখাপড়া-জানা মেয়েদের খুব অহঙ্কার হয়, গরিবের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না।"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

বিমলা বললে, "বেয়ান বোধহয় খুব আদর দিয়ে মানুষ করেছে। কাজকর্ম কিছু শেখায়নি। দ্যাখ আবার, আমার কপালে কী হল কে জানে!"

শঙ্কর একটা কথাও বললে না।

"এর চেয়ে আমি যে-মেয়েটাকে দেখে এসেছিলাম সেইটেই ছিল সত্যিকার গরিবের মেয়ে। আমাদের সঙ্গে খাপ খেত ভাল।"

শঙ্কর এতক্ষণ পরে কথা বললে। কথাটা বোধকরি তার ভাল লাগল না। বললে, "কী জানি বাবা, কী মেয়ে তুমি দেখে এসেছিলে। তার মামাটা আমাদের রীতিমত অপমান করে গেল, বললে এ-ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব না, তবু ভুলতে পারছ না তার কথা। কেন, বউ কি তোমার দেখতে খারাপ হয়েছে?"

"না রে, আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি, এই যে আমি রাঁধতে এলাম, বাড়িতে একটা ঝি নেই, একটা চাকর নেই, অন্য মেয়ে হলে ছুটে আসত আমার হাতের কাজ কেড়ে নিতে। বিয়ের কনেকে অবশ্য কাজ করতে আমি দিতাম না, কিন্তু ওরও ত একটা কর্তব্য ছিল। কই, তুই বল না!"

কথাটা অবশ্য খুব চুপি চুপি বললে বিমলা।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়াও, আজ আমি ওকে বলব সে কথা।"

বিমলা আবার সাবধান করে দিলে, "দেখিস যেন এই নিয়ে প্রথম দিনেই ঝগড়াঝাঁটি করিস না।"

দক্ষিণদিকের সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে বেশ পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিয়েছিল বিমলা। ছেলে-বউ শোবে ওই ঘরে।

ধরতে গেলে আজই তাদের প্রথম পরিচয়।

শঙ্করকে আগে খাইয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে আর সমরকে নিজের কাছে বসিয়ে আদর করে খাওয়াতে চেয়েছিল বিমলা। ইন্দ্রাণী কিন্তু খেলে না ভাল করে। গোমড়া মুখ করে বসে নাড়াচাড়া করলে শুধু। বিমলা যে এত কথা বললে, একটা জবাব দেওয়া দূরে থাক, একবার মুখ তুলে তাকালে না ইন্দ্রাণী।

বিমলা যা ভেবেছে ঠিক তাই। তার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সাধাসিধে একখানা শাড়ি পরেছিল ইন্দ্রাণী। বিমলা বললে, "ও কাপড়টা তুমি ছেড়ে দাও বউমা। ভাল একখানা শাড়ি পর।"

ইন্দ্রাণী বললে, "না থাক।"

শাড়িখানা কিছুতেই ছাড়ল না সে। সেই শাড়ি পরেই শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শঙ্কর ঘরে ছিল না। সে তখন বাইরে দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে বসে কী যেন ভাবছিল।

বিমলা বললে, "ওখানে বসে কেন রে? যা ঘরে যা। আমি খিল বন্ধ করব।"

যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসেছিল শঙ্কর। বলবামাত্র উঠে এল।

ঘরে ঢুকে দেখলে, ইন্দ্রাণী খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্কর দোরটা বন্ধ করে দিয়ে খাটে গিয়ে বসল। ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালে। লজ্জা করছিল একটুখানি, তবু সে হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীব কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনলে।

শঙ্কর ভেবেছিল সে অতি সহজে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে তার গায়ের ওপর ঢলে পড়বে, লজ্জায় তাব বুকে মুখ লুকোবে। কিন্তু সে-জাতের মেয়েই নয় ইন্দ্রাণী। এগিযে এল বটে শঙ্কবেব কাছে, কিন্তু সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার মাকে আপনি এরকম করে ঠকালেন কেন?"

ইন্দ্রাণীর মুখ থেকে প্রথমেই সে একথা শুনবে সে-আশা করেনি। তবে এ প্রশ্নের জন্যে শঙ্কর প্রস্তুত হয়েই ছিল। বললে, "আমি ঠকালাম? তোমার মাকে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "হ্যাঁ। আপনি দেড় শ টাকা মাইনের চাকরি করেন, সায়েব আপনাকে বিলেত পাঠাতে চাচ্ছে—আপনি আই. এস-সি পাশ করেছেন, এই সব মিথ্যে কথা বলে আমার সর্বনাশ করবার কী দরকার ছিল আপনার?"

শঙ্কর বললে, "কে বলেছে এ-সব কথা? আমি বলেছি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আপনি নাই-বা বললেন, বলেছে আপনার ঘটক।"

শঙ্কর হেসে উঠল। "ঘটক ত আমার নয়। ঘটক তোমার মায়ের। আমাকেও সে তোমার মায়ের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"বলেছে, তোমার মা খুব বড়লোক। তোমার মায়ের হাতে মেলা টাকা আছে।"

"আছেই ত।"

শঙ্কর বললে, "ছাই আছে। তাই তিনি একটা পয়সাও দিতে পারলেন না আমাকে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "দিযেছে ত এক হাজার টাকা।"

"একটা পযসাও না। আমার হাতে তিনি একটা পয়সা দেননি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ঘটকের হাতে দিয়েছে।"

শঙ্কর বললে, "তাই সে ঘটকের আর টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। সেই টাকা নিয়ে ঘটক পালিয়েছে।"

"সেও কি আমার মায়ের দোষ?"

শঙ্কর বললে, "না, আমার দোষ।"

ইন্দ্রাণী বললে, "লেখাপড়া-জানা মেয়ে আপনার মা পছন্দ করেন না বলে লুকিয়ে আপনি আমাকে বিয়ে কবতে গেলেন, সে-দোষটা কার?"

"আমার।" শঙ্কর এবার ইন্দ্রাণীর মুখেব দিকে তাকিয়ে বললে, "সে-দোষটা সত্যিই আমার, কারণ তোমাদের ওই ঘটক দাসু তোমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলেছিল আমাকে, যার জন্যে আমি একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলাম তোমাকে পাবার জন্যে।"

এই বলে ইন্দ্রাণীকে সে তার কোলের কাছে টেনে আনলে। এবার আর ইন্দ্রাণী পারলে না নিজেকে ঠিক রাখতে। বললে, "হুঁ। তা কেন হবে? আমার মায়ের সঙ্গে তোমার মায়ের দেখা হয়ে গেলে পাছে সব ফাঁস হয়ে যায় তাই তুমি গেলে লুকিয়ে বিয়ে করতে।"

শঙ্কর বললে, "যাক, এতক্ষণে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামলে।"

ইন্দ্রাণী এবার শঙ্করের চোখেব উপর চোখ বেখে জিজ্ঞেস করলে, "বল সত্যি কিনা!"

"কী সত্যি? কী বলব?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তোমার মা ভাত রাঁধে।"

"সে-খবরও পেয়েছ?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমি সব জানি। কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবে?"

"লুকিয়ে রাখতে ত চাইনি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "তুমি রোজগার করতে পার না?"

শঙ্কর বললে, "লেখাপড়া জানি না যে।"

"তাহলে লেখাপড়া-জানা মেয়ে বিয়ে করতে গেলে কেন?"

শঙ্কর বললে, "তার কাছে শিখব বলে।"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ পরে হেসে ফেললে। মুক্তোর মত শুভ্র সুন্দর দাঁতগুলি দেখা গেল, কালো দুটি চঞ্চল চোখের তারাও যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শঙ্কর এবার তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর তুলে এনে চেপে ধরলে।

ইন্দ্রাণী বললে, "কী জোর রে বাবা! সত্যিই তুমি একটি ডাকাত।"

"হ্যাঁ, আমি তাই।"

শঙ্কর আর তাকে কোনও কথা বলবার অবসর দিলে না। ইন্দ্রাণীব সুন্দর মুখখানি নিজের মুখ দিয়ে চেপে ধরে, বাঁহাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা নিবিয়ে দিলে।

পবেব দিন সকালে বাড়িওলা আবার এসে হাজির।

বিমলা তাঁকে দেখেই বলে উঠল, "ওরে ও শঙ্কর, ভদ্রলোকের রাত্তিবে ঘুম হয়নি। ওঁর টাকাটা দিয়ে দে!"

বাড়িওলা বললেন, "হ্যাঁ দিন। আমি একেবারে রসিদ কেটে এনেছি।"

শঙ্কর এসেই বললে, "কী মশাই, কী বলেছেন আপনি?"

"কই কিছুই ত বলিনি।"

শঙ্কর বললে, "নিশ্চয় বলেছেন। আমি গুণ্ডা, আমি জোচ্চোর, আমি আপনার টাকা মেরে দেব—এ-সব আবার কীরকম কথা?"

এরকম ভাবে যে শঙ্কব তাঁকে আক্রমণ করবে, সে কথা তিনি ভাবেননি। তিনি কাঁচুমাচু করতে লাগলেন। "না না, ও-সব কিছু নয়, মানে তুমি ত—"

শঙ্কর ধমক দিয়ে উঠল, "খবরদাব 'তুমি' বলবেন না। আমি আপনাব চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও আপনার মত লোক আমাকে 'তুমি' বলবে—সে আমি সহ্য করব না।"

"আচ্ছা বেশ, তুমি বলব না। টাকাটা দিন আমি চলে যাই।"

কোনরকমে টাকাটা নিয়ে তিনি পালাতে পারলে বাঁচেন।

শঙ্কব বললে, "বে-আইনী টাকা নিতে এসেছেন, তার ওপর মুখের চোট-পাট দ্যাখো!"

বিমলা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, "অত সব কথায় কাজ কী বাবা, টাকা দেব বলেছিস, দিয়ে দে। প্যাঁচানো কথা আমি ভালবাসি না।"

শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি থাম।"

"মুখের হুমকি দিয়েই ত থামিয়ে দিয়েছিস চিরকাল।"

বাড়িওলা বললেন, "ওই দেখুন, আপনার মা হলেন গিয়ে সাচ্চা মানুষ, উনি ঠিক বলেছেন।"

শঙ্কর বললে, "না, ঠিক বলেননি। আপনাকে টাকা আমি আজ দেব না। আজ আমার বাড়িতে কাজ। কাল সকালে আসবেন। টাকা নিয়ে যাবেন। এখন আপনি থানায় যেতে চান যান, আদালতে যেতে চান যান। এই আমার শেষ কথা।"

বাড়িওলা বিমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকাব করে উঠলেন, "দেখুন মা, দেখুন—"

"মা কী দেখবেন? বেশী চেঁচামেচি যদি করবেন ত আমিই থানায় যেতে বাধ্য হব। তখন সেই মাসের শেষে টাকা পাবেন। যান আপনি।"

এবার আইনের কথা। সত্যিই যদি ছোঁড়াটা এইরকম কিছু করে বসে, বাধ্য হয়ে তাকে এক মাস পরে টাকা নিতে হবে। তার চেয়ে—

বাড়িওলা বললেন, "বেশ, তবে আমি কালই আসব।"

কিন্তু কী দুঃখে যে সে-কথা তিনি বললেন, তা তিনিই জানেন। পিছন ফিরে ঘোঁত ঘোঁত করে বলে গেলেন, "তাহলে যা শুনেছি, সেই কথাই সত্যি।"

কথাটা শঙ্কর শুনতে পেলে, চেঁচিয়ে বললে, "আবার?"

বলে যেই সে দোরের বাইরে পা বাড়িয়েছে বাড়িওলা পিছন ফিরে দেখেই দে ছুট!

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বউয়েব ব্যবহার দেখে বিমলা বিশেষ খুশি হতে পারেনি।

কোন্ মা-ই বা হয়?

শঙ্কর দোর বন্ধ করে ফিরে আসতেই বিমলা আপনমনেই বলতে লাগল, তুই যদি ভাল হবি ত আমার এ দুর্দশা কখনও হয়! গুণ্ডার মতন চেহারাটা বাগালেই মানুষ হয় না। পেটে একটু বিদ্যে থাকা দরকার।"

শঙ্কর বললে, "মা, একটু থামবে?"

তাব ভয় শুধু বউ বুঝি শুনতে পায়।

মা কিন্তু থামল না। থামতে পারলে না। আজও সে নিজেই কাজ করে যাচ্ছে। বউ তেমনি হাত গুটিয়ে বসে আছে।

বিমলা বললে, "দূর দূর, এ-জীবন আর রাখতে ইচ্ছে করে না।"

শঙ্কর বললে, "কেন। কী, হল কী তোমার?"

বিমলা রাগ করেই বললে, "কিছুই হয়নি। মিথ্যে কথা, চালাকি, প্যাঁচ-পয়জাব আমি ভালবাসি না। সোজা সত্যি পথে আমি চলতে চাই, তাতে আমার যা হয় তাই হবে।"

শঙ্কর বললে, "বেশ বাবা, তাই চল তুমি। আমি খারাপ, আমি বজ্জাত, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমি গুণ্ডা—"

বিমলা বললে, "হ্যাঁ, তাই ত। টাকা পেলি তবু ওই ছ্যাঁচড়া লোকটাকে যা-তা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি। এটা কি তোর ভাল হল? এ টাকা দিয়ে বড়মানুষি দেখাবার জন্যে কী দরকার ছিল তোর এই বাড়ি ভাড়া নেবার?"

শঙ্কর বললে, "তাও কি তোমাকে দেখতে হবে?"

"না, কিছুই আমাকে দেখতে হবে না, চোখ বুজে থাকতে হবে। আর তোর জ্বালায় আমাকে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে?"

শঙ্কর বললে, "আমাব জ্বালায় কখন তুমি জ্বলেপুড়ে মরলে? দ্যাখো, মিথ্যে কথা বোল না।"

বিমলা বললে, "আমি মিথ্যে কথা বলি?"

শঙ্করের এই একটি কথায় বিমলাব বুকের ভেতরটা তোলপাড় কবে উঠল। বললে, "তুই শেষে আমাকে এই কথা বললি শঙ্কর?"

বলতে বলতে গলার আওয়াজ তার বন্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে দরদর করে জলের ধারা গড়িয়ে এল। সর্বশরীর তাব থরথর কবে কাঁপতে লাগল। তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই বললে, "মাকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজে দেখে-শুনে বিয়ে করলি। নিজের পেটে এক ফোঁটা বিদ্যে নেই আর লেখা-পড়া-জানা পাশকরা একটা মেয়ে নিযে এলি বিযে করে। ফর্সা রং দেখে। একদিনেই তাব গোলাম হযে গেলি। দেমাগে মাটিতে পা পড়ছে না মেয়েব। গোমড়া মুখ করে বসে আছে। একটা কথা পর্যন্ত বলে না। আমি যেন ও বাঁদী।"

শঙ্কবের আর সহ্য হল না। বললে, "চেঁচাও তুমি। আমি চললাম।"

এই বলে সে উঠে চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, "মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তোমার নেই তা আমি জানি। আগুন না জ্বালিয়ে তুমি ছাড়বে না।"

বিমলা রাগের মাথায় বললে, "সত্যি যা তাই বলব, তাতে আগুন জ্বলে ত জ্বলুক।"

মার উপব রাগ করেই শঙ্কর বেরিয়েছিল।

ইন্দ্রাণী তার কথাগুলো নিশ্চয়ই শুনেছে। শুনে কী ভাবলে সে জানে যা ভাবে ভাবুক।

শঙ্করের চাই টাকা। তা সে যেমন করেই হোক। দাসু তাকে এই বিপদে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। মুখ ফুটে কাউকে সেকথা সে বলতে পর্যন্ত পারছে

না। এখন নিজের সম্মান যদি বাঁচাতে হয় ত নগদ কিছু টাকা ছাড়া কোনও পথ নেই।

বেলা দুটো পর্যন্ত এখান-ওখান সে বৃথাই ঘুরে মরল। কোথাও একটা পয়সাও পেলে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল সুরপতিবাবুর কথা। সুরপতি তাকে ভালবাসেন। হয়ত-বা এই বিপদের দিনে তাকে তিনি সাহায্য করতে পারেন।

শঙ্কর সেইদিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলে, রাস্তা দিয়ে একটা মোটর-বাইক আসছে। মোটর-বাইকের ওপর বসে আছে সাহেবী পোশাক পরে এক যুবক। শঙ্কর দূর থেকে দেখেই তাকে চিনতে পারলে। এই সেই তার সহপাঠী নবেন। বোসবাগান ক্লাবের সামনে নবেনের মা তাকে চরম অপমান করেছিল, সেকথা সে সারা জীবনে ভুলবে না।

শঙ্কর ডাকলে, "নরেন।"

নবেনও চিনতে পেরেছিল শঙ্করকে। বোধকরি তার ইচ্ছে ছিল পালিয়ে যাবার। মোটর-বাইকটাকে একটু পাশ কাটিয়ে অনায়াসে পালিয়ে যেতেও সে পারত, কিন্তু কী জানি কেন, পালিয়ে সে গেল না। মোটর-বাইকটা থামিয়ে বললে, "হ্যালো শঙ্কর, কোথায় ছিলি রে এতদিন?"

"আমার কি আর থাকবার কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? এখান-ওখান করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

নরেন বললে, "আমাব বিয়ের সময় নেমন্তন্নর চিঠি নিয়ে তোকে কত খোঁজাখুঁজি করলাম, কোথাও পেলাম না।"

"বিয়ে করেছিস?"

"হ্যাঁ ভাই, করেছি। মা ছাড়লে না।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "যাচ্ছিস কোথায়?"

নরেন বললে, "রেসে।"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

বলেই সে মোটব-বাইকটার পিছনের সীটে বসে পড়ল। বললে, "চল, আমাকে একটু পোঁছে দিবি একটা জায়গায়।"

নরেন বললে, "আমার দেরি হয়ে যাবে না?"

"না না, এ আর কতক্ষণ। তুই ত উড়ে চলে যাবি।"

কিন্তু গন্তব্যস্থান কোথাও নেই শঙ্করের। সে শুধু নরেনকে কতকগুলো কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না বলেই চড়ে বসল তার গাড়িতে। নরেনের ফুটিয়ে-দেওয়া হুলের জ্বালা সে এখনও ভুলতে পারেনি।

ডানদিকের পথটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। শঙ্কর বললে, "ডানদিকে।"

নরেন ডানদিকে গাড়ি ঘোরালে।

শঙ্কর কথা আরম্ভ করলে।

"তুই আমাকে একদিন পাঁচশ টাকা দিয়েছিলি মনে আছে?"

নরেন কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। বললে, "ও-সব পুরনো কথা আবার কেন?"

শঙ্কর বললে, "পুরনো নয় নরেন, সেই পাঁচশ টাকা পাঁচহাজার হয়েছিল তোর মার কাছে। আব তার জন্যে তোর মা নিজে এসে আমাকে যেরকম ভাবে অপমান করে গিয়েছিল, সে অপমানের জ্বালা যে আমি আজও ভুলতে পারিনি নরেন।"

নরেন আমতা আমতা করে বললে, "মেয়েছেলের কথা আবার ধরে। গুলি মারো ও-সব কথায়।"

"গুলি না হয় মারলাম। কিন্তু তুই কেমন করে অত ছোট হলি রে? আমি তোকে ইস্কুল ছাড়িয়েছি, এক্সাবসাইজ্ করাতে গিয়ে আমি তোর পা ভেঙে দিয়েছি—"

হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকানি লাগল শঙ্কবেব সর্বাঙ্গে। মনে হল যেন নরেন ইচ্ছে করেই বাইকটাকে কাঁপিয়ে দিলে। আব-একটু হলে শঙ্কর ছিটকে পড়ে যেত রাস্তাব ওপব মুখ থুবড়ে। কিন্তু শঙ্করকে ফেলে দেওয়া অত সহজ নয়। শঙ্কর দুহাত দিয়ে জাপটে ধরলে নরেনকে।

এই ধবতে গিয়েই হল বিপদ। কী একটা মোটা জিনিস হাতে ঠেকতেই শঙ্কর তাকিয়ে দেখলে চামড়ার একটা মোটা মনিব্যাগ রয়েছে নরেনের কোটে পকেটে। চট করে শঙ্কর সেটা তুলে নিলে।

নবেন চিৎকার কবে উঠল, "আহা-হা, ওটা তুললি কেন?"

"পড়ে যেত যে।"

"না, পড়ত না। দে।"

গাড়িটা থামিয়ে নরেন হাত বাড়ালে।

"দাড়া দাঁড়া, দিচ্ছি।"

হাতটা সরিয়ে নিয়ে শঙ্কর তখন মনিব্যাগটা খুলে ফেলেছে। এক গোছা একশ টাকাব নোট। দশ-পাঁচ টাকার নোট রয়েছে মাত্র কয়েকখানা।

"এত টাকা কী করবি? সব ঘোড়ার পেছনে নষ্ট করবি?"

নরেন বললে, "ঘোড়ার মর্ম তুই বুঝবি না। দে।"

নরেন একরকম জোর করেই কেড়ে নিতে চাইলে মনিব্যাগটা।

কিন্তু শঙ্করের হাত থেকে কোনও জিনিস কেড়ে নেওয়া অত সহজ নয়। নোটের তাড়া থেকে চট্ করে পাঁচখানা একশ টাকার নোট বের করে নিলে মনিব্যাগটা নরেনের গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শঙ্কর বললে, "পাঁচশ দিয়েছিলি, আরও পাঁচশ নিলাম। এক হাজার হল। তোর মা বলেছিল তুই

নাকি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিস। কাজেই তোর কাছ থেকে আরও চার হাজার টাকা পাওনা রইল আমার।”

“না না, এ-টাকা থেকে একটা পয়সা দিতে পারব না।”

“ভাবিব, ঘোড়ার পেছনে ঢেলে দিয়েছিস।”

শঙ্কর নামতে যাচ্ছিল গাড়ি থেকে। শঙ্করের মুখের ওপর ঝট করে বেমক্কা একটা ঘুঁষি চালিয়ে দিলে নরেন।

অতর্কিতে ঘুঁষিটা বেশ জোরেই লাগল শঙ্করের চোয়ালে।

শঙ্কর তখন রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। বললে, “ওতে আমার কিছু হবে না নরেন। এই বিদ্যেটাই তোকে আমি শেখাতে চেয়েছিলাম, তুই শিখলি না।”

নরেন কিন্তু সে কথায় কান দিলে না। গাড়ির স্ট্যান্ডটা পা দিয়ে নামিয়ে, বেড়াল যেমন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি করে নরেন ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের ওপর। গায়ের জোরে শঙ্করের সঙ্গে সে পেরে উঠবে না তা জানে, তাই ভেবেছিল, নখ দিয়ে আঁচড়ে, দাঁত দিয়ে কামড়ে শঙ্করকে সে নাস্তানাবুদ করে নোটগুলো কেড়ে নেবে। কিন্তু সে-সুযোগ শঙ্কর তাকে দিলে না। প্রথমে হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, বললে, “তুই ত এ-রকম ছিলি না নরেন, এ-রকম হলি কেমন করে?”

“চিরকাল বোকা থাকব নাকি? দে, আমার টাকা ফিরিয়ে দে।”

এই বলে সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে শঙ্করের জামা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

শঙ্কর বললে, “এ-রকম করিস না নরেন, রেসে তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে, যা।”

শঙ্কর চলে যাচ্ছিল, রাস্তা থেকে ভাঙা ইঁট তুলে নিয়ে নরেন প্রাণপণে ছুঁড়ে মারলে শঙ্করের মাথা লক্ষ্য করে। মাথায় না লেগে ইঁটটা গিয়ে লাগল শঙ্করের পিঠে। খুব জোরে লাগল ইঁটটা। শঙ্কর আর চুপ করে থাকতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে নরেনের মুখের উপর চালিয়ে দিলে এক ঘুষি। নরেন টাল সামলাতে না পেরে উল্টে গিয়ে পড়ল তার বাইকের উপর। মাথা তুলে যখন সে উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল, তার ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে। একটা দাঁত গেছে নড়ে। রক্ত আর থামে না কিছুতেই।

রুমাল দিয়ে মুখখানা চেপে ধরে নরেন চিৎকার করতে লাগল। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল শঙ্করকে।

রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেল।

নরেন বললে, “তোমরা সাক্ষী রইলে। আমি নালিশ করব ওর নামে।”

এই বলে একটা কাগজ আর কলম নিয়ে সে এগিয়ে গেল তাদের কাছে।

বললে, "তোমাদের নাম আর ঠিকানা দাও। ও আমাকে মেরে আমার টাব কেড়ে নিয়ে চলে গেল।"

নাম-ঠিকানা কিন্তু কেউ দিতে চাইলে না। সবাই ধীরে ধীরে সরে পড়ল। একটা লোক শুধু থানাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "চলে যান সোজা। ওই যে দেখছেন—ওইটেই ঝিলপাড়া থানা।"

থানার দারোগা নরেনকে খাতির করলেন খুব। পরনে স্যুট আর মোটর বাইক দেখে তাঁর ডায়রিটা প্রথমেই তিনি লিখতে বসলেন। তারপর যখন শুনলেন, যে-ছোকরা তার টাকা কেড়ে নিয়ে চলে গেছে তার নাম শঙ্কর, আর তার চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ আর জোয়ান, তখন যেন খাতিরটা তার একটুখানি বেড়ে গেল। এ সেই শক্তি-মন্দিরের শঙ্কর না হয়ে যায় না।

শঙ্করকে যেদিন তিনি মুচলেকা-বণ্ডে সই করাতে চেয়েছিলেন, সেদিন তাঁকে সে অপমান করে চলে গিয়েছিল। কিছুতেই তাকে তিনি সই করাতে পারেননি। সেইদিন থেকে দুর্বিনীত এই ছোকরাটিব উপর কেমন যেন একটা বিজাতীয় আক্রোশ তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল। আজ যেন সেই নিষ্ফল আক্রোশ চরিতার্থ করবার একটা পথ খুঁজে পেলেন তিনি।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তার ঠিকানা?"

নবেন এইবাব বিপদে পড়ল। তাব ঠিকানা ত সে জানে না।

বোসবাগান ক্লাবেই সে তাকে দেখেছে, আব তাবই কাছাকাছি কোথায় যেন তার বাড়ি, এইটুকু সে জানে।

দাবোগাবাবুও একটু চিন্তিত হলেন। অবিলম্বে তার ঠিকানা জানা একান্ত প্রয়োজন।

থানার জিপ গাড়িটা দোরেই দাঁড়িয়েছিল। দুজন কনেস্টবলকে আসতে বললেন হাতকড়া নিয়ে। নিজেব ইউনিফর্মে রিভলবারটা বেঁধে নিলেন। নবেনকে বললেন, "আপনি আসুন আপনার মোটব-বাইকে আমাদের পিছু পিছু।"

প্রথমেই গেলেন শক্তি-মন্দিরে। জন-দুইতিন ছেলে মাত্র ব্যায়াম করছিল। শ্রীহরিও নেই, শঙ্করও নেই। জিজ্ঞেস করে জানলেন, শঙ্কর অনেকদিন থেকেই এখানে আসছে না। শ্রীহরিও সবদিন আসে না।

দিনটা ছিল শনিবার। ছোঁড়াটাকে আজ ধরতে পারলে খুব ভাল হত। শনি, রবি দুটো দিন থানাব হাজতে পুরে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিতে পারতেন তিনি। তারপর সোমবার তাকে আদালতে হাজির করলেই চলত।

যাই হোক, দারোগাবাবু বললেন, "সোমবার ওর নামে ওয়ারেণ্ট বের কবে তাকে একদিন আমি ধরে ঠিক ফেলবই। এখন চলুন ত দেখি হাসপাতালে, আপনার নামে একটা ইনজুরি রিপোর্ট বের করে নিয়ে আসি।"

এই বলে নরেনকে নিয়ে চলে তিনি যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেখলেন শ্রীহরি আসছে হেলতে-দুলতে। দারোগাবাবুকে দেখে ভয়ে তার মাথাটা একবার ঘুরে গেল। তবু সে জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, "নমস্কার দারোগাবাবু, কী খবর?"

"এমনিই এলাম একবার। ভাবলাম দেখা করে যাই।"

শ্রীহরি বললে, "তাই বলুন। আপনাকে দেখে ত প্রাণ আমার উড়ে গিয়েছিল।"

দারোগাবাবু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সেই বন্ধুটিকে দেখছি না?"

"শঙ্করদার কথা বলছেন? সে ত আর আসেই না। আজ যে তার বিয়ের বউভাত।"

দারোগাবাবু বললেন, "বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে যাবে না?"

শ্রীহরি বললে, "যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়িতে একটা খুব জরুরী কাজ পড়ে গেল। যাওয়া বোধহয় হবে না।"

"আজকাল সে থাকে কোথায়?"

শ্রীহরি তার পকেটে হাত দিয়ে ছোট একটুকরো কাগজ বের করে বললে, "এই যে, কাল ওর ঠিকানাটা আমি টুকে রেখেছিলাম।"

কাগজের টুকরোটা যেন শ্রীহরির হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন দারোগাবাবু। পড়ে দেখলেন ঠিকানাটা। তারপর কাগজখানি আবার শ্রীহরির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "চলি। আমার আবার কাজ আছে।"

বাড়িওলা টাকা পেয়ে খুশি হয়ে চলে গেছে।

জন-পঞ্চাশেক লোকের খাবার আয়োজন সবই করে দিয়েছে শঙ্কর, অথচ নিজের বন্ধু-বান্ধব কাউকে সে নিমন্ত্রণ করেনি।

বিমলা জিজ্ঞেস করলে, "এ-সব কে খাবে তাহলে?"

শঙ্কর বললে, "তুমি যাদের নিমন্ত্রণ করেছ তাদের বেশ ভাল করে খাইয়ে দাও।"

বিমলা ভাবলে এটা তার রাগের কথা। বললে, "বিয়ের পর ছেলে পর হয়ে যায় জানি। কিন্তু আমার এমনি পোড়া কপাল যে, ছেলে পর হল বিয়ের দিন থেকেই।"

কথাটার জবাব দিলে না শঙ্কর।

বউয়ের উপর খুশি হতে পারেনি বিমলা। সেকথা সে জানিয়েছে শঙ্করকে। কিন্তু একমাত্র ছেলেই যদি তার পর হয়ে যায়, গরিব বলে বউমা যদি তাকে অগ্রাহ্য করে, তাহলে কী প্রয়োজন ছিল তার ছেলের বিয়ে দেবার?

মনের ভিতর কথাটাকে এতক্ষণ সে চেপে রেখে গুমরে গুমরে মরছিল, কিন্তু আর চেপে রাখতে পারলে না। ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "রূপের দেমাগ, তার ওপর লেখাপড়া-জানার অহঙ্কার। ও আমাকে দাসী-বাঁদী ভাববে তাতে আর আশ্চর্য কী!"

শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল, "মা তুমি চুপ কর। তুমি ভুল বুঝছ।"

বিমলা বললে, "না। মা কখনও ভুল বোঝে না। আমি ঠিকই বুঝছি। তোর পেটে যদি বিদ্যে থাকত, মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকত, তাহলে ও-মেয়েকে বিয়ে তুই কখনও করতিস না।"

ইন্দ্রাণী আর চুপ করে থাকতে পারলে না।

"তা বেশ ত। গুণ্ডা ছেলেকে হুকুম করলেই ত হয়। ঘাড়ে ধরে বের করে দিক। চলে যাচ্ছি।"

"কী বললে? আমার ছেলে গুণ্ডা?"

আগুন জ্বলল। দু'জনের মনের ঝাল দু'জনেই মেটাতে লাগল প্রাণপণে।

বিপদে পড়ল শঙ্কর। না পারে বউকে থামাতে, না পারে মাকে।

ঝগড়া যখন তাদের চরমে উঠেছে, খুব জোরে জোরে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

সমর ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকল ঝিলপাড়া থানার দারোগাবাবু। সঙ্গে একজন কনেস্টবল। লাল রক্তে-রাঙা একটা রুমাল মুখে চাপা দিয়ে দোরের কাছে উঁকি মারছে নরেন।

বুঝতে কিছু বাকী রইলো না শঙ্করের।

কিন্তু আজ?

শঙ্কর কী করবে কিছুই বুঝতে পারলে না। এই কটা লোকের হাত ছাড়িয়ে অনায়াসে সে পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু দারোগাবাবুর কোমরে চামড়ার বেল্টের দিকে তাকিয়ে তার সাহস হল না। বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে এক্ষুনি। গুলি অবশ্য তিনি চালাতে পারবেন না। গুলি চালাবার মত অপরাধ সে করেনি। আর করলেও তার প্রমাণ কিছু নেই। কিন্তু ফাঁকা একটা আওয়াজ করলেও লোক জড় হয়ে যাবে। অপমানের বাকী কিছু থাকবে না।

পিছনে ফিরে দেখলে ইন্দ্রাণী দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওদিকে বারান্দার পাশে মা দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর এগিয়ে যাচ্ছিল দারোগাবাবুর দিকে।

"নমস্কার! কী খবর?"

দারোগাবাবু এ-সুযোগ পরিত্যাগ করলেন না। কনেস্টবলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "লাগাও হাতকড়া!"

হাতকড়া!

চমকে উঠল শঙ্কর। মনে পড়ল সেই মুচলেকা সই করবার কথা। দারোগাবাবুর চোখে দেখলে সেই হিংস্র আক্রোশ। বললে, "হাতকড়া লাগাবার মত কী করেছি আমি? চলুন, যাচ্ছি।"

কিন্তু কনেস্টবল তখন হুকুম পেয়ে গিয়েছে। সে শুনবে কেন? হাতকড়া নিয়ে সে এগিয়ে এল শঙ্করের দিকে। শঙ্কর বললে, "খবরদার!"

তবু সে এগিয়ে আসছে দেখে শঙ্কর চালিয়ে দিলে এক ঘুষি। লোকটা বাপ্‌স বলে পেটে হাত দিয়ে পিছিয়ে গেল। দাবোগাবাবু নিজে এইবার এগিয়ে এলেন রিভলবার হাতে নিয়ে। বললেন, "পালিয়ো না বলছি। মরে যাবে।"

শঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল। কনেস্টবলটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে লাগালো হাতকড়া।

বিমলা তখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করলে, "হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কী করেছে শঙ্কর?"

"পরে বুঝতে পারবেন।"

দারোগাবাবু শঙ্করকে নিয়ে চলে গেলেন, শঙ্করের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

বিমলাও দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে।

বিপদের সময় রাগ-অভিমান করা বৃথা। বউমা লেখাপড়াজানা মেয়ে। এ সময় কী করা উচিত, সে-ই ভাল বুঝবে। বিমলা বোধকবি তাকেই জিজ্ঞেস করবার জন্য ডাকলে, "বউমা!"

বউমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বিমলা তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কবলে, "এ-সময কী করা উচিত—"

ইন্দ্রাণী কথাটা তাকে শেষও কবতে দিলে না, জবাব দেবাব জন্যে দাঁড়ালও না, দোরেব দিকে যেতে যেতে শুধু বলে গেল, "গলায় দড়ি দিয়ে মবা উচিত।"

বিমলা দেখলে তাব সুটকেসটা হাতে নিয়ে সমর তার পিছু পিছু চলেছে।

বুঝতে কিছু বাকী রইল না বিমলার।

"তুমি চলে যাচ্ছ বউমা?"

কথাটার জবাব দিলে না ইন্দ্রাণী। ফিরেও তাকালে না।

"বউমা! বউমা।"

বলতে বলতে বিমলা তাব পিছু-পিছু সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। "ছি-ছি, বিয়ের কনে তুমি এরকম করে চলে যেয়ো না বউমা, আমি তোমাকে

যা বলেছি, সব ফিরিয়ে নিচ্ছি বউমা। আমি তোমার দুটি হাতে ধরে বলছি, শঙ্কর ফিরে আসবে।"

দোরের বাইরে বিমলা রাস্তায় এসে চেঁচিয়ে ডাকলে, "বউমা।"

বউমা তার ভাইকে নিয়ে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমলার দুচোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এল।

থানার দারোগাবাবু যা ভেবেছিলেন তাই করলেন। শঙ্করকে থানার হাজতে পুরে দিয়ে নির্যাতনের বাকী কিছু রাখলেন না। শনিবার, রবিবার—দুটি রাত্রি আর একটি দিনের ইতিহাস শঙ্করের জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

আদালতে গিয়ে কিন্তু সব-কিছু গেল গোলমাল হয়ে। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করতে লাগল শঙ্কর। তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই, জামিন হবার মানুষ নেই, একটা উকিল নেই, মোক্তার নেই, বিচার দেখবার জন্য আছে শুধু কৌতূহলী জনতা।

ফরিয়াদী নরেনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দারোগাবাবু মামলাটা সাজিয়ে দিয়েছিলেন বেশ ভাল করে। মোটর-বাইকে চড়ে নরেন যাচ্ছিল রেসে। পকেটে ছিল বারোখানা একশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা-পয়সা। পথের ওপর হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে শঙ্কর রাহাজানি করে। পকেট থেকে জোর করে মনিব্যাগটা সে তুলে নেয়। তারপর দুজনে মারামারি। শঙ্কর মনিব্যাগ খুলে সাতখানা নোট বের করে নিয়ে মনিব্যাগটা ছুঁড়ে দেয় তার গায়ের ওপর, আর ঘুষি মেরে তার একটা দাঁত ভেঙে দেয়। শঙ্করের গায়ের জোরে নরেন পেরে ওঠে না। তখন সে থানায় গিয়ে ডায়রি লেখায়।

এই রাহাজানির প্রত্যক্ষদর্শী দুজন সাক্ষীও ছিল।

দারোগাবাবু টাকাগুলো উদ্ধার করবার জন্যে নরেনের সঙ্গে শঙ্করের বাড়িতে যান। পুলিস দেখে শঙ্কর পালাতে চায়। একজন কনেস্টবল তাকে ধরতে গেলে শঙ্কর তার পেটে ঘুঁষি মারে। তারপর অনেক কষ্টে অনেক ছোটাছুটি করে তাকে ধরতে হয়। তার পকেটে পাওয়া যায় দুশ তেইশ টাকা নগদ। আর দেড়শ টাকার একটা বাড়িভাড়ার রসিদ।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দু'জন প্রথমেই দিলে সব বানচাল করে।

একজন বললে, নরেনের পকেট থেকে শঙ্কর মনিব্যাগ তুলে নিয়েছিল। একজন বললে, নোটগুলো তুলে নিয়েছিল। একজন বললে, শঙ্কর লাথি মেরে নরেনকে উল্টে ফেলে দিলে। একজন বললে, ঘুঁষি মেরে দাঁতটা ভেঙে দিলে। সেই ভাঙা দাঁতটা নরেনকে সে নাকি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দেখেছে।

দারোগাবাবু বললেন, শঙ্কর টাকাগুলো নিয়ে গিয়েই বাড়িভাড়া দিয়েছে দেড়শ টাকা। ওই রসিদই তার প্রমাণ। বাকী টাকা কী করেছে ওই জানে। ওর কাছে পাওয়া গেছে দুশ' তেইশ টাকা। একটা পয়সাও সে রোজগার করে না। এত টাকা পেলে কোথায়?

বিচারক বার বার তাকাচ্ছিলেন শঙ্করের দিকে। প্রিয়দর্শন এক স্বাস্থ্যবান যুবক।

একটা উকিল পর্যন্ত সে দিতে পারেনি। সত্যই সে দরিদ্র। বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

শঙ্কর বললে, "আমি আর আমার বিধবা মা থাকি একটা বস্তিতে দশ টাকা ভাড়ায় দুখানা ঘর নিয়ে। গত বৃহস্পতিবার সাতাশ নম্বর নিবাবণ হালদার লেন, কালীঘাটে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের জন্যে একটি বাড়িভাড়া নিতে চেয়েছিলাম সাত দিনের জন্যে। এই বাড়িটি পেয়েছিলাম। বাড়িওলা বলেছিলেন, সাত দিনের জন্যে দেড়শ টাকা ভাড়া দিতে হবে। বলেছিলাম, বিয়েতে আমি এক হাজার টাকা নগদ পাব। সেই টাকা পেলে ভাড়া দেব। সেই টাকা পেয়ে শুক্রবার ভাড়া দিয়েছি। রসিদের তারিখটা একবার দেখুন।"

তারিখটা দেখা গেল, সত্যই শুক্রবারের তারিখ। অথচ ঘটনা ঘটেছে শনিবার।

"নরেনবাবু যে-কথা বলেছেন, সে-কথা সত্যি? ওঁর পকেট থেকে তুমি মনিব্যাগ তুলে নিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ হুজুর, নিয়েছিলাম।"

শঙ্কব বললে, "একটু আগে থেকে শুনতে হবে হুজুর। ঝিলপাড়ায় আমি আর শ্রীহরি বসাক—আমরা দুজনে একটি ক্লাব তৈরি করেছি। ক্লাবের নাম শক্তি-মন্দিব। ছেলেরা সেখানে ব্যায়ামচর্চা কবে। শক্তি-মন্দিরের আর একটি শাখা আছে। দরিদ্র-ভাণ্ডার। কারও বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন হলে আমবা সেখানে দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু চাঁদা ভিক্ষা করি। একবার পাড়ায় এক ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। বর আসছে খুব জোর প্রসেশন করে। আমাদের শক্তি-মন্দিরেব সামনে বরকর্তার মোটরের চাকা গেল পাঞ্চার হয়ে। আমরা সেই সুযোগে তাঁর গাড়ির কাছে গেলাম চাঁদার খাতা নিয়ে। ভদ্রলোক ভারী কৃপণ। একটি পয়সা দেবেন না। তিনিও দেবেন না, আমরাও ছাড়ব না। ববযাত্রীদেব ভিতর কে একজন পাশের বাড়ি থেকে লুকিয়ে টেলিফোন করে দেন থানায়। থানা থেকে এই দারোগাবাবু একটা জিপ নিয়ে গিয়ে হাজির। তিনি বললেন, আমি চাঁদা আদায় করে দিচ্ছি। তোমরা গিয়ে বোস আমার ওই জিপে। আমি আর শ্রীহরি গিয়ে বসলাম। উনি কৌশল করে আমাদের

দু'জনকে থানায় নিয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, মুচলেকা-বণ্ডে সই করতে হবে। রাস্তার মাঝে গাড়ি আটকে দলবল নিয়ে গিয়ে বেআইনী গাড়ি আটকেছ, লোক জড়ো করেছ। আমি কিছুতেই সই করতে চাইনি। সই না করে চলে এসেছিলাম। সেই থেকে ওঁর রাগ ছিল আমার উপর।

"নরেন আমার বন্ধু। এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছিলাম। দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য চাঁদা চেয়েছিলাম। দেয়নি। গত শনিবার ছিল আমার বিয়েব বউভাত। শক্তি-মন্দিরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কবতে বেরিয়েছিলাম। ফেরবার পথে দেখলাম মোটর-বাইকে চড়ে নরেন আসছে। হাত তুলে নরেন বলে ডাকতেই গাড়ি থামিয়ে নামল গাড়ি থেকে। বিয়ের কথা শুনলে, বউভাতের কথা শুনলে। কিন্তু জানি আমি, টাকার কথা শুনলেই সে খেপে যাবে। তাই সবার শেষে বললাম, দরিদ্র-ভাণ্ডারের চাঁদা দে। শুনেই পালাচ্ছিল, হাতটা চেপে ধরলাম। পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলে নিলাম। কিছুতেই দেবে না। আমিও ছাড়ব না। অতিকষ্টে মনিব্যাগ খুলে দশ টাকাব একটি নোট বেব করে নিয়ে মনিব্যাগ ওব হাতে দিয়ে ছুটে পালালাম। 'দশ টাকা চাঁদা আমি দেব না। তোর দরিদ্র-ভাণ্ডাব না কচু।' এইসব বলতে বলতে সেও আমাব পিছু পিছু ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। আমি হাসতে হাসতে বাড়ি চলে এলাম।

"মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দোকানের টাকাটা দিতে যাচ্ছিলাম, দোরেব কড়া নড়ে উঠতেই আমার শালা গিয়ে দরজা খুলে দিলে। দেখি দারোগাবাবু, দু'জন কনেস্টবল, হাতকড়া রিভলবাব নিয়ে গিযে হাজির। কেন এলেন কিছুই বুঝতে পাবিনি, নমস্কার করে কাছে এগিযে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর? চট করে উনি একজন কনেস্টবলকে হুকুম করলেন, লাগাও হাত-কড়া। অবাক হয়ে গেলাম। কেন, কী করেছি আমি, কোনও কথারই তিনি জবাব দিলেন না। মা ছুটে এল। মা জিজ্ঞেস করলে। উনি শুধু বললেন, পরে বুঝতে পারবেন। তারপর আমার মা, আমার স্ত্রী, ছোট শালা—সবার চোখের সামনে আমাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে এসে জিপে তুললেন। জিপের কাছে দেখলাম, মোটর-বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে নরেন। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি তোর কাজ নাকি? নবেন তাড়াতাড়ি বাইকে চড়ে চলে গেল। তারপর থানায় হাজতে নিয়ে গিয়ে দুটি দিন ধরে আমার ওপর অত্যাচারের আর কিছু বাকী রাখেননি দারোগাবাবু।"

শঙ্কর থামল।

বিচারক কী যেন লিখছিলেন।

শঙ্কর বললে, "আমি আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব নরেনকে।"

বিচারক বললেন, "কর।"

শঙ্কর বললে, "নরেনের যে-দাঁতটা আমি ভেঙে দিয়েছি, ওর সাক্ষী যেটা বাস্তায় ফেলে দিতে দেখেছে, ও একবার মুখটা হাঁ করে সেই জায়গাটা দেখাক।"

অনেকে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "দাঁত ভাঙেনি, তবে নড়ে গেছে।"

শঙ্কর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিবে এল শঙ্কর।

যাবার সময় মাকে সে কিছু বলে যেতে পারেনি। ইন্দ্রাণী কী ভাবছে কে জানে।

বাড়ির সুমুখে এসে দেখে, সদর দরজা খোলা। বাড়ির জিনিসপত্র কোথাও কিছু নেই। ওরা তাহলে এ-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বস্তির বাড়িতে চলে গিয়েছে। শঙ্কর ছুটল বস্তির দিকে।

বাড়িব সুমুখে এসে-দেখে, লোকে লোকাবণ্য।

এত লোক কেন? ভিড় ঠেলে এগিযে গেল শঙ্কব।

ঘবেব সুমুখে গিয়ে দেখে ফেরিওলা সেই বুড়ো বামু হাতে একটি ছোট লাঠি নিয়ে বসে আছে চৌকাঠের পাশে।

"কী হয়েছে রামু?"

"এতক্ষণে এলে? যা হবাব তাই হয়েছে। ভেতবে গিয়ে দ্যাখো।"

বুড়ো তাব হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলে।

শঙ্কব ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গিয়ে যা দেখলে, সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। পবনেব কাপড়টায় আষ্টে-পৃষ্ঠে গিঁট দিয়েছে বিমলা—যাতে না খুলে যায়। তাবপর আর-একখানা কাপড় পাক দিযে দিযে দড়িব মত কবে চালার মাথার উপরে মোটা একটা বাঁশের সঙ্গে নিজেব গলায ফাঁসি লাটকে ঝুলে পড়েছে সে। পায়ের নীচে জলেব ড্রামটা কাত হয়ে পড়ে আছে।

শঙ্কব সেইদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। চিৎকাব করে উঠল, "মা।"

তাবপব সেইখানেই আছাড় খেয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বাইরে লোকজনের ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "এখন আর কাঁদলে কী হবে বাবা? তোমার মতন ছেলেব হাত থেকে মবে বেঁচেছে হতভাগী।"

রামু উঠে এল শঙ্করের কাছে।

"পুলিসে খবর দিতে হবে যে দাদাবাবু।"

আবার পুলিস।

শঙ্কর শুনেও শুনলে না কথাটা। তেমনি পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

খানিক বাদেই বাইরে কিসের যেন গোলমাল উঠল। রামু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, দুজন কনেস্টবল লোক হটাচ্ছে। পুলিস খবর পেয়ে গিয়েছে তাহলে।

ঝিলপাড়া থানার সেই জিপগাড়িখানা এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামলেন দারোগাবাবু।

মনের অবস্থা তাঁর ভাল ছিল না। আদালত থেকে রীতিমত অপমানিত হয়ে এসেছেন তিনি। অপমানিত হয়েছেন যার জন্য, সেই তাকেই যে আবার এই অবস্থায় দেখবেন তা তিনি ভাবতেও পারেননি।

শঙ্করের মা আত্মহত্যা করেছে, আর শঙ্কর কাঁদছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ভারী জুতোর আওয়াজ শুনে শঙ্কর মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলে। সেও ভাবতে পারেনি যে সেই দাবোগাবাবুই এসে দাঁড়াবেন তার মাথার কাছে। হাত বাড়িয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল শঙ্কর।

"কী হল দারোগাবাবু, কী হল দেখুন। আমার মা। আমার মা।"

কী বিচিত্র মানুষের মন। দুর্ধর্ষ এই থানা-অফিসারটির পাষাণ বদনাম চিরকালের। তাঁরও ছোট ছোট চোখ দুটো দেখা গেল চিক চিক করছে। শঙ্করেব শিয়রের কাছে উবু হয়ে তিনি বসে পড়লেন; তারপর হাত বাড়িয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন, "শঙ্কর!"

শঙ্কর চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। দেখলে, দারোগাবাবুব চোখে জল। বিশ্বাস করতে পারছিল না শঙ্কর। উঠে বসল।

দারোগাবাবু বললেন, "কেঁদো না শঙ্কর। চুপ কর। আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

অপ্রত্যাশিত এই সহানুভূতি।

শঙ্কব বড় বেশী বিচলিত হযে উঠল। আবার সে ভেঙে পড়ল কান্নায়। এত কান্না সে কখনও কাঁদেনি।

কয়েকদিন পরে, একদিন দেখা গেল, অশৌচ অবস্থায় শঙ্কর গিয়ে দাঁড়িয়েছে—কালীঘাটে তার শ্বশুরবাড়ির দরজায়।

কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে দরজা খুলে দিলে সমর। শঙ্করকে দেখেই সমর তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "মা, জামাইবাবু এসেছে।"

শঙ্কর তার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির উঠোনে।

ইন্দ্রাণী বোধ করি ঠিক সেই সময় তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল।

সমরের কথা শুনে আবার ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। ঢুকেই দোরের খিলটা দিলে বন্ধ করে। বড় আরশি-দেওয়া একটা আলমারি ছিল ঘরের ভিতর। সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। সিঁথির সিঁদুরটা মোছবার চেষ্টা করলে কাপড়ের আঁচলটা তুলে নিয়ে। কিন্তু কী জানি কেন, হাতটা তার থর থর করে কেঁপে উঠল। পারলে না মুছতে। হঠাৎ তার কানে এল—শঙ্কর বোধ করি বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকছে, "মা! মা!"

মা বোধ হয় সমরের কথাটা শুনতে পাননি। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"কে?"

শঙ্করকে দেখবেন তা তিনি আশা করেননি। বললেন, "তোমার চিঠি আমি পেয়েছি।"

তারপর কী বলবেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন না। খানিক চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমার মত ছেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এছাড়া ত আর কোনও উপায় ছিল না তোমার মায়ের। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কিছু বলবে?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না।"

বলেই সে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, আবার কী ভেবে ফিরে দাঁড়াল। বললে, "আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?"

মা বললে, "দেখা করে আর কী হবে বল! ইন্দ্রাণী!"

দোরের খিলটা ইন্দ্রাণী খুলে দিলে। ঠক করে একটা আওয়াজ হল। মা বললে, ওই ঘরে আছে।

ইন্দ্রাণী কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। খোলা একটা জানলার কাছে গিয়ে শিক ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কর দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

"তোমাকে আমি নিতে এসেছি ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল।

"তুমি কি যাবে না?"

"না।"

শঙ্কর আবার বললে, "কখনও যাবে না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না।"

"আমার সঙ্গে তোমার—"

কথাটা শঙ্কর শেষ করতে পারলে না। অন্য কথা বললে। বললে, "তোমাকে নিয়ে আমি অন্য জায়গায় চলে যাব। তোমাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করব।"

ইন্দ্রাণী ম্লান একটু হাসলে।

"বিশ্বাস করছ না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না।"

শঙ্কর একটু কাছে এগিয়ে এল। বললে, "আমি ভাল হব ইন্দ্রাণী। তুমি বিশ্বাস কর।"

ইন্দ্রাণী কোনও কথাই বললে না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কর বললে, "আমি যদি ভাল হই, আমাকে তোমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা না হয়, বল, তখন তুমি আসবে?"

কী জবাব দেবে ইন্দ্রাণী?

বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ যাব। কিন্তু কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। বললে, "এখন কিছু বলতে পারব না। আপনি যান।"

'তুমি' না বলে 'আপনি' বললে ইন্দ্রাণী।

শঙ্কর আর দাঁড়াল না। বললে, "আমি চললাম।"

যাবার সময় শুধু বলে গেল, "কিন্তু মনে থাকে যেন ইন্দ্রাণী, আমি তোমার স্বামী।"

ইন্দ্রাণী জবাব দিলে, "থাক, আর স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।"

কথাটা শুনতে পেলে শঙ্কর।

কানে যেন তার বিষ ঢেলে দিলে।

সেই ইন্দ্রাণী!

একটি রাত্রির সেই নিবিড় পরিচয়। সেই দুটি দেহ-মন-প্রাণের ঐকান্তিক মিলনের পরমক্ষণ, সেই দুটি উন্মুখ হৃদয়ের দান-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি—সবই কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল?

স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।

শহরের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে শঙ্করের কানে ক্রমাগত বাজতে লাগল ইন্দ্রাণীর মুখের সেই শেষ কথা ক'টি।

স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।

২

শঙ্কর একটা রেল-স্টেশনে গিয়ে নামল ট্রেন থেকে।

একজন লোককে জিজ্ঞেস করলে, “ময়নাবুনি কোন দিকে যাব?”

লোকটি বললে, “আসুন আমার সঙ্গে।”

শঙ্করের ন্যাড়া মাথায় তখন ছোট ছোট চুল গজিয়েছে। মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

মাঠের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ। লোকটির সঙ্গে শঙ্কর চলেছে ত চলেইছে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না!

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, “আর কতদূর?”

“আপনি নতুন আসছেন বুঝি?”

“হ্যাঁ ভাই।”

লোকটি বললে, “এখনও ক্রোশ-দেড়েক পথ।”

বলেই সে বাঁদিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেঃ “ওই যে জলা দেখছেন, ওই জলাটা পেরিয়ে, ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওইটে ময়নাবুনি। আমি এইদিকে যাব। আপনি চলে যান।”

এই বলে সঙ্গেব লোকটি ডান দিকে রাস্তা ভেঙে চলে গেল।

শঙ্কর একা।

চলতে চলতে কিছুদূর গিয়েই দেখলে, রাস্তা ফুরিয়ে গিয়েছে। সুমুখে ধানের মাঠ আর জলা। সেই জলার ওপর দিয়েই দেখলে লোক চলছে। গরুর গাড়িও যাচ্ছে একটা।

সেই জলার ধারে দাঁড়িয়ে শঙ্কর ইতস্তত করছে। ভাবছে, নামবে কি নামবে না। একটি লোক—সেও বোধহয় যাবে ময়নাবুনি গ্রামে—এসে দাঁড়াল তার পাশে। বললে, “ভাবছেন কী, পায়ের চটি জুতো খুলে হাতে নিন, আর এক হাত দিয়ে হাঁটুর কাপড়টা তুলুন একটুখানি, তারপর আসুন আমার পিছু পিছু।”

লোকটি নেমে পড়ল জলের ওপর। জল বেশী নয়। হাঁটুর নীচে।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, “ময়নাবুনি যাবার অন্য পথ নেই?”

“আজ্ঞে না। এইটেই পথ।”

শঙ্কর তার সঙ্গে জলাটা পেরিয়ে গেল। জলা থেকে উঠেই দেখলে কাদা। দু-একজন গ্রামের লোক কাদা বাঁচিয়ে চলেছে কোনরকমে, কিন্তু একটা গরুর গাড়ি দেখলে কাদায় পড়ে আর উঠতে পারছে না কিছুতেই। কাদায় চাকা গিয়েছে ডুবে, গরু দুটো প্রাণপণে চেষ্টা করছে টেনে তোলবার, কিন্তু পারছে না।

গাড়োয়ান গরু দুটোকে মারছে নিষ্ঠুরভাবে, চাকায় হাত লাগিয়ে ঠেলা-

ঠেলি করছে, কিন্তু এতটুকু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গাড়োয়ান আর তার সঙ্গী—দুজনেই হয়রান হয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে ব্যাপারটা। যে-লোকটি তার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, সে একবার জিজ্ঞেস করলে, "যাবেন না?"

শঙ্কর বললে, "না। আপনি যান।"

লোকটি চলে গেল।

শঙ্কর দেখলে, নিরীহ গরু দুটো শুধু শুধু মার খাচ্ছে। বললে, "ওদের মারছ কেন অমন করে?"

গাড়োয়ান একবার তাকাল শঙ্করের দিকে। একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসলে শুধু।

যে-লোকটি চাকা মারছিল সে বললে, "শহর থেকে আসছেন বুঝি? কোথায় যাবেন?"

শঙ্কর বললে, "ময়নাবুনি।"

"এই ত ময়নাবুনি। যান। দাঁড়িয়ে কেন?"

গরুর পিঠে বাড়ি পড়ল। —"কোনও কাজের নয়। বসে বসে খাচ্ছে শুধু। হে হে হে হে—আর-একটু, আর-একটু। নাঃ, পারলে না।"

চাকাটা উঠেছিল একটুখানি। আবার কাদার ভিতর পড়ে গেল।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে লোকটার। হাত দিয়ে মুছলে ঘামটা। তারপর আবার শঙ্করের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, "এই কাজ আমরা হরদম করছি বাবু, আমরা জানি কত ধানে কত চাল।"

শঙ্কর তখন তার শার্টের একটা হাত গুটচ্ছে। বললে, "হাত লাগাব নাকি?"

গাড়োযান হেসে বললে, "পারবেন কেন বাবু?"

"দেখতে দোষ কী?" বলেই শঙ্কর তার জামাব আস্তিন গুটলে, পবনেব কাপড়টা আর-একটু তুললে, তারপর নেমে পডল কাদায়।

কিন্তু চাকায় শুধু হাত সে লাগালে না, একটা কাঁধও লাগালে গাড়ির মোটা বাঁশটায়।

কিন্তু ওকী? গাড়োয়ান দুজনেই কাজ বন্ধ করে দিয়ে দাঁত বের করে মজা দেখছে।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়িয়ে দেখছ কেন? চালাও গরু দুটো।"

"পারবেন না বাবু, মিছিমিছি হাতে-পায়ে কাদা লাগাচ্ছেন কেন?"

বলতে বলতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা দুজন দু দিকে গরু দুটোকে চালাবাব চেষ্টা করলে। —"চল্ ব্যাটা চল্। বাবু যখন বলছেন, ওঁর মান রেখে—"

কথাটা শেষ হল না। শঙ্কর তার প্রাণপণ শক্তিতে কাঁধ দিয়ে গাড়িটাকে একটু তুলে ধরে চাকাটা দিলে ঠেলে। গাড়ি উঠে গেল কাদার ওপর।

গাড়োয়ান দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শঙ্করের দিকে।

একজন জিজ্ঞেস করলে, "কার বাড়ি যাবেন বাবু?"

"তারিণী মুখুজ্যের বাড়ি।"

একজন গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আর-একজন জবাব দিলে, "তেনাকে ত পাবেন না বাড়িতে।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "কেন? কোথায় গেছে?"

"যায় নাই কোথাও। রাখহরি ঘোষালকে হারিয়ে দিয়ে তিনি নতুন 'পেছডেন' হলেন কিনা। বারোয়ারী তলায় 'মচ্ছব' লেগে গেছে দেখুন গিয়ে।"

"মচ্ছব? সে আবার কী?"

"মচ্ছব জানেন না? শহরের মানুষ কিনা, জানবেন কেমন করে?"

লোকটি বুঝিয়ে দিলে, "মচ্ছব মানে আনন্দ-ফুর্তি। বাজনা-বাদ্যি বাজছে, গাওনা হচ্ছে, ফুর্তি করছে, খাওয়া-দাওয়া চলছে। গাঁয়ে ঢুকতেই শুনতে পাবেন যান।"

গাঁয়ে ঢুকতেই সত্যি সত্যি শুনতে পেলে শঙ্কর।

একটু এগিয়ে যেতে দেখতেও পেলে।

দেখলে, বিস্তর লোক। বিরাট শোভাযাত্রা। ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, শিঙে বাজছে, কাড়া, নাকাড়া, পালক-বসান জয়-ঢাক—কিছুই বাদ যায়নি। এমন-কি, কেনেস্তারা টিন পর্যন্ত গলায় ঝুলিয়ে বেমক্কা পিটিয়ে চলেছে কয়েকজন গ্রামের ছোকরা।

গ্রামের পথে পথে তারা নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে এসে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট একটি ইঁট বের-করা দোতলা বাড়ির সামনে।

শঙ্কর একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলে, ওই বাড়িটিই রাখহরি ঘোষালের বাড়ি।

লোকগুলো গাইছে, না ছাই করছে। বিশ্রী রকমের একটা বেসুরো কোলাহল উঠছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে শুধু একটা ছড়া। সবাই মিলে সমস্বরে বলছে—

"বোল্ হরি বোল্
রেখো খেলে ঝোল!
হেবে হল ভূট
এবার লেজ গুটিয়ে ছোট।

ব্যাটা তল্পি-তল্পা তোল
নয়ত ঢালব মাথায় ঘোল।
বোল্ হরি বোল্॥"

লোকজনের ভিড় ঠেলে শঙ্কর আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। দেখলে, একটা চেয়ারের দু দিকে দুটো লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে তার ওপর তারিণী মুখুজ্যেকে বসিয়ে কাঁধে নিয়ে নাচছে। তারিণীর গলায় ফুলের মালা।

তারিণী বললে, "এখানে কেন এলি?"

একজন বললে, "রাখহরি দেখুক।"

রাস্তার ধারের দোতলার ঘরটায় রাখহরি তামাক টানছিল গড়গড়ায়। বাইরের গোলমাল, ছড়া-কাটার চমৎকার ভাষা—সবই সে শুনতে পাচ্ছিল সেখান থেকে। গড়গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভিতর। জানলা দিয়ে দেখলে একবার ব্যাপারখানা।

"বাবা!"

ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকালে।

জয়া এসে দাঁড়িয়েছে। রাখহরির মেয়ে।

এইটিই তার একমাত্র মেয়ে। এই মেয়েটিই সম্বল। ছেলেপুলে নেই। কিন্তু এই এত বড মেয়ে—এখনও সিঁথিতে সিঁদুর পড়েনি কেন কে জানে। অথচ বাপের পয়সা আছে।

জয়া বেশ জোয়ান মেয়ে। দু-ভরি সোনার কম একগাছা চুড়ি হয় না—এমনি চওড়া তার হাতের কব্জি। চাঁপা চাঁপা গায়ের রঙ, চোখ দুটি সুন্দর, দাঁতগুলিও দেখতে বেশ, কিন্তু তবু যেন মনে হয় কেমন যেন মন্দ-মন্দ কাঠ-কাঠ। বিয়ে বোধ হয় সেইজন্যেই হয়নি—এমনও হতে পারে।

জয়া বললে, "বাবা, শুনছ? ওরা কীরকম ছড়া বেঁধেছে তোমার নামে?"

রাখহরি বললে, "শুনছি।"

জয়া বললে, "এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল বাবা। এখানে মানুষ থাকে? ছি!"

রাখহরি বললে, "বাপ-চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যাব? ওদের ভয়ে? ভজুকে ডেকে দে। আমি দেখছি।"

ভজু এ-বাড়ির একজন অনুগত ভৃত্য বললেও চলে, দারোয়ান বললেও ভুল হয় না। এই গ্রামেই বাড়ি। ডোমদের ছেলে। বিয়ে-থা করেনি। এই বাড়িতেই পড়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

রাখহরি বেরিয়ে গেল খোলা ছাতে। ছাতের ছোট আল্সের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, "এ-সব কী হচ্ছে তোমাদের? বুড়ো মিনষে তারিণী, তোমার লজ্জা করছে না?"

তারিণী তার আগেই মুখটাকে ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে।

রাখহরি আবার বললে, "বলি, থামাবে? তোমরা যাবে এখান থেকে?"

রাস্তা থেকে কে একজন বলে উঠল, "রাস্তাটা সরকারী রাস্তা। আমরা কেউ ত আপনার বাড়ির ভেতর ঢুকিনি।"

রাখহরি বললে, "তোমরা ঢোকনি, কিন্তু তোমাদের ওই আওয়াজটা ঢুকছে।"

একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কান বন্ধ করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "কান বন্ধ করুন!"

ওদিকে ঠিক সেই সময়েই রাখহরির পিছনে এসে দাঁড়াল ভজু। বললে, "ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ, নিয়ে আয় আমার বন্দুক। জয়ার কাছ থেকে দুটো টোটা চেয়ে আনবি।"

ভজু চলে গেল বন্দুক আনতে।

রাস্তার ওপর ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল কার্তিক। কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা। তারিণী মুখুজ্যের ছেলে। কাঁধে চামড়ার ফিতে দিয়ে ঝোলানো একটি কম-দামী ক্যামেরা আর হাতে একটি দোনলা বন্দুক।

কার্তিক বোধকরি শুনতে পেয়েছিল রাখহরির কথাটা। তাই সেও রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বললে, "বন্দুক আমাদেরও আছে।"

তারিণী তার চৌদলের উপর থেকে বলে উঠল, "কেতো! কী হচ্ছে?"

এই বলেই যারা তাকে কাঁধে তুলে নাচাচ্ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে বললে, "চল্ এখান থেকে। তোরা দেখছি ঝগড়া আরম্ভ করলি।"

বড় ছেলে মারা যাবার পর, এখন এই কার্তিকই তার প্রিয় পুত্র। বদরাগী ছেলে। বেশী বলবারও উপায় নেই।

এইতেই কার্তিক খেঁকিয়ে উঠল তার বাপকে। বললে, "তুমি চুপ কর বাবা।"

ওদিকে ভজু তখন রাখহরির দোনলা বন্দুকটা এনে তার হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরলে। রাখহরি বললে, "দে।"

বলে যেই বন্দুকটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, কার্তিক চেঁচিয়ে উঠল, "বন্দুকে হাত দেবেন না বলছি। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

রাখহরি বন্দুকে হাত দিতে গিয়েও দিলে না। বললে, "তাই বলে তোমরা এমনি করে আমাকে অপমান করবে?"

কার্তিক বললে, "ভোটের দিনে আপনার লোকজন বাবাকে কম অপমান করেনি।"

রাখহরি বললে, "ভোটের সময় ওরকম হয়েই থাকে।"

"এই যে, হওয়া বের করছি।"

কার্তিক তার বন্দুকটা তুলে ধরে ঘোড়ায় হাত দিলে। আর-একটু হলেই সে দিয়েছিল চালিয়ে, কিন্তু হঠাৎ একটা হাত এসে দিলে বন্দুকের নলটা ওপর দিকে তুলে! দড়াম্ করে আওয়াজ হয়ে গেল।

কার্তিক তাকিয়ে দেখলে, একটা অপরিচিত লোক তার বন্দুকের নলটা টেনে ধরে আছে। নলের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কার্তিক একটা হেঁচ্কা টান মেরে বললে, "ছেড়ে দাও।"

সবাই দেখলে ব্যাপারটা। আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান-বাজনা থেমে গিয়েছে। দলেব একটা লোক এগিয়ে এল শঙ্করের কাছে। বললে, "কে হে তুমি লাট সায়েব?"

অনেকেই তখন ঘিরে ধরেছে শঙ্করকে। কিন্তু শঙ্করের নজর কার্তিকের দিকে। বললে, "এখুনি কী হয়ে যেত বল দেখি?"

"কী আবার হত! ও মরে যেত।"

বলিহারী জবাব! মরে যাওয়াটা যেন কিছু নয় তার কাছে।

শঙ্কর বললে, "আর তুমি? তোমার কী হত?"

কার্তিক বললে, "কচু হত।"

"এই কেতো!"

তারিণীর গলার আওয়াজ!

কার্তিক তাকালে তার বাবার দিকে। শঙ্করও তাকালে।

তারিণী বললে, "কী ঝামেলা করছিস? চ। তুমি কে হে? রাখহরি আনিয়েছে বুঝি তোমাকে ভাড়া করে?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। আমাকে কেউ ভাড়া করে আনেনি। আমি নিজেই এসেছি।"

"কার বাড়ি এসেছ?"

"কারও বাড়ি আসিনি। এদিকে যাচ্ছিলাম, গোলমাল শুনে এখানে চলে এলাম।"

"বাড়ি কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "বাড়ি বলে কিছু নেই আমার। যেখানে থাকি সেখানেই আমার বাড়ি।"

কে একজন বলে উঠল, "তা আমাদের ব্যাপারে তুমি মাথা গলাচ্ছ কেন?"

শঙ্কব বললে, "আমার স্বভাব।"

তারিণীর দিকে তাকিয়ে একজন বললে, "আপনি ঠিক বলেছেন। এ-ব্যাটা রাখহরির ভাড়াটে গুণ্ডা না হয়ে যায় না।"

শঙ্কর বললে, "ভাল করে কথা বল। আমি গুণ্ডা নই।"

"না, গুণ্ডা নও?"

বলেই লোকটা এগিয়ে এসে ঠাস করে শঙ্করের গালে একটা চড় মেরে বসল।

ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল, "দে ব্যাটার মাথাটা দু ফাঁক করে।"

সত্যি-সত্যিই লাঠি উঁচিয়ে একটা লোক এগিয়ে এল শঙ্করের দিকে। কিন্তু চোখের নিমেষে লাঠিটা তার হাত থেকে ঝটকা মেরে সে-এক অদ্ভুত কৌশলে কেড়ে নিলে শঙ্কর। রাগে সে তখন ফুলছে। সেই লাঠিটাই শঙ্কর তার গায়ের ওপর বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আর-একজন লাঠিয়াল শঙ্করের মাথাটা লক্ষ্য করে চালালে এক লাঠি। শঙ্কব তাব হাতের লাঠিটা ঘুবিয়ে নিয়ে সেই লোকটার কব্জির ওপর সজোবে দিলে বসিয়ে। লাঠিটা তার হাত থেকে ছিটকে এসে পড়ল শঙ্করের পায়ের কাছে। পা দিয়ে লাঠিটা চেপে রেখে শঙ্কর বললে, "আর কে আছিস চলে আয়।"

লোকগুলো তখন সরে যেতে আরম্ভ করেছে। আগের লোকটা হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কার্তিকের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "চালাও না বন্দুকটা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? উঃ, কেনো যদি ফট করে আমার সামনে এসে না দাঁড়াত ত দিয়েছিলাম ব্যাটার মাথাটা ফাটিয়ে। উঃ! হাতটা ফুলে গেল। বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কী লাগাই বল দেখি?"

কথাগুলো কার্তিকের কানে ঢুকল বলে মনে হল না। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল শঙ্করেব দিকে।

"কেতো, বাড়ি চ!"

বাপের কথা শুনে কার্তিকের যেন সম্বিৎ ফিরে এল। বললে, "হ্যাঁ, সেই ভাল। চল।"

তাদের পিছু পিছু সবাই চলে গেল।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল একা।

এই তাবিণী মুখুজ্যেই তার কাকা। আব এই কার্তিক তার ভাই। জীবনে তাদের সে এই প্রথম দেখলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাদেরই কথা ভাবছিল। ভাবছিল, এবাব সে কোথায যাবে, কী কববে। এমন সময পিছন থেকে কে যেন তার পিঠে হাত দিতেই শঙ্কর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখলে, বাখহরি। বললে, "সাবাস!"

শঙ্কব বাখহরিব মুখের দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু করলে।

রাখহরি জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবে?"

শঙ্কর বললে, "যেখানে যাব ভেবে এসেছিলাম, এখন ভাবছি সেখানে আর যাব না।"

"কোথায় থাকবে?"

"একলা মানুষ, যেখানে হোক পড়ে থাকব।"

রাখহরি বললে, "তোমার আপত্তি যদি না থাকে, আমার বাড়িতেও থাকতে পার।"

শঙ্কর একটু হাসলে। বললে, "কতদিন রাখবেন?"

"যতদিন তোমার খুশি।"

শঙ্কর তখনও চুপ করে রয়েছে দেখে রাখহরি বললে, "কী ভাবছ? দু-দশটা লোককে খেতে দিতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের পুকুরের মাছ, ঘরের গাইয়ের দুধ আর চাষের চাল—খাও না কত খাবে। তোমরা শহরের মানুষ—এর মর্ম তোমরা বুঝবে না।"

"চলুন, থাকব আপনার বাড়িতে।"

সামনের দোতলায় ছোট্ট একখানি ঘর দেওয়া হয়েছে শঙ্করকে। রাখহরি বলেছে, "এখানে থাকতে হলে বাড়ির ছেলের মতই থাকতে হবে তোমাকে। আমার নিজের বলতে ওই একটামাত্র মেয়ে—জয়া। জয়ার মা নেই।"

জয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শঙ্করের। রাত্রে সে এই ঘরে তার খাবার নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে এসেছিল এই গ্রামের একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। সে নাকি এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করে।

পরের দিন সকালে রাখহরি এল তার খোঁজ-খবর নিতে।

"রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খাবার-দাবার কষ্ট হয়নি?"

"আজ্ঞে না। হবার জো নেই। আপনার মেয়েটি সে সব দিকে ওস্তাদ।"

রাখহরি একটু হাসলে। খুশীই হল কথাটা শুনে। বললে, "সংসারের সব-কিছু ওকেই ত দেখতে হয়। ওকে রেখে দিয়েছিলাম ওর মামার বাড়িতে বাঁকুড়ায়। এখানে না আছে একটা ইস্কুল, না আছে কিছু। একটামাত্র মেয়ে। এখানে থাকলে মুখ্খু হত। তা ভাগ্যিস বাঁকুড়ায় ছিল, তাই আই-এ পাশ করেছে।"

শুনে ত শঙ্করের চক্ষু ছানাবড়া! মেয়েটা আই-এ পাশ?

রাখহরি বললে, "আরও পড়াবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু ওর মা মরে গেল। বাধ্য হয়ে এখানে এনে রাখতে হল।"

এখনও ওর বিয়ে দেননি কেন?—কথাটা জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হল শঙ্করের। কিন্তু লজ্জায় পারলে না জিজ্ঞেস করতে। রাখহরিও কিছু বললে না।

এখন জয়ার কথা থাক, শঙ্করের সব চেয়ে বড় দরকার একবার শহরে গিয়ে নিজের কিছু জামাকাপড় কিনে আনার। কলকাতার বাড়িতে যৎসামান্য যা-কিছু ছিল, সব সে বিলিয়ে দিয়ে এসেছে বস্তির লোকজনকে।

"এখান থেকে শহর কতদূর?" জিজ্ঞেস করলে শঙ্কর।

রাখহরি বললে, "শহর এখান থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরে। কেন, যাবে নাকি?"

শঙ্কর বললে, "যেতে হবে।"

"কিন্তু তুমি শহুরে মানুষ, পায়ে হেঁটে পারবে যেতে?"

"কেন, ট্রেনে?"

"তার চেয়ে হেঁটে ভাল। এখান থেকে স্টেশন ত পাঁচ-ক্রোশ। তবে যেদিক দিয়েই যাও, আমাদের গ্রাম থেকে বেরিয়েই প্রায় দু-ক্রোশ জলা। এই রাস্তাটা পার হওয়া মুশকিল।"

শঙ্কর বললে, "আপনি ত এতদিন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ ছিলেন, এই রাস্তাটা তৈরি করতে পারেননি?"

রাখহরি বললে, "চেষ্টা করেছিলাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বলেছিল, আপনারা গ্রাম থেকে অর্ধেক দিন, বাকী টাকা আমরা দেব। ওই তারিণীশঙ্কর—এখন যে প্রেসিডেণ্ট হল—ওই চামারটাই দিলে সব মাটি করে।"

"শুনেছি ত ওঁর বেশ টাকাকড়ি আছে।"

"আছে মানে? বেশ ভাল টাকা আছে।"

রাখহরি বেশ ভাল করে চেপে বসল। বলল, "কথাটা উঠল যখন, তখন শোন। ওটা মানুষ নয়, ওটা চামার। ওর এক দাদা ছিল ভবানীশঙ্কর। বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি সে-ই সব করেছিল। লোকটা অকালে মরে গেল। বাস্, যেই মরা, তারিণীশঙ্কর লাগল তার বিধবা স্ত্রীর পেছনে। আর সে মেয়েটাও ছিল একটু বোকা, আর ভারি বদবাগী। দুজনেব ঝগড়া যেদিন খুব চরমে উঠল সেইদিন সে সব-কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। খুব খানিকটা শাপশাপান্ত করলে, বললে, 'ভগবান দেখবেন তোমাকে।' এই না বলে তার বাচ্চা ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল ভগবান জানেন। সেই যে গেল আর ফিরে এল না। তারিণীশঙ্করের ভালই হল। এইটিই সে চাচ্ছিল মনে-মনে। সেই যে একটা কথা আছে না—বাবা ম'লো ভালোই হল, দুটো হুকোই আমার হল। তারিণীর হল তাই। সেই থেকে বড় ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসিয়ে নিজেই সব ভোগ-দখল করছে।"

শঙ্কর বললে, "আচ্ছা, ওর সেই দাদার ছেলেটা যদি ফিরে আসে?"

রাখহরি বললে, "সে যে অনেক দিনের কথা। সে কি আর বেঁচে আছে ভেবেছ? বেঁচে থাকলে আসত না? নিশ্চয় আসত।"

শঙ্কর বললে, "ঠিক বলেছেন। সে বোধ হয় মরে গেছে।"

এমন সময় 'বাবু' 'বাবু' বলে কে একটা লোক বাইরে চীৎকার করছে মনে হল।

রাখহরি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বললে, "কি রে জিতু? ওপরে উঠে আয়।"

জিতু দোতলায় এসে খবর দিলে যে, গড়গড়ির মেলায় যে নাগরদোলাটা চলছিল তার একটা খাট্‌লা নাকি ভেঙে গিয়ে ওপর থেকে ছিট্‌কে একেবারে নীচে পড়ে গিয়েছে।

রাখহরি জিজ্ঞেস করলে, "কেউ মরেছে?"

জিতু বললে, "না মরেনি। তবে পট্‌লা ডোমের ছেলেটার ডান হাতটা বোধ হয় ভেঙে গেছে।"

কথাটা শুনে রাখহরি আশ্বস্ত হল।

"তাই বল! যেরকম করে এলি, আমি ত ভাবলাম কী না কী হযে গেছে। যা, আমাদের কথা হচ্ছিল, এ সময় বিরক্ত করিসনি, যা।"

জিতু চলে যাচ্ছিল, শঙ্কর বললে, "শোন!"

জিতু ফিরে দাঁড়াতেই, শঙ্কব জিজ্ঞেস কবলে, "হাতখানা কি তার ভেঙে গেছে?"

জিতু বললে, "ভাঙবে না? কতদূর থেকে পড়েছে? হাতখানা একেবাবে এমনি লডবড করছে।"

নিজের হাতটা নেড়ে কী রকম লড়বড় করছে জিতু দেখিয়ে দিলে।

ব্যাপারটা রাখহরির ভাল লাগছিল না। বললে, "কী বকবক করছিস? যা।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে, "না না, যেও না, দাঁড়াও।"

এই বলে সে রাখহরির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আপনাদের ডাক্তারখানাটা কোথায়?"

"কী হবে?"

শঙ্কর বললে, "লোকটাকে ডাক্তার দেখাবেন না?"

রাখহরি বললে, "ডাক্তার পাবে কোথায় যে দেখাবে?"

"গাঁয়ে ডাক্তার নেই?"

"না। ক্রোশ তিন-চার দূরে বাজিৎপুরে একটা খোঁড়া ডাক্তার আছে: রুগী মারবার যম।"

শঙ্কর বললে, "তা হলে কী হবে?"

"হবে আবার কী?" রাখহরি বললে, "দ্যাখোগে যাও এতক্ষণ হয়ত চুন-হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে। বাঁচে ত ওতেই বাঁচবে, যায় ত ওতেই যাবে। ডাক্তারে কি কিছু করতে পারে বাবা?"

শঙ্কর অবাক হয়ে গেল রাখহরির কথা শুনে।

"কী বলছেন আপনি? ডাক্তারে কিছু করতে পারে না?"

রাখহরি বেশ জোর দিয়েই বললে, "না। করনেওলা—"

বলেই চোখ দুটো বুজে হাতটা সে ঊর্ধ্বে কড়িকাঠের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

তারপর চোখ খুলে আবার সে বলতে লাগল, "তা হলে শোন বাবা, কথাটা যখন উঠল তখন বলি। গত বছর, ঠিক এমনি সময়ে তারিণীর বড় ছেলেটার হল কলেরা। ওই যে দেখলে বাঁদরটাকে ওইটেবই বড়। গাঁয়ে ডাক্তার নেই। শহরে যাবার ভাল রাস্তা নেই, এদিকে কাদা, ওদিকে কাদা, মাঝখানে ধানের ক্ষেত। একগাড়ি টাকা খরচ করে পালকিতে চড়িয়ে ডাক্তার ত আনলে। মস্ত বড় ডাক্তার। কিন্তু কী হল? পারলে বাঁচাতে?"

শঙ্কর বললে, "ডাক্তার আসতে দেরি হয়েছিল নিশ্চয়ই।"

"হবে না? দেরি হবে না? এই জলকাদা ভেঙে শহর থেকে ডাক্তার আসা কি চারটিখানি ব্যাপার? এ-গাঁয়ে ডাক্তাব আসা আর ভগবান আসা দুই-ই সমান। কিন্তু কী হল জান?"

শঙ্কর উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে, "কী হল?"

রাখহরি বললে, "তারিণীর টাকা খেয়ে অত বড় একটা শিক্ষিত ডাক্তার যাবার সময় আমার নামে বদনাম দিয়ে গেল।"

"বদনাম দিয়ে গেল? আপনাব নামে? আপনার সঙ্গে এর কী সম্বন্ধ?"

সম্বন্ধটা যে কী শঙ্কর তা সত্যিই বুঝতে পারছিল না। রাখহরি বুঝিয়ে দিলে। বললে, "সম্বন্ধ ওই মেলা। গড়গড়ির মেলাটা যে আমার। আর ওই মেলার জন্যেই, ডাক্তার বললে—কলেরা। তারিণী ঠিক তাই বিশ্বাস করে বসল। আবার আমার মেলা যে!"

এই বলে রাখহরি পরম বিজ্ঞ একজন দার্শনিকের মত গম্ভীর গলায় বললে, "মেলাও প্রতি বছর হয়, কলেবাও হয়. কিন্তু কই গ্রামের সবাই ত মরে না! যে মরবার সে মরে। এই ত এ-বছরও হয়েছে। মেলাও হয়েছে. কলেরাও হয়েছে। যাদের পরমায়ু নেই তারা মরছে।"

ঠিক সময়ে ডাক্তার ডাকতে পারলে কলেরায় যে মানুষ মরে না—শঙ্করের ছিল এই বিশ্বাস। মৃত্যু সম্বন্ধে রাখহরির এই ঔদাসীন্য দেখে শঙ্কর একটু বিস্মিত হল। বললে, "না না, এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু করা উচিত।"

"কী করবে? মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে? পারবে? কখ্‌খনো পারবে না। পরমায়ু যাদের নেই তারা পটাপট মরবে। কলেরায় না মরুক, শুকনো ডাঙায়

হোঁচট খেয়ে মরবে। এই যে তুমি—শহর থেকে এসেছ, লেখাপড়া-জানা একটা শিক্ষিত ছেলে—তুমিও কী বলবে, কলেরার জন্যে আমার ওই মেলাটা দায়ী? কখ্খনো না। চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে, সাধ্য কি যে কলেরা সেখানে প্রবেশ করে। এটা হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের লোকের কথা। কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না।"

শঙ্কর বললে, "আপনার এই মেলাটি আমি দেখব।"

"বেশ ত। যাও দেখে এস। এই যে তুমি শহরে যাবে বলছিলে, যাবার দরকার হবে না। আমার মেলায় সব আছে। খুব জমাটি মেলা।"

এই বলে জিতুকে ডেকে বলে দিলে, "বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

পথে যেতে যেতে অনেক কথাই জেনে নিলে শঙ্কর। গড়গড়ির মেলা নাকি এ-অঞ্চলে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মেলা। বহু দূরের গ্রাম থেকে লোকজন এই মেলায় আসে জিনিসপত্র কিনতে। শহরে যাবার প্রয়োজন হয় না।

শঙ্কর দেখলে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে মেলা বসেছে। সত্যিই মেলাটা খুব বড়।

একদিকে সরু একফালি মরা নদী, আর একদিকে সারি সারি আখের ক্ষেত। জায়গাটা বেশ উঁচু, কাজেই জল-কাদার বালাই সেখানে নেই।

তবে কোনও শ্রীও নেই, কোন শৃঙ্খলাও নেই। স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। যে যেখানে পেরেছে বসে গিয়েছে।

মেলায় ঢুকে শঙ্কর প্রথমেই জানতে চাইলে—নাগরদোলাটা কোথায়?

জিতু ভেবেছিল, শঙ্কর শহরের মানুষ, "নাগরদোলায় কখনও চড়েনি তাই বোধ হয় চড়তে চায়। পুব দিকে তাকিয়ে বললে, "নাগরদোলায় আজ আর চড়তে পারবেন না বাবু, এখনও মেরামত হয়নি। ওই দেখুন চলছে না।"

শঙ্কর বললে, "না না, নাগরদোলায় চাপবার শখ আমার নেই। যে-লোকটার হাত ভেঙে গেছে আমি শুধু সেই লোকটাকে দেখতে চাই।"

জিতু বললে, "সে এখনও এখানে আছে বুঝি? বাড়ি চলে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "চল তার বাড়িতেই যাব।"

জিতু বললে, "বাবুর বন্ধুলোক আপনি, এই জল-কাদায় আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই, তারপর বাবুর মার খাই আর-কি!"

"না না, মার খাবে না, চল।"

জিতু বললে, "আপনি নতুন এসেছেন, চেনেন না আমাদের বাবুকে। বেকায়দা হয়েছে কি চট্ করে হাত চালিয়ে দেবে। তার চেয়ে আপনি ততক্ষণ মেলা দেখুন, আমি চট্ করে খবর নিয়ে আসছি।"

হাঁ-হাঁ করে নিষেধ করতে করতে জিতু ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমন সময় একটা লোকের কান্নার আওয়াজ শুনে শঙ্কর তাকিয়ে দেখলে, চাষী-গোছের একজন ছেলেমানুষের মত হো-হো করে কাঁদছে।

"কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?"

লোকটা বললে, "হেরে গেলাম বাবু, একদম হেরে গেলাম। ধান-বেচা টাকা নিয়ে মেয়েছেলের কাপড় কিনতে এসেছিলাম বাবু।"

"কিসে হেরে গেলে?"

লোকটা বললে, "খেলায়। ওই যে খেলা হচ্ছে ওইখানে। ওই খেলায়।"

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা ছক পেতে জুয়াখেলা চলছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, জুয়া যারা খেলছে তাদের ভিতর বেশ জেঁকে বসে আছে তারিণীশঙ্করের ছেলে কার্তিক।

কার্তিক শুধু বসে বসে দেখছে না, জুয়া সেও খেলছে।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। সে তার পকেট থেকে টাকা বের করে ছকের ওপর ধরলে। ঘুঁটি পড়ে গেল তারই ঘরে। যে-টাকা ধরেছিল তার দ্বিগুণ টাকা সে ফেরত পেলে। তার দেখা-দেখি তারই ঘরে অন্যান্য সবাই টাকা ধরতে লাগল।

শঙ্কর দেখলে, কার্তিক যেন লোভ দেখিয়ে আর-সকলকে খেলতে বাধ্য করছে। শেষে ইচ্ছে করে হেরে যাচ্ছে নিজে। তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হারছে।

এ-বিদ্যেটা শঙ্কর জানে। বুঝতে তার বাকী রইল না যে এই জুয়ার আড্ডায় কার্তিকের স্বার্থ আছে ষোল আনা। নইলে সে এরকমভাবে খেলবে কেন? ওইটুকু সময়ের ভিতর শঙ্কর দেখলে, কার্তিক জিতল মাত্র দশ টাকা আর হারল প্রায় তিনশ টাকা। আর এই তিনশ টাকার সঙ্গে জুয়া যারা খেলছিল তাদেরও প্রায় শ' দুই টাকা জুয়াড়ীর থলেতে ঢুকিয়ে দিলে।

একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এই জুয়ার আড্ডায় এসে ডাকলে, "দাদা!"

দাদা তার বোধ হয় জুয়া খেলছিল। বললে, "কী বলছিস?"

"শীগ্‌গির এস। পিসি কেমন করছে দেখবে এস।"

দাদা বললে, "দেখতে হবে কেন, নিঘ্‌ঘাৎ কলেরা। আমি গিয়ে কী করব?"

ছকে সে তখন একটা আধুলি ধরে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছে। অন্য দিকে মন দেবার সময় তার নেই।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, "যাবে না দাদা? সারাদিন শুধু জুয়াই খেলবে?"

দাদা এমনভাবে মুখটাকে তার খিঁচিয়ে উঠল যে, মেয়েটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে, "তোদের পাড়ায় ক'জন ম'লো রে?"

"কাল থেকে চারজন মরেছে।"

"সারা গাঁয়ে তা হলে ক'জন হল?"

একজন বললে, "বারোজন।"

আর-একজন তাদের থামিয়ে দিলে। বললে, "থাম বাবা, থাম। মনের আনন্দে আমরা একটু খেলা করছি, এ সময় কলেরার কথাটা মনে করিয়ে দিস না।"

শঙ্কর সেখান থেকে সরে গেল। —একটা গ্রামে বারোজন লোক মরল কলেরায়! গ্রামে ডাক্তার নেই, শহর থেকে ডাক্তার আসবার পথ নেই। মরবার আগে এই লোকগুলির মুখে একফোঁটা ওষুধ পড়েনি। নিতান্ত অসহায়ের মত শুধু দৈবের ওপর নির্ভর করে তারা ছটফট করে মরেছে। আশাহীন সান্ত্বনাহীন যারা বেঁচে আছে, তারাই বা কী সুখে বেঁচে আছে কে জানে।

শঙ্কর গ্রামের দিকে যাচ্ছিল।

ওদিকে তখন জিতু আসছে পটলার খবর নিয়ে। ডাকলে, "বাবু! বাবু!"

শঙ্কর থমকে থামল।

জিতু বললে, "ছোঁড়া এখনও বেঁচে আছে বাবু।"

বাস্, আর-কিছু শোনবার দরকার নেই।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজের আস্তানায়। প্রয়োজন ছিল রাখহরির সঙ্গে। জয়া বললে, তার বাবা নাকি দূরের কোন একটা গ্রামে গেছে বিশেষ দরকারে, ফিরতে রাত হবে।

আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল শঙ্কর। জয়া তাদের সেই রাঁধুনী-ছোকরাটিকে বললে, "বাবুকে খেয়ে যেতে বল। বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

তারপর বোধ করি শঙ্করকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটু জোরে জোরেই বললে, "সময়ে না-খেলে অমনি কুঁদো বাঘের মত শরীরটা থাকে কেমন করে কে জানে!"

শঙ্কর একটু হেসে বললে, "খাবার দিতে বল।"

"স্নানও নেই, কিছু নেই, কোথাকার ম্লেচ্ছ রে বাবা।"

শঙ্কর খেয়ে-দেয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

সোজা চলে গেল রাখহরির গড়গড়ির মেলায়।

সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে যখন সে ফিরে এল, দেখা গেল, তার হাতে একটা টিনের সুটকেস। কয়েকটা জামাকাপড়, গামছা, সাবান কিনে এনেছে সে। এসেই ডাকলে, "ভজু!"

একটা ছেলে এসে জানালে, "ভজু বাবুর সঙ্গে গিয়েছে। এখনও ফেরেনি।"

শঙ্কর বলল, "তুই একটা কাজ করতে পারিস বাবা! এক বাটি সরষের তেল আনতে পারিস?"

"এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।" বলে তক্ষুনি সে এক বাটি তেল এনে নামিয়ে দিলে শঙ্করের হাতের কাছে। তেল মেখে গামছা আর সাবান নিয়ে শঙ্কর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ঘাট-বাঁধান পুকুর একটা ছিল বাড়ির পাশেই: সেই পুকুরে স্নান করে, সাঁতার কেটে যখন সে তার দোতলার ঘরটিতে ফিরে এল, দেখলে চারদিক তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে সারা গ্রামে।

নতুন কিনে-আনা কোরা ধুতিটা পরে ভিজে কাপড়টা বাইরের রেলিংয়ে শুকতে দিয়ে শঙ্কর ঘরে ঢুকতেই দেখলে, লণ্ঠন হাতে নিয়ে জয়া দাঁড়িয়ে।

"ওবেলা আমার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন তা হলে।"

শঙ্কর বললে, "শুনিয়ে শুনিয়ে বললে শুনতে হয় বৈকি!"

জয়া বললে, "তাই বলে সন্ধ্যেবেলায় ওই পুকুরটায় স্নান করতে ত কেউ বলেনি।"

"সকালবেলা স্নান করব কেমন করে? কাপড়-গামছা কিছুই ছিল না যে!"

এতক্ষণে তার পরনের কোরা কাপড়টার দিকে জয়ার নজর পড়ল। বললে, "তা জানতাম না। শ্লেচ্ছটেচ্ছ অনেক-কিছু বলেছি, কিছু মনে করবেন না। অন্ধকার বারান্দায় বুঝি ভিজে কাপড়টা মেলে এলেন?"

"হ্যাঁ। আলো কোথায় পাব?"

জয়া বললে, "চাইলেই পাওয়া যায়।"

"তাই ভাবছিলাম।" বলেই শঙ্কর ভিজে গামছাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গেঞ্জিটা গায়ে দিচ্ছিল। জয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার সেই অনাবৃত সুন্দর সুগঠিত দেহের দিকে। গেঞ্জিটা পরেই শঙ্কর চট্ করে একবার মুখ তুলে তাকালে। চোখে চোখে চোখ পড়ে গেল। লজ্জাটা কাটাবার জন্যই বোধ করি জয়া তার আগের কথার জের টেনে বললে, "কী ভাবছিলেন? লণ্ঠনটা কার কাছে চাইবেন?"

শঙ্কর বললে, "হ্যাঁ।"

বলেই সে বসল তার খাটের ওপর। জয়া তার হাত থেকে লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানলার একটা শিক ধরে। ঠিক এমনি করে আর-একজন একদিন দাঁড়িয়ে ছিল। চট্ করে কালীঘাটের সেই বাড়িটার কথা শঙ্করের মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল ঝিলপাড়ার সেই অবিস্মরণীয় রাত্রির কথা। সারাটা রাত কাটিয়েছিল তারা একই শয্যায়—সদ্য-বিবাহিত স্বামী আর স্ত্রী। মাঝখানে কী যে সব হয়ে গেল, সেই স্ত্রীই বললে, "থাক, আর স্বামীর পরিচয় তোমাকে দিতে হবে না।"

দুজনের দাঁড়াবার ভঙ্গিটুকু এক। জয়ার চেয়ে সে বয়সে ছোট। জয়ার চেয়ে সে অনেক অনেক বেশী সুন্দরী।

যাক, তার সম্বন্ধে ভেবে কিছু লাভ নেই। ইন্দ্রাণীর স্মৃতি মন থেকে

মুছে ফেলাই উচিত। শঙ্কর জয়ার দিকে তাকালে। বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে বোস।"

জয়া কিন্তু বসলে না। বললে, "কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা আপনাকে বলি।"

শঙ্কর বললে, "বল।"

জয়া মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললে, "শুনেছিলাম, শরীরটা যাদের যত বেশী শক্ত, বুদ্ধিটা তাদের তত বেশী মোটা।"

"ও হ্যাঁ, শরীরটা যাদের যত বেশী—কী বললে? কার কথা বলছ?"

জয়া হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, "কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছেন?"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি। আমার কথা বলছ।"

তেমনি হাসতে হাসতে জয়া বললে, "হ্যাঁ।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েদের হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারি না। কী তুমি বলতে চাও ভাল করে বল।"

জয়া জিজ্ঞেস করলে, "আপনি বিয়ে করেছেন?"

"কী হবে তোমার সেকথা জেনে?"

"বাঃ রে, জানতে ইচ্ছে করে না?"

শঙ্কর বললে, "যদি বলি বিয়ে আমি এখনও করিনি!"

"বাস্ তা হলে আর করবেন না।"

"কেন?"

জয়া সে-এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললে, "না বাবা, বলব না, রাগ করবেন।"

শঙ্কর বললে, "না, তুমি বল। আমি রাগ করব না।"

"না, করবেন না? আপনার রাগ আমি দেখেছি। লাঠি মেরে একটা লোকের হাত ভেঙে দিয়েছেন আপনি।"

"সে যে আমার মাথা ভাঙতে এসেছিল।"

"হ্যাঁ, আপনার মাথা ভাঙা এত সহজ কি-না?"

শঙ্কর বললে, "ও-সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি আমাকে বিয়ে করতে কেন বারণ করলে তাই বল।"

জয়া বললে, "বাব্বাঃ, যেরকম কাঠ-কাঠ কথা আপনার, কোনও মেয়ে থাকতে পারবে না আপনার কাছে। পালাবে।"

শঙ্কর চমকে উঠল জয়ার কথা শুনে। বললে, "তুমি জানলে কেমন করে?"

জয়া বললে, "আমিও ত একটা মেয়েমানুষ।"

শঙ্কর বললে, "ভুল বলছ তুমি। মেয়েরা আমাকে ভালবাসে। আমি জানি।"

"জানলেন কেমন করে? বিয়ে ত করেননি।"

শঙ্কর আর বেশীদূর এগোতে চাইলে না। বললে, "পরে বলব। এখন তুমি আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াও দেখি!"

"চা খাবেন আপনি?" জয়া বললে, "তবে যে শুনলাম চা আপনি খান না!"

শঙ্কর বললে, "ভালবেসে এক-আধ পেয়ালা কেউ যদি দেয় ত খাই।"

"দিচ্ছি।" বলে সে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "ভালবাসা অত সস্তা নয়।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "মুড়ি আছে বাড়িতে?"

জয়া বললে, "নিশ্চয়ই আছে। খাবেন?"

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গেল।

শঙ্করের ঘুম যখন ভাঙল, রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। সারা গ্রাম তখনও ঘুমুচ্ছে।

শঙ্কর তার কাপড়-গামছা নিয়ে পুকুরের বাঁধান ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। হাত-মুখ ধুয়ে সূর্যপ্রণাম করে প্রথমে শরীবটাকে বেশ ভাল করে গরম করে নিলে। সূর্যপ্রণাম এক অভিনব পদ্ধতির ব্যায়াম। শঙ্কর তার ক্লাবের ছেলেদেব খালি হাতে ব্যায়ামের এই পদ্ধতিটাই প্রথম শেখাত।

তারপব পুকুবে স্নান করে যখন সে উঠল, দেখলে—পুবেব আকাশ রাঙা কবে সূর্য উঠছে। স্নিগ্ধ সুন্দব হাওয়া বইছে। চাবদিকে বিচিত্রপূর্ণ ঘন সবুজেব সমারোহ। পল্লীপ্রান্তের এই মনোরম পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শঙ্কর তার মনেব মধ্যে কেমন যেন একটা অপরূপ আনন্দের বিচিত্র আস্বাদ অনুভব কবলে। সর্বাঙ্গ তার বোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চোখ দুটো অকারণে জলে ভরে এল।

শুধুই ভাব মনে হতে লাগল, এই উদার উন্মুক্ত বহিঃপ্রকৃতির মাঝখানে বাস করে এখানকার মানুষগুলি এত সঙ্কীর্ণ কেন? মানুষে মানুষে কেন এত হিংসা, কেন এত বিদ্বেষ? স্বার্থ-কলুষিত জঘন্য এক বিষাক্ত পরিবেশ, চারিদিকে শুধু দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক আব মহামারী!

বাড়িতে যখন ফিরে এল শঙ্কর, সবাই তখন জেগে উঠেছে।

রাখহরি কাল যেখানে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরতে তার অনেক রাত্রি হয়েছে। ছোট যে ছেলেটা কাল থেকে চাকরের কাজ করছে, তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললে, "বাবু এখনও ঘুমুচ্ছেন।" শঙ্করের হাত থেকে ভিজে কাপড়টা কেড়ে নিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে মেলতে মেলতে ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে, "চা খাবেন বাবু?"

"চা এত সকালে কোথায় পাবি?"

ছেলেটা ফিক করে হাসলে। বললে, "দেখুন না, আমি এনে দিচ্ছি।" বলেই সে শঙ্করের কাছে এগিয়ে এল। বললে, "দিদিমণি কি এখন উঠেছে? রাত থাকতে উঠে আমাকে তুলে দিয়ে বলেছে—উনুনে আগুন দে। চা এতক্ষণ হয়ে গেছে।"

"না, চা এখনও হয়নি।"

ছেলেটাও ফিরে তাকালে। শঙ্করও তাকাল। দেখলে, সিঁড়ি দিয়ে জয়া উঠে আসছে। তার হাতে একটা কাচের প্লাস। প্লাসের ওপর একটা বাটি বসানো। সোজা সে শঙ্করের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর প্লাস আর বাটিটা নামিয়ে দিয়ে বললে, "পশ্চিমা দারোয়ানের মত 'ওঠ-বোস' করে এসে চা খেতে হয় না। এইটে খেয়ে নিন।"

শঙ্কর দেখলে, বাটিতে কতকগুলো ভিজে ছোলা, আদা আর নুন। কাচের প্লাসে বোধ হয় শরবত। অবাক হয়ে তাকালে জয়ার মুখের দিকে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। সকালে উঠেই বোধ করি কুয়োর জলে স্নান করেছে। আঁটসাঁট করে রঙিন একখানি শাড়ি পরেছে। আগুনের মত লাল টকটক করছে জামার রঙ। আর ভিজে একপিঠ কালো চুল পিঠের ওপর এলানো।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "তুমি এসব জানলে কেমন করে?"

"দেখলাম যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমার ঘরের জানলা দিয়ে সবই ত দেখা যায়।"

জয়া বললে, "আমাদের বাড়িতে একজন দারোয়ান ছিল, সে ওই চাঁপা-গাছটার তলায় খানিকটা গর্ত খুঁড়েছিল। ভজুয়াকে নিয়ে ওখানে সে কুস্তি করত আর সারা গায়ে মাটি মেখে—মোষের মতন—"

এই বলে এমন হাসি হাসতে লাগল যে, হাসির ধমকে কথাটা আর শেষ করতে পারলে না।

হাসির বেগ খানিকটা থামিয়ে বললে, "না বাবা, বলব না, রাগ করবেন।— আমি থাকলে আপনি খাবেন না দেখছি, আমি পালালাম।"

যেতে যেতেও জয়া দোরের কাছে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "বাবা উঠলে চা পাঠিয়ে দেব।"

রাখহরির উঠতে সেদিন বেশ দেরি হল। শঙ্করের ভিজে কাপড়টা তখন শুকিয়ে গিয়েছে। শুকনো কাপড়টা তুলে নিয়ে শঙ্কর তার ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াতেই মনে হল, কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। কোন্ এক মায়ের বুকফাটা কান্না। ছেলে মারা গিয়েছে। মনটা উদাস হয়ে গেল শঙ্করের। জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢ্কল রাখহরি।
"কীরকম? কোনও কণ্ট হয়নি ত?"
শঙ্কর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ্ঞে না।"
রাখহরি বসল খাটের ওপর। বললে, "কাল ফিরতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। তিনটে লোকের কাছে টাকা পেতাম, তাও সব আদায় হল না।"
শঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। রাখহরি বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।"
হাতের কাপড়টা পাশে নামিয়ে রেখে শঙ্কর বসল।
"ম্খখানা তোমার ভারি-ভারি মনে হচ্ছে। কী ভাবছ?"
শঙ্কর বললে, "কান্নার আওয়াজ শ্নতে পাচ্ছেন?"
রাখহরি বললে, "এটা ত তোমাদের শহর নয়, গ্রাম। এখানে এক মাইল দ্রেব কান্না এখান থেকে শ্নতে পাবে। এরকম কান্না আমরা রোজই শ্নি।"
শঙ্কর বললে, "রোজ রোজ এ-কান্না বোধ হয় বেড়েই যাবে।"
রাখহরি বললে, "বাড়্কগে। এ-শোনা আমাদের অভ্যেস আছে। কাল আমার মেলাটা কেমন দেখলে তাই বল।"
"ভাল।"
রাখহরি খ্শী হল কথাটা শ্নে। বললে, "এরকম মেলা এ-অঞ্চলে কোথাও হয় না। ছোট ছেলেটি পর্যন্ত জানে, গড়্গড়ির মেলার কথা।"
শঙ্কর বললে, "মেলাটা তুলে দিন।"
রাখহরি তার ম্খেব দিকে তাকালে। "কী বললে? মেলাটা তুলে দেব?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ, তুলে দেবেন। আপনার এই মেলার জন্যেই গাঁয়ে কলেরা হচ্ছে।"
রাখহরি সে-কথা সহ্য করতে পারলে না। বললে, "ব্ঝেছি। তারিণীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। হ্ঁ, ঠিক। তারিণীই তোমাকে শিখিয়েছে এই কথা।"
শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। কাবও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কেউ আমাকে কিছ্ শেখায়নি। ভাল চান ত মেলাটা তুলে দিন।"
"তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?"
"আজ্ঞে না। ও কী কথা বলছেন? তাই কখনও পারি?"
রাখহরি বললে, "মেলাটা তুলে দেওয়া অমনি ম্খের কথা? ওই মেলা থেকে আমার ইনকাম চারটি হাজার টাকা। গেল-বছর পেয়েছিলাম পাঁচ হাজার টাকা। এটা আর তারিণীর সহ্য হচ্ছে না।"

শঙ্কর বললে, "মেলা তা হলে আপনি তুলবেন না?"

রাখহরি বললে, "না। তারিণী তোমাকে বিগড়ে দিয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি।"

এই বলে রাখহরি উঠে দাঁড়াল। বললে, "খুব লোককে আমি বাড়িতে জায়গা দিয়েছি! আমারই খাবে, আর আমারই সর্বনাশ করবে? অত কাঁচা ছেলে আমি নই। তুমি আপনার পথ দেখ।"

রাখহরি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাশের ঘর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ওরে কে আছিস? তামাক দিয়ে যা।"

কারও কোন সাড়া না পেয়ে রাখহরি আবার চেঁচিয়ে উঠল, "কোথায় সব, মরেছে নাকি?"

জয়া চা পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটা থালার ওপর বসিয়ে দু-পেযালা চা আর দুটো বাটিতে ঘি দিয়ে ভাজা চিঁড়ে আর নারকেলের কুচি। উপরে লঙ্কা আর চিনি ছড়ানো। খুব যত্ন করে তৈরি করেছিল জয়া।

ছেলেটা ফিরে এল একটা কাপ আর একটা বাটি ফিরিয়ে নিয়ে। জয়া জিজ্ঞেস করলে, "ও কী রে, ফিরিয়ে আনলি কেন? শঙ্করবাবু খেলে না?"

"শঙ্করবাবু নেই ত ওখানে।"

জয়া বললে, "যাঃ, বাবার ঘরে দেখেছিস?"

"বাবু ত একাই বসে রয়েছেন।"

"ওদিকের বাবান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, তুই দেখতে পাসনি।"

এই বলে জয়া নিজেই ছুটল। ছেলেটাকে বললে, "ও-দুটো তুই নিয়ে আয়।"

জয়া একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়াল তাদের বার-বাড়ির দোতলায়। শঙ্করের ঘরে গিয়ে সত্যিই দেখলে, শঙ্কর নেই। বাইরেব বারান্দায় দেখলে, সেখানেও নেই। তখন নজর পড়ল, ঘরের কোণের দিকে—নতুন কিনে-আনা টিনের সুটকেসটিও নেই।

জয়া পাশেব ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলে, খুব আরাম কবে নারকেল-চিঁড়ে চিবুচ্ছে তার বাবা। বললে, "এগুলো ভারি সুন্দর হয়েছে ত! কই, এ-রকম ত কোনদিন করিস না?"

জয়া খুশী হল কথাটা শুনে। বললে, "ভাল হয়েছে? রোজই করে দেব।" বলেই একটু থেমে জয়া জিজ্ঞেস করলে, "শঙ্করবাবু কোথায় গেলেন বাবা?"

"চলে গেছে নাকি?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ। জিনিসপত্র কিচ্ছু নেই।"

রাখহরি বললে, "জিনিসপত্র ছিল নাকি কিছু?"

"মেলা থেকে কাপড়-জামা কিনে এনেছিল যে!"

রাখহরি জিজ্ঞেস করলে, "কিচ্ছু নেই?"

"না। কিচ্ছু নেই।"

"বেশ হয়েছে। যাকগে, মরুকগে। হতভাগা বলে কিনা—গড়গড়ির মেলাটা আপনি তুলে দেবেন কিনা বলুন। আমার ওপর জুলুম!"

জয়া বললে, "তা হলে তুমি কিছু বলেছ?"

"বলব না? কালকেই বাড়ি ছিলাম না, আর কালকেই ও তারিণীর দলে গিয়ে ভিড়েছে। আমার মেলাটি তুলে দিতে না পারলে তারিণীর ঘুম হচ্ছে না।"

জয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

রাখহরি বললে, "তাই বলবার মধ্যে বলেছি—তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, আমারই খাবে আবার আমারই শত্রুতা করবে? তার চেযে কাজ নেই বাবা, তুমি আপনার পথ দেখ।"

জয়া আর কথা না বলে থাকতে পারল না। বললে, "তা হলে তুমিই তাড়িয়েছ।"

"হ্যাঁ, তাড়িয়েছি।"

বলে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চা খেতে খেতে রাখহরি বললে, "নইলে আমার বাড়িতে বসে কোনদিন আমার কী সর্বনাশ করে বসত বাবা, তার চেয়ে গিয়েছে ভালই হয়েছে।"

কথাটার কী যে ইঙ্গিত কে জানে। জয়ার পায়ের নীচের মাটিটা যেন সরে যেতে লাগল।

শঙ্কর সত্যি সত্যিই তারিণীশঙ্করের বাড়ি গিয়ে হাজির।

তারিণীশঙ্কর মন দিয়ে সব কথা শুনলে শঙ্করের। তারপর বললে, "বা বা বা, রাখহরি আচ্ছা চাল চেলেছে ত! তোমার কথা শুনে আমি আমার লোকজন দিয়ে মেলাটি ভেঙে দিই, আর রাখহরি আমার নামে মামলা করুক। তুমি ওখানে থাক, ওখানে খাও, তুমি যে রাখহরির লোক সেকথা আমি জানি। আমি অত কাঁচা ছেলে নই।"

শঙ্কর বললে, "তাহলে আপনি লোক দিয়ে সাহায্য করবেন না আমাকে?"

তারিণীশঙ্কর বললে, "না বাপু, আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। নইলে রাখহরির মেলা ত আমি ভেঙে দিতেই চাই।"

তারিণীশঙ্করের সঙ্গে একজন সহচর প্রায় সব সময়েই থাকে। এই সহচরটির নাম নবদ্বীপ। জাতিতে ব্রাহ্মণ। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

অস্থিচর্মসার একটি কঙ্কাল বললেই হয়। আগেকার দিনে রাজরাজড়াদের সঙ্গে একজন বিদূষক থাকত। নবদ্বীপও সেই জাতীয়।

নবদ্বীপ বলে উঠল, "এই ত কথার মত কথা! দাও ভেঙে। রাখহরি ঠেলাটি বুঝুক। তাছাড়া এ-বছর ত তুমি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "না রে না, তুই থাম্।"

এই বলে তাকে সে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

নবদ্বীপ কিন্তু অত সহজে থামবার লোক নয়। বললে, "থামলাম। কিন্তু এই যে কলেরার ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছে চব্বিশ ঘণ্টা, উনি বলছেন—মেলাটি ভেঙে দিন, কলেরা থেমে যাবে। সেকথাটাও ত তোমার শোনা উচিত।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "জানি। আবার এও ত জানি—জোর করে মেলা ভাঙা বেআইনী কাজ।"

এইবার নবদ্বীপ বলবার মত কথা খুঁজে পেল। বললে, "মেলা ত তুমি ভাঙবে না, ভাঙব আমি। তুমি তোমার লোকজনকে বলে দাও। বাস্, মামলা করে আমার নামে করবে।"

—"তুই বলছিস এই কথা? সে-সময় সবে পড়বি না ত?"

—"সরে কখনও পড়েছি?" নবদ্বীপ বললে, "নিশ্চয়ই বলছি। আমি বলছি, এই যে ইনি বলছেন।"

বলেই সে শঙ্করকে দেখিয়ে দিলে।

শঙ্কর যদিও সেদিন তারিণীশঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তবু তার বীরত্বে সেদিন সে মুগ্ধ হয়েছিল বৈকি! চেয়ারে বসে বসে সবই সে দেখছিল। শঙ্কর অন্যায় কিছু করেনি। প্রিয়দর্শন শক্তিমান এই ছোকরাটিকে যদি সে নিজের দলে টেনে নিতে পারে ত মন্দ হয় না। তাছাড়া কার্তিকটা যেরকম উদ্ধত হয়ে উঠছে দিন-দিন, তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে এইরকম একটি মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

শঙ্করের আপাদমস্তক তারিণীশঙ্কর আর-একবার দেখে নিল। বললে, "রাখহরির মেলা তুমি যদি আজ ভেঙে দাও, রাখহরি তোমাকে নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবে, সে-কথা ভেবে দেখেছ?"

শঙ্কর মুখ টিপে একটু হাসলে। বললে, "তাড়িয়ে দেবে নয়, তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি লুকিয়ে কোন কাজ করতে চাই না। মেলা ভাঙার কথা তাঁকে আমি বলেছি। বলবামাত্র তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই দেখুন।"

বলে সে তার টিনের ছোট সুটকেসটি দেখিয়ে দিলে।

তারিণীশঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "এখন তাহলে তুমি থাকবে কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "যেখানে একটুখানি আশ্রয় পাব সেখানেই থাকব, নয় ত চলে যাব।"

কথাটা শুনে তারিণীশঙ্কর উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "আমার একটা একতলা ভারি সুন্দর বাড়ি খালি পড়ে আছে। কার্তিকটা মাঝে মাঝে ওখানে আড্ডা মারে। আমার এক দাদা ছিলেন, মারা গেছেন, সেই তিনি তৈরি করেছিলেন ওটা। সুন্দর বাগান ছিল ওখানে, এখন আর কিছু নেই। ওটার নাম তাই বাগানবাড়ি। সেই বাগানবাড়িতে ইচ্ছে করলে তুমি থাকতে পার। খাবারটা এখান থেকেই যাবে।"

নবদ্বীপ লাফিয়ে উঠল—"দাও বাগানবাড়ির চাবিটা। আমি ওকে ওখানে পুরে দিয়ে আসি। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে লোকজন নিয়ে গিয়ে—বাস্, রাখহরির মেলার গুষ্টিব তুষ্টি করে দিয়ে আসব।"

ড্রয়ার থেকে চাবিটা বের করে নবদ্বীপের হাতে দিয়ে তারিণীশঙ্কর বললে, "কার্তিককে জানিয়ে দিস খবরটা।"

"দেব।" বলে শঙ্করকে নিয়ে নবদ্বীপ চলে গেল বাগানবাড়িতে।

কার্তিক কোথায় যেন গিয়েছিল তার ক্যামেরা নিবে ছবি তুলতে। বাড়ি ফিরেই শুনলে, রাখহরির মেলাটাকে ভেঙে দেবাব হুকুম দিযেছে তার বাবা। আর হুকুম দিয়েছে সেই লোকটাকে যে-লোকটা রাখহরির গুপ্তচর।

ক্যামেবাটা ছুঁড়ে ফেলে দিযে বন্দুক নিয়ে কার্তিক ছুটল। দোরের কাছে তার বাবার সঙ্গে দেখা।

—"গড়গড়ির মেলা ভাঙবাব হুকুম দিয়েছ তুমি?"

—"হ্যাঁ, দিয়েছি। মেলা না ভাঙলে কলেরা থামবে না।"

—"রাখহরি তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে?"

—"সে পথ আমি মেরে রেখেছি। তুই থাম।"

কার্তিক বললে, "ওই মেলায় আমার একটা 'বিজনেস্' চলছে তা জানো?"

তারিণী বললে, "তোর 'বিজনেস্' না গুষ্টির মাথা! সব জানি আমি। বাখহরিব মেলায় জুয়ার আড্ডা বসাবি, কথায় কথায় বন্দুক চালাবি, ওই রাখহরিই তোকে কোনদিন পুলিশে ধরিযে দেবে।"

কার্তিক বললে, "দেবে! খুব বাহাদুর! আজ একটা খুনখারাপী হযে যাবে। আমি চললাম সেখানে।"

তারিণী ডাকলে, "কেতো! খবরদার বলছি মারামারি করিস না। আমি সামলাতে পারব না। কেতো! কেতো! কার্তিক!"

কার্তিক ফিরল না, ছুটে চলে গেল।

কার্তিক মেলায় গিয়ে দেখলে, সব শেষ। মাত্র কুড়ি-পঁচিশজন লাঠিয়াল আধ ঘণ্টার ভেতর সবকিছু ছই-ছত্রাকার করে দিয়েছে।

যে-লোকটা কার্তিকের জুয়ার 'বিজনেস্' চালাত, তার মুখ থেকেই কার্তিক সব-কিছু শুনলে।

কার্তিক জিজ্ঞেস করলে, "আমাদের কিছু ক্ষতি হয়নি ত?"

"না, বাবু।"

লোকটা বললে, "ক্ষতি যা-কিছু হয়েছে তা খাবারের দোকানগুলোর। ওই দেখুন না, কাউকে খেতে দিলে না—বললে, কলেরা হবে।"

কার্তিক দেখলে, রসগোল্লা, পানতুয়া, সন্দেশ ইত্যাদি সব ধুলোয় মাটিতে ছড়াছড়ি। কুড়ি-পঁচিশটা গেঁয়ো কুকুর পরমানন্দে সেগুলো খাচ্ছে আর মারামারি করছে। বাঁশ দিয়ে, খড় দিয়ে, টিন দিয়ে যে-সব ঘর তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো ভেঙে একেবারে তছনছ করে দিয়ে লোকগুলো চলে গিয়েছে। দোকানীরা তাদের জিনিসপত্র বাক্স প্যাঁটরায় তুলে বাঁধাছাঁদা করছে।

রাখহরি রাগে হাত-পা কামড়াবে। কিছুই আর তার করবার নেই। মেলা আর সে নতুন করে বসাতে পারবে না—এইসব কথা ভেবে কার্তিক মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করছিল। তাই সে এতক্ষণ আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়তেই তার লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে, "আজকে আমাদের ক্যাশ কত হয়েছিল?"

"পঁচাত্তর টাকা সাত আনা।"

"কই, দে।" কার্তিক হাত পেতে বসল।

লোকটি বললে, "বাঃ রে, তবে আর বললাম কী! সেই যে সুন্দরমত ছোকরাটি—তিনি পেথমেই এসে বললেন, আমি জানি এ-খেলা কার্তিকের। তুমি তোমার ঝাণ্ডা ছক গুটি তুলে নাও, আর টাকাকড়ি যা আছে আমার হাতে দিয়ে দাও—লুটপাট হয়ে যেতে পারে। গুনে গুনে থলিসুদ্ধ তুলে দিলাম তেনার হাতে। পঁচাত্তর টাকা সাত আনা। তারপর শেষে যখন চাইলাম বললেন, আমি দিয়ে দেব কার্তিককে। এই ত যাচ্ছে এই দিকে। এখনও আখ-বাড়ি পেরোয়নি।"

কার্তিক রেগে উঠল। বললে, "আচ্ছা বোকা ত! ও বললে আর তুই টাকাগুলো তুলে দিলি ওর হাতে? ও-টাকা আর পাব ভেবেছিস? আমি জানি। সেই জন্যেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছি। চললাম। আমার সঙ্গে পরে দেখা করিস।"

কার্তিক বন্দুক হাতে নিয়ে ছুটল আখ-বাড়ির দিকে।

লোকটা ঠিকই বলেছিল। কার্তিক দেখলে, শঙ্কর আর নবদ্বীপ যাচ্ছে। লাঠিয়ালরা চলে গিয়েছে। শঙ্করের হাতে তারই টাকার থলি।

নবদ্বীপের ভয় সবচেয়ে বেশী। ঘন ঘন পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "কী দেখছ?"

নবদ্বীপ বললে, "রাখহরি খবর এতক্ষণ পেয়ে গেছে, না কী বল?"

শঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, "তাই বুঝি দেখছ—লোকজন আসছে কিনা আমাদের মারতে?"

"তোমার কী বল! গায়ে তাগদ আছে, লড়ে যেতে পারবে।"

শঙ্কর বললে, "তুমি লড়তে না পার, পালাতে পারবে।"

"হ্যাঁ, তা পারব।"

বলে আবার সে যেই পিছন ফিরেছে, দেখলে বন্দুক হাতে নিযে কার্তিক আসছে সেই দিকে। বললে, "ওই দেখ কে আসছে।"

কার্তিককে দেখেই শঙ্কর থমকে দাঁড়াল। বললে, "টাকাটা কার্তিককে দিয়ে দিই।"

নবদ্বীপ কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে তার কঙ্কালসার দেহ নিয়ে কার্তিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, "খুব দেরি করে এলে কার্তিক। এই এত বড় বড় লেডিকেনি, সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি—এই লোকটা আমাকে খেতে দিলে না কিছুতেই, সব ছডিয়ে দিলে মাটিতে, নেড়ি কুকুরগুলো গবাগব মেবে দিলে। তুমি থাকলে আমি কিন্তু ওর কথা শুনতাম না। পেট ভরে সন্দেশ খাব বলে এলাম ওব সঙ্গে, কিন্তু কিছুই হল না, শুধু মেলা ভাঙাই সার হল। আরে, একটা কথাও বলছ না, কী হল তোমার?"

নবদ্বীপ বক বক করে বকেই মবল শুধু। কার্তিক নীববে শঙ্কবের কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, "আমাব টাকায় তুমি হাত দিলে কেন?"

শঙ্কর অবাক হযে গেল তার রাগ দেখে। তাব টাকা তাকেই সে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কার্তিকের মুখ-চোখ আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে সে উল্টো কথা বলে বসল। বললে, "কাব টাকা?"

"আমার।"

শঙ্কর বললে, "না, এ-টাকা তোমাব নয়। জুযা যারা খেলছিল এ-টাকা তাদের।"

কার্তিক বললে, "বটে! এ-টাকা তুমি মেরে দিতে চাও?"

"বেওয়ারিশ টাকা, তুমি মারলেও মারবে, আমি মারলেও মারব।"

কার্তিক বললে, "গায়ে জোর আছে বলে তোমাব এই অহঙ্কাব, কিন্তু এইটে দেখেছ?"

বলেই তার হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে কার্তিক বললে, "এর কাছে গায়ের জোরের দাম এক কানাকড়িও নেই।"

নবদ্বীপ এতক্ষণ পরে বুঝতে পাবলে তাবা ঝগডা করছে। বললে, "এ হে-হে-হে, তোমরা ঝগড়া আবম্ভ করলে যে? চল, বাড়ি চল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেক না। রাখহরির লোকজন সব হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে এসে পড়ল বলে!"

শঙ্কর নবদ্বীপের দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি বাড়ি যাও। আমাদের অনেক কথা আছে।"

"হ্যাঁ, সেই ভাল। তোমার সঙ্গে এসে আমার হল ত খুব! সন্দেশগুলো কাককে খাওয়ালে, কুকুরকে খাওয়ালে, তবু আমাকে খেতে দিলে না।"

গজ গজ করতে করতে নবদ্বীপ সত্যিই চলে গেল।

শঙ্কর কার্তিককে বললে, "এস, এইখানে। তোমাকে একটা কথা বলি।"

রাস্তার একদিকে আখের ক্ষেত, আর একদিকে উঁচু জমির উপর সারি সারি কয়েকটা আমের গাছ। একটা আম গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে শঙ্কর কার্তিককে বললে, "তুমি খুব বন্দুকের বড়াই কর, না? বন্দুক খুব ভাল চালাতে পার?"

"নিশ্চয়ই পারি। তুমি আমার টাকা দেবে কিনা তাই বল।"

শঙ্কর হেসে বললে, "এই নাও তোমাব টাকা। গুনে দেখ পঁচাত্তর টাকা সাত আনা আছে। আমি তোমাকে দেবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

এই বলে থলিটা কার্তিকের হাতে দিয়ে বললে, "আচ্ছা, ওই যে দেখছ গাছের ডালে একটি আম ঝুলছে, তোমার ওই বন্দুক দিয়ে ওইটি পাড়তে পার?"

কার্তিক বসল গাছেব তলায়। হাতের থলিটা নামিয়ে পকেট থেকে দুটি টোটা বের করলে।

শঙ্কর বললে, "আগে টাকাটা গুনে নাও।"

"পরে গুনব।"

কার্তিক টোটা দুটো বন্দুকে পুরে গাছেব ডালে যে আমটি ঝুলছিল, সেই দিকে বন্দুকটি তুলে ধরলে। যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে সুবিধে হল না। আর-একটু সরে গিয়ে সুবিধামত একটা জায়গা বেছে নিয়ে হাঁটু গেড়ে পাকা শিকাবীর মত বসে, দিলে বন্দুকটা চালিয়ে। জোর আওয়াজ হল। গাছ থেকে কয়েকটি আমেব পাতা ঝরে পড়ল, কিন্তু আমটি পড়ল না।

কার্তিক তাকালে শঙ্কবের মুখের দিকে।

শঙ্কর বললে, "লজ্জা কিসের? আবার চালাও। কিন্তু আমটা ফাটিয়ে দিলে চলবে না। বোঁটায় মেবে আমটিকে ফেলতে হবে।"

"সে আবাব কেমন কবে হবে?" কার্তিক বললে, "আমটা দুলছে যে!"

শঙ্কর বললে, "থামুক। থামলে চালাবে।"

কার্তিক বন্দুকটা নামিয়ে নিযে বললে, "মুখে অমনি বললেই হয় না। তুমি পার?"

শঙ্কর বললে, "আমার ত বন্দুক নেই। তোমার বন্দুক রয়েছে, সব সময়েই

দেখছি বন্দুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বন্দুকের বড়াই করছ, তাই তোমাকে বলছি—এই আমটি যদি পাড়তে না পার ত বন্দুক নিয়ে আর ঘুরে বেড়িয়ো না।”

কথাটা শুনে রাগ হয়ে গেল কার্তিকের। বন্দুকটা নামিয়ে রেখে বললে, “বলা খুব সোজা! তুমি যদি নিজে পার, দেখিয়ে দাও, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।”

শঙ্কর এইবার বসল গিয়ে তার পাশে। বললে, “সত্যি বলছ?”

“হ্যাঁ, সত্যি বলছি।”

“কই, দেখি তাহলে একবার চেষ্টা করে।”

শঙ্কর বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিমেষের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করে দিলে চালিয়ে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমটি টুপ করে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেল।

কার্তিক অবাক হয়ে চেয়ে রইল শঙ্করের মুখের দিকে।

বন্দুকের ভিতর থেকে টোটার পোড়া খোল দুটো বের করে নলে ফুঁ দিয়ে শঙ্কর বললে, “চল, এবার বাড়ি যাই।”

কার্তিকের মুখের চেহারা তখন বদলে গিয়েছে। পকেট থেকে আর একটা টোটা বের করে শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, “এবার একটা উড়ন্ত পাখি মার। আমি অনেক চেষ্টা করেছি—পারিনি।”

“আমিই কি পারব? আচ্ছা, দাও, দেখি। কার্তিকের হাত থেকে টোটাটা নিয়ে বন্দুকে পুরতে পুরতে শঙ্কর বললে, “না পারলে হেস না কিন্তু।”

নাম-না-জানা কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল মাথার উপর দিয়ে। শঙ্কর বন্দুকটা তুলেই একটা উড়ন্ত পাখিকে লক্ষ্য করে ঘোড়ায় হাত দিলে। প্রচণ্ড আওয়াজে পল্লীপ্রান্তর কেঁপে উঠল। পাখিটা ঝটপট করে পড়ল দূরে।

কার্তিক ছুটে গিয়ে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলে।

কার্তিকদের বাগানবাড়ির চেহারা গিয়েছে বদলে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘ময়নাবুনী শক্তিকেন্দ্র’। নানান বয়সী গ্রামের ছেলেরা সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। সকাল-বিকেল দু বেলা চলছে নানান রকমের ব্যায়াম। সন্ধ্যায় বসছে যাত্রাগানের আসর।

তারিণী বড়-একটা আসে না এদিকে। নবদ্বীপ সেদিন সন্ধ্যায় টেনে নিয়ে এল তাকে। শঙ্করকে বললে, “তা এ-সব করেছ ভালই করেছ।”

নবদ্বীপ বললে, “ভাল, না, ছাই! আমার ভাগনেটা ভাত-টাত খেতে পারত না, এখন দু-বেলায় আধ সের চাল বেমালুম উড়িয়ে দিচ্ছে।”

তারিণী বললে, “তুইও লেগে পড় না! গায়ে গতরে একটু মাংস লাগবে।”

“সে কি আর জিজ্ঞেস করিনি ভেবেছ? আমাকে বলেছে নেবে না।”

"কেন?"

"জানি না। ওই ওকেই জিজ্ঞেস কর।"

জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন হল না। কার্তিক বললে, "ধেৎ, ও যে গাঁজা খায়।"

নবদ্বীপ বললে, "ওই শোন!"

বলেই সে কথাটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বললে, "দেখা হল রাখহরির সঙ্গে। শঙ্করের ওপর কী রাগ! বলে, ওই ছোঁড়াটাকে গাঁ থেকে যদি না তাড়াই ত আমার নাম রাখহরি নয়। আর কী বললে জান? বললে, তারিণী কিছু করতে পারবে না, যদি কিছু করি ত আমিই করব।"

তারিণী বললে, "ও সব করবে! পাঁচ বছর ধরে একটা ইস্কুল করতে পারেনি।"

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমরা বরং সেই চেষ্টা কবলে পারতে। জল কাদা ভেঙে ক্রোশখানেক দূরে কামারহাটিতে ছেলেরা যেতে চায় না।"

শঙ্কর বললে, "তার আগে আমাদের প্রোগ্রাম একটা রাস্তা তৈরি করা।"

তারিণী বললে, "তার অনেক খরচ, অনেক হাঙ্গামা, সে তোমরা পারবে না।"

শঙ্কর বললে, "আপনি একটু দয়া করবেন, তা হলেই পারব।"

সত্যি সত্যিই রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল।

গ্রাম থেকে সোজা একটি রাস্তা শহরের বাস্তায় গিয়ে মিশবে। দড়ি ধরে মাপজোক করে তার প্রাথমিক আয়োজন শেষ হতে দেরি হল না। সারা গ্রামের ছেলেছোকরার দল সমবেত হল শক্তিকেন্দ্রেব প্রাঙ্গণে। সারি দিয়ে দাঁড়াল তারা। হাতজোড় করে ভগবানেব কাছে প্রার্থনা করলে, শপথবাক্য উচ্চারণ করলে, তারপর প্রতিজ্ঞাপত্র সই করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই বিরাট কর্ম-যজ্ঞে। দুঃসাধ্য-সাধন-ব্রত গ্রহণ করেছে তারা। ভগবান শক্তি দাও!

চমৎকার একটি গান রচনা কবে দিয়েছে শঙ্কর। সেই গান গেয়ে গেয়ে তারা কাজ করতে লাগল।

নিতান্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বাদ গেল না। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে শিশু-বাহিনী। ছোট ছোট বালতিতে জল নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রান্ত কর্মীদের মুখেব কাছে তারা তুলে ধরছে পিপাসার জল।

জয়া সেদিন পুকুরের পাড়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এল এদের কাজ। বাড়িতে এসেই বললে, "বাবা, দেখেছ?"

"কী দেখব?"

"ছেলেবা কেমন রাস্তা তৈরি করছে।"

রাখহরি বললে, "ও আর দেখতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছ বাবা?"

রাখহরি বললে, "এখান থেকে চলে গিয়ে আমার মেলা ভেঙে দিয়ে যে বেআইনী কাজ ও করেছে তার জন্য ওকে আমি জেলে পুরে দিতে পারতাম তা ও জানে। এখনও সে ভয় ওর আছে। তাই লোক-দেখানো একটা ভাল কাজের ছুতো করে লোকজনকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, উদ্দেশ্য ওর মন্দ নয়।"

জয়া বললে, "তা হোক বাবা, তবু দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

রাখহরি রাগ করে বললে, "তোরা দেখগে যা। কাঠবিড়ালী সাগর বাঁধছে! ও কিছু হবে না শেষ পর্যন্ত। এই আমি বলে রাখলাম।"

জয়া চলে যেতেই বিশ্বনাথ এল। রাখহরির প্রতিবেশী বিশ্বনাথ। বললে, "বসে বসে ঘুমুচ্ছ তুমি রাখহরি, এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল।"

রাখহরি হাসতে লাগল। বললে, "কী সর্বনাশ?"

বিশ্বনাথ বললে, "সারা গাঁয়ের সর্বনাশ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো কেউ বাপমায়ের কথা শুনছে না। কী জাদুমন্ত্রে যে ভুলিয়েছে ওই ছোঁড়াটা কে জানে! ওকে তুমি জব্দ করে দিতে পারছ না?"

রাখহরি বললে, "শুনেছি ওরা রাস্তা তৈরি করছে। তুমি দেখেছ?"

বিশ্বনাথ বললে, "দেখেছি মানে? এই ত সেখান থেকেই আসছি। তা বাহাদুরি আছে ছেলেগুলোর। রাস্তা অনেকখানি করে ফেলেছে।"

রাখহরি বললে, "দাঁড়াও না! রাস্তা যেদিক দিয়েই যাক, আমার জমির ওপর দিয়েই যেতে হবে। তারিণীর ছেলেটা সেদিন এসেছিল বলতে। দিক না একবার আমার জমিতে—"

কথাটা বিশ্বনাথ তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, "চারকুড়োর জমি কার? তোমারই ত?"

"হ্যাঁ আমার।"

"বাস্, হয়ে গেছে।" বিশ্বনাথ বললে, "তোমার জমির ওপর দিয়েই নিয়ে গেছে রাস্তাটা।"

রাখহরি জিজ্ঞেস করলে, "কতটা আন্দাজ গেছে?"

"তা দু হাত আড়াই হাত হবে। তোমার জমির আল-বরাবর।"

রাখহরি বললে, "আচ্ছা। তুমি এখন যাও, আমি দেখছি।"

পরের দিন সকালে কাজ করতে গিয়ে ছেলেরা থমকে দাঁড়াল। শঙ্কর, কার্তিক—দুজনে ছিল সবার আগে। দেখলে, তৈরি রাস্তা ভেঙে অনেকখানি জায়গা একেবারে ছই-ছত্রাকার করে দেওয়া হয়েছে।

শঙ্কর কার্তিকের মুখের দিকে তাকালে। কার্তিক বললে, "আমি বুঝেছি এ কার কাজ। চললাম আমি, ওকে একবার দেখছি।"

কার্তিক চলে যাচ্ছিল, শঙ্কর তার হাতটা চেপে ধরলে।

"না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও শঙ্করদা। আমাদের এত কষ্টের তৈরি রাস্তা এমনি করে ভেঙে দেবে?"

শঙ্কর বললে, "ভাঙুক।"

"তুমি জান না শঙ্করদা, লোকটা শয়তানের একশেষ। তোমাকে না জানিয়ে সেদিন রাত্রে আমি ওর পায়ে ধরে বলে এসেছিলাম। বলেছিলাম, সবাই দিয়েছে, এইটুকু জমি আপনি ছেড়ে দিন। আমাকে ও নিজের মুখে বলেছিল—নাওগে। আর এখন কিনা আমাদের গড়া কাজ দিলে ভেঙে!"

শঙ্কর বললে, "ভাঙুক। আজ ভেঙেছে, কালও হয়ত ভাঙবে, কিন্তু পরশু আর ভাঙতে পারবে না। হাত কাঁপবে। ওরা ভাঙুক। আমরা গড়ে যাই। দেখি শেষ পর্যন্ত কে জেতে!"

কার্তিক বললে, "রাখহরিকে কিছু বলব না?"

শঙ্কর বললে, "বলবি দেখা হলে। বলবি, এ রাস্তা একা আমাদের নয়, আপনারও। এরকম করে ভাঙবার হুকুম আপনি দিলেন কেমন করে তাই ভাবছি।"

কার্তিক বললে, "ধেৎ, অত মোলায়েম করে বললে কোন কাজই হবে না।"

শঙ্কর বললে, "হবে। ওঁর একটা ছেলে যদি আমাদের সঙ্গে থাকত, তাহলে বোধহয় একাজ উনি করতে পারতেন না।"

কার্তিক বললে, "ওঁর ছেলেই নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটা ধাড়ী মেয়ে—জয়া।"

কিন্তু ছেলে যার আছে, সে কী করলে?

কার্তিকের বাবা তারিণীশঙ্কর সেদিন বসেছিল তার বাইরের ঘরে।

নবদ্বীপ বললে, "রাস্তাটা বাবু মন্দ করছে না। এ'টের উপর কাপড় তুলে জলে-কাদায় এবাব আর গপাং গপাং করে যেতে হবে না। ছোঁড়ারা কাজটা ভালই করছে, না, কী বল?"

তারিণীশঙ্কর বললে, "করবেই ত!" পুত্র-গর্বে একটু গর্বিত হল। বললে, "কেতো যে-কাজে হাত দেয় সে-কাজ ও শেষ না করে ছাড়ে না।"

বলতে বলতেই কার্তিক ঘরে ঢুকল। বললে, "বাবা, দখিন মাঠে আমাদের যে জমি আছে, এবার তার ওপর দিয়ে রাস্তাটা যাবে কিন্তু।"

নবদ্বীপ বললে, "বেশ ত। যাক না।"

তারিণী তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, "তুই থাম।"

"থামলাম।" বলে নবদ্বীপ চুপ করে রইল।

তারিণী এইবার কার্তিককে নিয়ে পড়ল। বললে, "তুই কী রকম ছেলে রে? নিজের ক্ষতি নিজে করবি? তুই ত দলের চাঁই, তোর কথা সবাই শুনবে। রাস্তাটা রাখহরির জমির ওপর দিয়ে নিয়ে যা।"

কার্তিক বললে, "ওর জমি যতটা নেবার নিয়েছি বাবা। রাস্তাটা সোজা নিয়ে যেতে হবে ত!"

"তার কি কোনও বাঁধাধরা নিয়ম আছে নাকি? বেঁকেই না হয় গেলি?"

কার্তিক এবার বোধহয় রাগ করলে। বললে, "তার মানে—জমি তুমি দেবে না?"

তারিণী বললে, "না, ও-জমি আমি দেব না। জলাব ধাবের ও-জমি আমাব ডাকলে সাড়া দেয়। বেঁকে যেতে না পার, রাস্তা তৈরি বন্ধ করে দাও।"

বিদূষক নবদ্বীপ বলে উঠল, "সেই ভাল। বন্ধ করে দাও। চিরদিন আমরা জলে কাদায় হেঁটেছি বাবা, এখনও হাটব।"

"তুমি থাম।" বলে রেগেই চলে গেল কার্তিক।

নবদ্বীপ বললে, "রেগে গেল যে?"

তারিণী বললে, "তা যাক।"

ওদিকে আর-এক সমস্যা। বেলমাব ডাঙা থেকে কাঁকব আব পাথর আনতে হবে। গরুর গাড়ি চাই।

ময়নাবুনির প্রত্যেকটি মানুষ চাষী গৃহস্থ। এক-আধখানা বাড়ি ছাড়া প্রায় সব বাড়িতেই গবুও আছে, গাড়িও আছে। আর প্রত্যেক বাডিব ছেলে আছে শঙ্করের দলে। সবাই 'শক্তিকেন্দ্র'ব সদস্য। গরুব গাড়ির অভাব হল না। তিরিশ জোড়া গরুর গাড়ি বেরিয়ে এল ময়নাবুনির রাস্তায়।

কাজ বন্ধ রইল দুদিন। শঙ্কর আর কার্তিক দুজনেই সেই গরুর গাড়ি চড়ে বেলমা গেল। বেলমাব ডাঙার যিনি মালিক তাঁব অনুমতি চাই।

অনুমতি পেতে দেরি হল না। কাঁকর-পাথরের প্রকাণ্ড ডাঙা। ডাঙার মালিক বৃদ্ধ শশধরবাবু তখন শুনেছেন যে, ময়নাবুনির ছেলেবা একজোট হয়ে নিজেবাই রাস্তা তৈরি করছে। শঙ্কব আর কার্তিকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "এইত চাই! কাঁকর-পাথব আমি নিশ্চয়ই দেব, কিন্তু দড়ি ধরে মেপে কেটে নিতে হবে বাবা। এলোপাথাড়ি যেখানে-সেখানে গর্ত করে নিলে চলবে না। গাড়ি ত এনেছ অনেক, কিন্তু কাটবার লোক কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "আপনি দেবেন।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি।—"আরে, আরে, এ বলে কী? আমি দেব?"

কার্তিক বললে, "এইটুকু সাহায্য আপনি করুন আমাদের। তারপর আপনার কী উপকার করতে হবে বলবেন। আমরা সবাই মিলে এসে করে দিয়ে যাব।"

"উপকার?" শশধরবাবু বললেন, "রাস্তা তৈরি শেষ হলে আমাকে জানিও। তোমাদের সবাইকার নেমন্তন্ন রইল। পেট ভরে একদিন খেয়ে যাবে আমার বাড়িতে। তা হলেই আমার উপকার হবে।"

চমৎকার মানুষ শশধরবাবু। নিজের খরচে গাড়ির পর গাড়ি কাঁকর-পাথর বোঝাই করে দিতে লাগলেন।

এমন একদিন নয়।

দিনের পর দিন।

আর এদিকে তারিণীশঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে বসেছে—জমি সে কিছুতেই দেবে না।

শঙ্কর বললে, "জমি যখন উনি কিছুতেই দেবেন না, তখন আমরা যদি তাঁর অমতেই রাস্তাটা সোজা ওই জমির ওপর দিয়েই নিয়ে যাই, কী হয়?"

কার্তিক বললে, "তুমি চেনো না আমার বাবাকে, তাই একথা বলছ।"

শঙ্কর বললে, "কেন? উনি কি তোর নামে মামলা করবেন, না রাস্তাটা ভেঙে দেবেন?"

"না, মামলাও করবে না, রাস্তাও ভাঙবে না, জমির শোকে আমার মাথা ভাঙবে, নয়ত নিজের মাথাটাই ভেঙে ফেলবে।"

শঙ্কর বললে, "তা হলে কি রাস্তাটা বেঁকিয়ে নিয়ে যাব হরি মোড়লের জমির ওপর দিয়ে?"

কার্তিক বললে, "না, তা হয় না। রাখহরি আমাদের গায়ে থুতু দেবে। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমাদের।"

"তাহলে উপায়?"

কার্তিক বললে, "উপায় একটা আছে। বাবাকে আমি চিনি। টাকা দিয়ে জমিটা কিনে নেব বাবার কাছ থেকে।"

"টাকা পাবি কোথায়? এখন উনি আমাদের গরজ বুঝে বেশী টাকা চাইবেন।"

"যত বেশীই চান—এক হাজার টাকার বেশী হবে না।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "হাজার টাকা আছে তোর?"

"তার চেয়েও কিছু বেশি আছে। গড়গড়ির মেলায় আমি জুয়ার কারবারে লাভ করেছি আড়াই হাজার টাকা।"

কার্তিক আবার বললে, "গাঁয়ের লোকের টাকা গাঁয়ের কাজে লেগে যাক।"

শেষ পর্যন্ত তাই হল।

কিন্তু হল একটু অভিনব উপায়ে।

তারিণীশঙ্কর কী যেন লিখছিল বসে বসে। সুমুখে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল।

ঘরে ঢুকল শঙ্কর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

মুখ তুলে শঙ্করকে দেখেই তারিণী বলে উঠল, "জানি তুমি কী জন্যে এসেছ। ও-জমি আমি দেব না। কেতোকে ত আমি বলে দিয়েছি। আমার মুখে দু কথা নেই। এতে তোমাদের রাস্তা হোক আর না-হোক।"

শঙ্কর বসল সুমুখের মোড়াটা টেনে নিয়ে। বসতে বসতে জোরের সঙ্গেই বললে, "আজ্ঞে না, রাস্তা আমাদের হবেই।"

কথাটা শুনে তারিণী আনন্দিত হল। বললে, "বুঝেছি। তাহলে রাখহরির জমির ওপব দিয়েই রাস্তাটা নিয়ে যাবে ঠিক করলে? ভাল, ভাল। ও পরামর্শ আমি দিয়েছি। বেশ চ্যাটালো কবে নিয়ে যাবে। যাক-না একটু বেঁকে। রাস্তা ত!"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, বেঁকে যাবে না। রাস্তা সোজাই যাবে। আমরা ঠিক করেছি—আপনার জমির যা দাম হয়, আমরা দিয়ে দেব।"

তাবিণী একটু বিস্মিত হল কথাটা শুনে। বিস্মিত হবার কথাই। কেতোর মুখে শুনেছে তাদের টাকা নেই, এমনকি কাঁকর-পাথর কাটাইয়েব খবচের জন্যে বেলমাব শশধবেব হাতে-পায়ে ধবে কান্নাকাটি কবে এসেছে তারা—সে-কথাও তার কানে এসেছে।

তাবিণী ভাল করে তাকালে শঙ্করের দিকে। কথাটা শুনেছে ত ঠিক?

"দাম দিয়ে দেবে? ওই জমিব? পাববে কেন হে? ও-জমি আমার সব-চেয়ে সবেস জমি—ডাকলে কথা কয়। ওর দাম তোমরা দিতে পারবে কেন?"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "দাম কত হবে?"

তারিণী একটু ভাবলে। ভেবে বললে, "কেতোর মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে যেন যে-কটা মাঠের ওপর দিযে রাস্তাটা তোমরা নিয়ে যাচ্ছ, সব মিলিযে বিঘে-দুয়েক হবে। তা এই দু বিঘের দাম আমি একটি হাজার টাকার এক পয়সা কম নেব না।"

কথাটা শোনামাত্র শঙ্কর তার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে গুণতে লাগল।

এতগুলো নোট শঙ্করের হাতে দেখে তারিণীব চোখ ত ছানাবড়া!—"এত এত টাকা কোথায় পেলে হে? চুরি-ডাকাতি করলে নাকি কোথাও?"

সে-কথায় কানই দিলে না শঙ্কব। গোনা শেষ করে নোটের তাড়াটা তারিণীর হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, "গুনে নিন।"

তারিণী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল ঠিক মনে করতে পারলে না।

একটি হাজার টাকা নগদ! যে-জমিটার ওপর ছোঁড়ারা দড়ি ফেলছে সেটা দু বিঘে ত হবেই না, তা ছাড়া ও-জমিতে ধানও ভাল হয় না। তারিণী নোটের তাড়াটা বেশ করে ঠুকে ঠুকে সমান করে নিয়ে কাঠের হাত-বাক্সটার উপর নামালে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে চেপে, ডান হাতের আঙুলে থুতু লাগিয়ে, সে এক অদ্ভুত উপায়ে পট্ পট্ শব্দ করতে করতে নিমেষের মধ্যে গুনে ফেললে নোটগুলো। একখানা নোট তাড়া থেকে টেনে বের করে লণ্ঠনের আলোয় তুলে ধরে দেখলে, নকল কিংবা অচল কিনা! কিন্তু এই এতগুলো নোটের ভিতর মাত্র একখানা নোট দেখলে চলবে না। তাসের মত আঙুল দিয়ে ফর ফর করে উল্টে যেতেই হঠাৎ তার নজর পড়ল একখানা নোটের উপর। টেনে সেই নোটখানা বের করে আবার আলোর সামনে তুলে ধরলে তারিণীশঙ্কর। দেখলে, তার সাদা অংশে টকটকে লাল কালিতে লেখাঃ রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। নোটখানা চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এ নোটগুলো তোমরা কোথায় পেলে বলতে হবে।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, ও-কথাটা আর জিজ্ঞেস করবেন না।"

"কেন হে? তোমরা আমার ছেলের মত, তাছাড়া টাকা বলে কথা। জিজ্ঞেস করব না?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। বারণ আছে।"

তারিণী এবার যেন লাফিয়ে উঠল, "বারণ আছে? তাহলে ত শুনতেই হবে।"

শঙ্কর কিছুতেই বলতে চায় না।—"আজ্ঞে না, শুনে কাজ নেই। শেষকালে যদি চটে যান!"

"না না, চটব না। তুমি বল।"

শঙ্কর বললে, "কথাগুলো যে ভাল নয়! এই যেমন ধরুন, আপনি চামার, আপনি ছোটলোক, আপনি কেপ্পন, আপনি জোচ্চোর,—কী নয় আপনি?"

কথাগুলো শ্রুতিমধুরও নয়, প্রীতিকরও নয়, তবু শুনলে তারিণী। শুনতে শুনতেই মুখের চেহারা তার অন্যরকম হয়ে গেল। রাগে তার শরীরটা মনে হল যেন কাঁপছে। বললে, "কে বলেছে এই সব কথা?"

"এই দেখুন, আপনি চটে যাচ্ছেন! এই জন্যেই আমি বলতে চাইনি।"

তারিণী জেদ ধরে বসলঃ "না, তোমাকে বলতেই হবে। বল কে বলেছে।"

শঙ্কর এতক্ষণ পরে বললে, "বলেছেন রাখহরিবাবু।"

তারিণী চিৎকার করে উঠল, "রেখো বলেছে?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছে। আরও যে-সব কথা বলেছে—সেগুলো মুখে উচ্চারণ করা যায় না। কানে আঙুল দিতে হয়। বলেছে—জমির দাম

না পেলে ও-চামার কখনও এক ছটাক জমি ছাড়বে না। এই বলে এই নোট-গুলো আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, এবার ওই চামারটার মুখের উপর এইগুলো ছুঁড়ে মেরে দাওগে, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক হওয়াচ্ছি!" বলেই নোটগুলো শঙ্করের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তারিণী বললে, "ধর। তাই ত বলি, ও-হারামজাদা ছাড়া নোটের উপর নাম কে লিখে রাখবে? নোটগুলো যেন ওর বাপ্‌পুতি সম্পত্তি। দেখ, তুমি এক্ষুনি চলে যাও ওর কাছে।"

শঙ্কর বললে, "যাব?"

তারিণী বললে, "নিশ্চয় যাবে। গিয়ে ওই নোটগুলো রেখোর মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে দেবে। তারপর যেরকমভাবে ও আমাকে গালাগালি দিয়েছে তার তিনগুণ গালাগালি ওকে শুনিয়ে দিয়ে বলবে—তারিণী মুখুজ্যে কখনও রেখোর টাকার তোয়াক্কা করে না। যাও।"

শঙ্কর একটু বিপদে পড়ল। বললে, "যাচ্ছি। কিন্তু আপনার জমিটার কী হবে? টাকা ত উনি ওই জমির জন্যেই দিয়েছেন।"

তারিণী বললে, "তুমি আচ্ছা বোকা ত? টাকাগুলো ওর মুখের উপর ফেলে দিয়ে ওকে শুনিয়ে দিয়ে আসবে—শুধু জমি কেন, তোমাদের ওই রাস্তা তৈরি করবার যাবতীয় যা-কিছু খরচ—সব হাম দেঙ্গা। তারিণী মুখুজ্যে চুনো-পুঁটি নেহি হ্যায়।"

শঙ্কর খুশী হয়ে উঠে দাঁড়াল।—"আমি এক্ষুনি ওঁকে অপমান করে দিয়ে আসছি দেখুন। আমি জানি লোকটা ভাল নয়। নইলে দেখলেন না, আমি ওঁর কাছে দুটো দিন থাকতে পারলাম না! মেলাটা ভেঙে দিলাম।"

"এই সুযোগে তুমি তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।"

শঙ্কর বললে, "ঠিক বলেছেন। কার্তিককে তখন বললাম, আমি যাব না লোকটার কাছে। কার্তিক কিছুতেই ছাড়লে না। বললে, 'বাবা যখন জমিটা দেবেই না, তখন রাখহরির কাছে হাত আমাদের পাততেই হবে'।"

তারিণী বললে, "কেতোটা ছোটলোক।"

ছোটলোক কেতো অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল তার বাপের কথাবার্তা। হাসি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না সে। যেই দেখলে শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কার্তিক একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

শঙ্কর এসেই নোটের তাড়াটা তার হাতে দিয়ে বললে, "নে, রাখ।"

কার্তিক বললে, "খুব ভাল অভিনয় করেছ শঙ্করদা।"

শঙ্কর বললে, "নোটের উপর রাখহরির নামটা কী জন্যে লিখে রেখেছিলাম এখন বুঝতে পেরেছিস?"

"পেরেছি। এবার যাও একবার রাখহরির বাড়িতে। টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

শঙ্কর বললে, "তোর টাকা। তুই যা।"

কার্তিক বললে, "যাব, যদি-না আবার আমাদের রাস্তা ভাঙতে যায়!"

শঙ্কর বললে, "এ কদিন যখন যায়নি, তখন আর বোধহয় যাবে না।"

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই দিনই রাত্রে রাখহরির দলবল গিয়ে হাজির। দিনপাঁচেক আগে যে-জায়গাটা তারা ভেঙে ফেলেছিল, গিয়ে দেখলে, সেটা আবার মেরামত করে নিয়েছে ছেলেরা। রাস্তাটা আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থেমেছে একেবারে তারিণীশঙ্করের জমির মাথায়। রাখহরি এবার নিজে যায়নি, বিশ্বনাথকে পাঠিয়েছে। বিশ্বনাথ তার ভাইকে সঙ্গে নিয়েছে। আর নিয়েছে দশজন মজুর। প্রত্যেকের হাতে গাঁইতি আর টাম্‌না। দুটি মাত্র লণ্ঠন। একটি বিশ্বনাথের হাতে, আর একটি তার ভাইয়ের হাতে।

বিশ্বনাথ তার হাতের লণ্ঠনটি তুলে ধরে মজুরদের হুকুম করলে, "ওই যে ছোট একটা গাছ রয়েছে রাস্তার ধারে, ওইখান পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে হবে।"

তার ভাই বললে, "দশজনের ভেতর তোরা ছজন গাঁইতি চালা, আর বাকী চারজন কাঁকর মাটি তুলে তুলে ওই মাঠের উপর ছড়িয়ে দে।"

লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কেউ আর এগিয়ে গেল না।

বিশ্বনাথ বললে, "নে, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তাড়াতাড়ি ভেঙে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যা।"

তবু কেউ যেতে চায় না!

"বুঝেছি। বেশি টাকা নেবার মতলব? আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা চেয়েছিলি, পঁচিশ টাকাই দেব।"

ডোমন বাগদী এগিয়ে গেল। গিয়েই ঝপ্ করে একটা জায়গায় হাতের গাঁইতিটা দিলে বসিয়ে।

বিশ্বনাথ বললে, "সাবাস! এই ত চাই!"

ডোমন আবার তার গাঁইতিটা তুলে ধরলে, কিন্তু তুলে ধরে আর নামাতে পারলে না।

"কী হল? মা-কালীর মতন হাতটা তুলেই রইলি যে।"

ডোমন চলে এল। "না বাবু, এ-কাজ পারব না। ভাল লাগছে না।"

বিশ্বনাথ বলে উঠল, "মাথা-পিছু পাঁচ টাকা করে দেব। নে, লাগা।"

কে একজন বলে উঠল, "ধেৎ! চল রে চল!"

বিশ্বনাথ এবার এগিয়ে এল একটা লোকের কাছে। বললে, "পাঁচ টাকাতেও হাত উঠছে না?"

লোকটা বললে, "না বাবু, টাকার জন্যে নয়। আমরা পারব না। এ-কাজ আগে বললে আসতাম না আমরা।"

এই বলে একে একে সবাই চলে গেল।

বিশ্বনাথ আর তার ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় বাইরের অন্ধকারটা মনে হল যেন আরও জমাট বেঁধে রয়েছে। ঝিঁঝিপোকা আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত। দূরে গ্রামপ্রান্তে একটা কুকুর কেঁদে উঠল যেন। বিশ্রী কান্না। বিশ্বনাথের ভাই বললে, "চল দাদা, রাখুদাকে বলিগে, এখানে আর মিছেমিছি দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?"

বিশ্বনাথ বললে, "চল। কিন্তু এই ব্যাটা ছোটলোকদের কীরকম বাড় বেড়েছে দেখেছিস? মুখের উপর বলে দিলে—পারব না!"

সংবাদের জন্য রাখহবি বোধ করি উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করছিল। বিশ্বনাথকে আসতে দেখেই জিজ্ঞেস করলে, "কী খবর?"

বিশ্বনাথ লণ্ঠনটা হাত থেকে নামিয়ে বসল একটা খাটের ওপর। বললে, "উঁহু, ওদের দিয়ে হবে না। গেল দশটা টাকা।"

রাখহরি এই খববটাই যেন শুনতে চাইছিল। হাসতে হাসতে বললে, "পারলে না?"

বিশ্বনাথ বললে, "না। ব্যাটারা পারব না বলে পালিয়ে গেল।"

"যাক্ গে। ওদের দিয়ে হবে না। ওটা উড়িয়ে দিতে হলে ডিনামাইট দরকার।"

বিশ্বনাথ বললে, "যা দবকার তাই কর।"

"তাই করব। তুমি এখন যাও। আমার কাজ আছে।"

জয়া বোধহয় তার বাবাকে ডাকতে এসেছিল খাবার জন্যে। বিশ্বনাথ চলে যাবার পরেই সেও অন্ধকারে গা ঢেকে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। বাবাকে আব ডাকলে না।

ছি-ছি, ডিনামাইটেব কথা তাব বাবা ভাবছে কেমন করে? লোকটা তার মেলা ভেঙে দিয়েছে। শঙ্করের উপর রাগ হবার কথাই। তারও রাগ হয়েছিল এখান থেকে না-বলে চলে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু মেলা ভেঙে দেবার পবেই যখন গ্রামেব কলেরা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আর রাগ-অভিমান কিছু রইল না শঙ্কবের উপর।

সাবান দিয়ে সেদিন মাথা ঘষেছিল জয়া। চুলগুলো শুকবার জন্যে ছাতে গিয়েছিল। আলসের কাছে দাঁড়িযে হঠাৎ নজর পড়ল রাস্তাটার দিকে। ত্রিশ-চল্লিশ জোড়া গরুর গাড়ি ক্রমাগত কাঁকর আর পাথর ফেলে চলছে। ওদিকে গ্রামের ছেলেরা কাজ করছে। গ্রামের মজুরও রয়েছে কিছু কিছু। মাটি

কাটার কাজটা ছেলেরা হয়ত ঠিক পারে না। তাই জনমজুর লাগিয়েছে টাকা দিয়ে। কিন্তু নিঃসম্বল, টাকা কোথায় পেলে?

অনেক দূরে কাজ করছে তারা। তালপুকুরটা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। এত দূর থেকে মানুষগুলিকে ঠিক চেনা যায় না। জয়ার চোখ খুঁজছিল শুধু শঙ্করকে। হাজার মানুষের মাঝেও তাকে চিনতে ভুল করবে না জয়ার চোখ। ওই ত শঙ্কর, হাতকাটা একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিজেও কাজ করছে ছেলেদের সঙ্গে। রাস্তা এগিয়ে চলেছে।

জয়ার চুল শুকিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তবু সে ছাত থেকে নামতে পারলে না। মেয়েদের নেয় না কেন? গ্রামে ত অনেক মেয়ে আছে—যারা শুধু ভাত বাঁধে আর পড়ে পড়ে ঘুমোয়। জয়া অজান্তেই শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ফেললে।

নীচে থেকে রাখহরি ডাকলে, "জয়া! চা হয়েছে?"

জয়া চমকে উঠল। এতক্ষণ নীচে নেমে গিয়ে চা তৈরি করা উচিত ছিল তার। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দেখলে, চাকরটা উনুন ধরিয়ে জল গরম করছে।

চমৎকাব দেখাচ্ছে জয়াকে। চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো, আঁটসাঁট জামার উপর গাছকোমরবাঁধা রঙিন শাড়ি। বাবাকে তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিয়ে বললে, "বাবা, তুমি সেদিন বলছিলে ওদের রাস্তা তৈরিব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তারিণী ওর জমির ওপর দিয়ে রাস্তাটা যেতে বোধহয় দিলে না।"

রাখহবি বললে, "তারিণীকে আমি চিনি না? আমি দিলাম বলে তারিণী দেবে ওর জমি নষ্ট করতে? রাস্তার কাজ ত এখন বন্ধ আছে।"

"চা খেতে খেতে তুমি একবার আসবে আমার সঙ্গে?"

"কোথায়?"

"ছাতে।"

"চল।"

জয়া তার বাবাকে ছাতে নিয়ে গিযে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখিযে বললে, "কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বলছিলে, দেখ।"

রাখহবি দেখলে, তাবিণীর জমির উপব দিয়েই রাস্তাটা এগোচ্ছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল রাখহরি।

জয়া বললে, "আর তুমি ভাবছ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবে।"

রাখহরি হঠাৎ যেন চমকে উঠল—"তুই কোথায় শুনলি?"

জয়া বললে, "শুনেছি। তুমি একবার ভেঙে দিয়েছ, আবার ভেঙে দিতে চাও। এ-কথা সবাই জানবে, সবাই শুনবে।"

রাখহরি বললে, "না রে না, ও আমি এমনি বলেছিলাম বিশ্বনাথকে।"

"ফের যদি ওই কথা বলতে আসে বিশ্বনাথ ত আমি ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব বাবা, তুমি তখন আমাকে যেন কিছু বোল না।"

রাখহরি চুপ করে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। একটি কথাও বললে না।

চাকরটা ডাকলে, "দিদিমণি!"

"ওমা, ওকে এখনও চা দিইনি।"

এই বলে খালি কাপ-ডিসটা রাখহরির হাত থেকে নিয়ে জয়া নীচে নেমে গেল।

সেদিন সকালে কাজে যাবার সময় ছেলেদের সোজা রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়ে শঙ্কর কার্তিককে বললে, "আয়, আমরা একটু ঘুরে যাই।"

"কোনদিকে ঘুরে যাবে?"

"আয় না তুই আমার সঙ্গে।"

বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখ দিয়ে গিয়ে, রসিক মোড়লের বাড়ির পাশ দিয়ে যেই বাঁ দিকের রাস্তায় পা দিয়েছে শঙ্কর, কার্তিকের বুঝতে বাকী রইল না কোনদিক দিয়ে সে যেতে চায়।

খানিকটা গিয়ে কার্তিক বেঁকে বসল। বললে, "তুমি একাই যাও, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন, তোর রাস্তা ত আর ভাঙেনি।"

"সুবিধে পায়নি তাই ভাঙেনি। একবার যে ভাঙতে পারে, আবার ভাঙতেই-বা তার কতক্ষণ!"

শঙ্কর বললে, "সেই জন্যেই যাচ্ছি ওই পথে। যদি দেখা হয় ত কী বলে শুনব।"

কার্তিক বললে, "দেখা যদি না হয়?"

"দেখা না হলে চলে যাব।"

কার্তিকের হঠাৎ মনে পড়ল জয়ার কথা। হেসে জিজ্ঞেস করলে, "জয়ার সঙ্গে দেখা হলে কী করবে? সে যদি ডাকে?"

এবার শঙ্কর একটু বিপদে পড়ে গেল। সেও মনে মনে সেই কামনাই করছিল। রাখহরির সঙ্গে দেখা হোক তা সে চায় না। সেও চায় জয়াকে একটিবার দেখতে। আর সেই জন্যেই তার এ-পথে আসা।

কিন্তু মানুষ যা চায় সবসময় তা হয় না।

রাখহরির বাড়িটা তারা পার হয়ে চলে গেল। কারও সঙ্গেই দেখা হল না।

হঠাৎ পেছনে ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল শঙ্কর।

কার্তিক বললে, "তোমাকে ডাকছে, যাও।"

শঙ্কর দেখলে বাইরের দিকের ছোট ছাতটার উপর রাখহরি দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "শোন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

কার্তিক আবার বললে, "যাও, শুনে এস।"

"তুই যাবি না?"

"না।" কার্তিক চুপি চুপি বললে, "অমনি তোমার জয়াকে দেখে এস।"

শঙ্কর হেসে তার গায়ে একটা চড় মেরে বললে, "যাঃ!"

শঙ্কব ভেবেছিল রাখহরি তাকে মেলা ভাঙার কথা কিছু বলবে। হয়ত-বা তিরস্কার করবে। কিন্তু কিছুই সে করলে না। সাদরে অভ্যর্থনা করে বললে, "বোস।"

শঙ্কর বসতে বসতে বললে, "একটু তাড়াতাড়ি বলুন। কাজ আছে।"

রাখহরি বললে, "আমার বাড়ি একটু বসলেও কি তারিণী চটে যাবে?"

শঙ্কর দেখলে, এই সুযোগ। বললে, "আজ্ঞে না। আপনাদের দুজনের ভেতরে ভেতবে যে এত বেশাবেশি তা জানতাম না। যাকগে ও-সব কথা থাক, এখন বলুন, মেলাটা ভেঙে দিয়ে আমি ভাল কাজ করেছি কিনা। কলেরা একদম থেমে গেছে।"

বাখহরি বললে, "সে-কথা বলবার জন্যে আমি তোমাকে ডাকিনি। আমি জিজ্ঞেস করছি—এই যে তোমরা রাস্তা তৈরি করছ, এত এত গাড়ি, এত এত কুলি-মজুর, টাকা-পয়সা পাচ্ছ কোথায়?"

"এই দেখুন, আবার সেই কথা এসে পড়ল।"

শঙ্কব বললে, "সেদিন একটা চাঁদার খাতা তৈরি করেছিলাম। ভেবেছিলাম কিছু চাঁদা তুলে খরচ চালাব। খাতার প্রথমেই লিখেছিলাম আপনার নাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারিনি। তারিণীবাবুর কাছে খাতাটা নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আগে আপনি কিছু চাঁদা দিন।' খাতার পাতাটা উল্টেই তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।"

"কেন?"

শঙ্কর বললে, "ওই যে আপনার নাম লিখেছিলাম সবার ওপরে। তারিণীবাবু খচাং করে আপনার নামটা কেটে দিলেন।"

রাখহরির মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলে "তারপর?"

শঙ্কব বললে, "তারপর আর না শোনাই ভাল। বললেন, খাতাটাই বরবাদ হয়ে গেল। রেখোটা চামার, ছোটলোক, জোচ্চোর—"

জিব কেটে শঙ্কর বললে, "এ-হে-হে-হে, আপনাকে এ-সব কথা বলা আমার অন্যায় হচ্ছে।"

রাখহরি বললে, "না না, অন্যায় হয়নি। তুমি বল। আমি শুনব।"

শঙ্কর বললে, "সে-সব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবেও না, সব কথা গুছিয়েও বলতে পারব না। বললেন, কোন ভাল কাজের জন্যে ও-ছোটলোকের কাছ থেকে তোমরা একটা আধলা পয়সাও বের করতে পারবে না, এই-না বলে খাতার উপরে আপনার নামটা যেখানে ছিল সেইখানে চড়চড় করে নিজের নামটা লিখে বাকী সব নাম দিলেন কেটে। বললেন, কারও কাছে যেতে হবে না। তারিণী মুখুজ্যে বেঁচে থাকতে কেপ্পন কঞ্জুষ রাখহরির কাছে ভিক্ষে চাইতে হবে না। তোমাদের রাস্তা তৈরির সব খরচ আমি দেব।"

রাখহরি হেঁটমুখে চুপ করে সব শুনলে, তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালে শঙ্করের দিকে। বললে, "হুঁ। তারিণী বলেছে, আমি কৃপণ কঞ্জুষ, আমি ছোটলোক, আমি চামার! কোন ভাল কাজে আমি একটা আধলা পয়সাও দেব না!"

শঙ্কর বললে, "এই দেখুন, আপনি চটে যাচ্ছেন।"

রাখহরি হঠাৎ যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। বললে, "হ্যাঁ, চটছি, নিশ্চয়ই চটছি। দেখ, তোমার ওই চামার ছোটলোক তারিণী মুখুজ্যেকে বলে দিও— না থাক। কিছু বলতে হবে না। তোমাকে পেয়েছে একটা কাজের লোক, তাই এ-সুযোগ ও হাতছাড়া করতে চায় না। কিছু টাকা খরচ করে তোমাদের দিয়ে ওই রাস্তাটা তৈরি করিয়ে নিয়ে খুব ঘটা করে একটা মিটিং করবে, সেই মিটিং-এর সভাপতি হবে এস-ডি-ও, আর না-হয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সেইখানে তোমাকে দিয়ে বলাবে—যে-কাজ রাখহরি ঘোষাল করতে পারেনি সেই-কাজ তারিণী মুখুজ্যে কারও কোন সাহায্য না নিয়েই করে ফেললেন। জনহিতকর কাজের জন্যে এত বড় স্বার্থত্যাগ, এ-রকম বদান্যতা—এই রকম সব বড় বড় কথা বলিয়ে রায়বাহাদুর, নয়ত রায়সাহেব হবার মতলব। ও-সব আমি বুঝি।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। এখন রায়বাহাদুর, রায়সাহেব নেই, এখন দিশী খেতাব চলবে।"

"ওই একই কথা। দেখ, তুমিই-না বলেছিলে—গাঁয়ে ভাল ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, বিনা চিকিৎসায় লোক মরে যায়—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে-কথা আমাকে বলতে হবে কেন, আপনি সবই ত জানেন।"

"জানি, সবই জানি।" রাখহরি বেশ দম্ভের সঙ্গেই বললে, "এবার ওই চামারটাকে ভাল করে জানিয়ে দেব—রাখহরি ঘোষাল ভাল কাজে খরচ করতে জানে। বলি ও হতভাগা তেরো, গ্রামের সব লোক যদি চিকিচ্ছে অভাবে মরেই

যায় ত তোর ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে কে? শোন, তোমাদের ওই রাস্তার ধারে আমার বিঘে-দশেক জায়গা আছে, ওইখানে আমি একটা ডাক্তারখানা—মানে হাসপাতাল করে দেব। তারিণী মুখুজ্যেকে দেখিয়ে দেব—রাখহরি ঘোষাল ভাল কাজে খরচ করতে পারে। রাখহরি ওর মতন মুখ্খু নয়।"

তারিণীর কানে গিয়ে কথাটা উঠল। শুনলে রাখহরি তাকে নাকি মুর্খ বলেছে।

রাখহরির এক পিসেমশাই ছিলেন বর্ধমানের উকিল। তাঁরই বাড়িতে থেকে রাখহরি বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল। এই তার অহঙ্কার। গ্রামের মধ্যে কলেজে-পড়া লোক একমাত্র রাখহরি। তার উপর বাঁকুড়ায় মামার বাড়িতে থেকে মেয়েটা তার আই-এ পাস করেছে।

সেদিক দিয়ে তারিণীর কিন্তু অহঙ্কার করবার কিছু নেই। নিজে যদি-বা ঘরের খেয়ে বেলমার ইস্কুলে পড়েছিল কিছুদিন, ছেলে কার্তিক আবার ইংরেজীতে নামটা পর্যন্ত সই করতে পারে না।

তারিণীর রাগ হল শুধু শঙ্করের কাছে কথাটা ফাঁস হয়ে গেল বলে। শুনে অবধি সে চেঁচাতে লাগল, "ওরে হতভাগা রেখো, গাঁসুদ্ধ সবাই ত মুখ্খু। পারিস সেই মুখ্খুদের লেখাপড়া শেখাতে? সে-কাজ রাখহরির হিম্মতে হবে না। হয় যদি ত, হবে এই তারিণী মুখুজ্যের পয়সায়। তাহলে শোন শঙ্কর, ছেলেদের ইস্কুল একটা আমাদের গাঁয়ে হবেই। আমি করব একটা মেয়েদেব ইস্কুল। তুমি যেখানে রয়েছ, আমার ওই বাগান-বাড়ির পাশে একতলা যে-বাড়িটায় আজকাল আমাব খামাববাড়ি, ওই বাড়িটা মেবামত করিয়ে রঙচঙ করে দিলেই ত বাস্, ফাস্টক্লাস ইস্কুল হয়ে যাবে। লাগাও তুমি এই কাজ। রাস্তাও তৈরি হোক, ওটাও চলুক।"

কয়েকদিন পবেই দেখা গেল, রাখহরি সত্যি-সত্যিই কাজ আরম্ভ করে দিলে তার ডাক্তারখানার। উত্তর দিক থেকে গ্রামে ঢুকতেই নতুন যে-রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তারই পাশে ভিত খোঁড়া হল। ভিত খোঁড়ার দিন সামান্য একটুখানি আয়োজন করেছিল রাখহরি। একজন পুরোহিত এল ভিতপুজো করবার জন্যে। জনগণের কল্যাণকামনায় উৎসর্গ কবা হল এই দাতব্য চিকিৎসালয়। রাখহরির মৃতা স্ত্রীর নামে নাম দেওয়া হল সরোজিনী সেবা-সদন।

জয়ার আজ আনন্দের সীমা নেই। লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ি পরেছে। মাথার চুল খোলা। সর্ব অঙ্গে তার শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা।

কার্তিক আছে রাস্তার কাজে। শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছে এইখানে। জয়া আজ শঙ্করের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছে—এইতেই তার আনন্দ।

পুজো শেষ হল। জয়া শাঁখ বাজালে।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। জয়া হাসতে হাসতে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর বললে, "আজ তোমাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছে। বেশ কেমন দেবদাসী-দেবদাসী মনে হচ্ছে!"

জয়া বললে, "রক্ষে করুন! মানুষের দাসী হতে পারি না, দেবতার দাসী! কী যেন বলেন!"

"না না সত্যি বলছি, কেমন যেন পূজারিণী-পূজারিণী ভাব।"

জয়া বললে, "যাক, আপনাকে আর সত্যি বলতে হবে না। আপনি মিথ্যের রাজা।"

শঙ্কর ভাবলে, জয়া রসিকতা করছে। সেও তেমনি হাসতে হাসতে বললে, "যাক, আজ একটা নতুন কথা শুনলাম।"

জয়া বললে, "আজ আপনাকে একটি প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে। করব? নেবেন আমার প্রণাম?"

"বাঃ রে, মিথ্যের রাজাকে প্রণাম করবে?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ, কবব। মিথ্যে দিয়ে আপনি একটা কাজেব মত কাজ করেছেন। কার্তিকের বাবাকেও বুঝি এমনি করে তাতিয়েছেন?"

শঙ্কর এবার হাসতে গিয়েও হাসতে পারলে না। বুদ্ধিমতী এই মেয়েটির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জয়া বললে, "না ও-রকম করে তাকাবেন না। ও-চাউনি আমি সহ্য করতে পাবি না।" বলেই সে মাথা নামিয়ে চট করে পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলে শঙ্করকে।

মাথার চুলগুলো ঝাঁপিযে পডেছিল মুখেব উপর, হাত দিয়ে চুলগুলো সবিযে জয়া উঠে দাঁড়াল।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "তুমি এ-সব জানলে কেমন করে?"

জয়া বললে, "বাবাব মনটা আমি তৈবি কবে বেখেছিলাম, তারপর আপনি এসে কাজ হাসিল করে ফেললেন।"

রাখহরিকে সেইদিকে আসতে দেখে শঙ্কর চুপিচুপি বললে, "চুপ। তোমার বাবা আসছেন।"

রাখহরি ডাকলে, "শঙ্কর, এইবার ডাক তোমার ছেলেদের। খাবার হয়ে গেছে। খেয়ে নিক।"

জয়া শঙ্করের কাছ থেকে সরে গেল না তার বাবাকে দেখে। বরং দিব্য সহজ কণ্ঠে বললে, "আপনাকে ডাকতে হবে না, আমি ডাকি।"

শঙ্কর বলে উঠল, "তুমি ডাকবে কেন?"

জয়া বললে, "গ্রামের ছেলেরা রাখহরির বাড়িতে খিচুড়ি মাংস খেয়ে এল—

তারিণীবাবুর কাছে এইটেই সাংঘাতিক খবর। তার উপর আপনি নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ালেন—এ-বদনাম আপনার হয় কেন? আমিই ডাকি।"

বলেই সে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে দাঁড়াল, বাবা না শুনতে পায় এমনিভাবে চুপিচুপি বললে, "কী মিথ্যে দিয়ে তারিণীবাবুর কাছে এইটেকে চাপা দেবেন ভেবে ঠিক করে নিন।"

জয়া যা বলেছিল ঠিক তাই হল।

হাসপাতাল না ছাই, ওষুধ বিক্রি করে লাভ করবার মতলবে রাখহরি ছোট একটা ডাক্তারখানা করবে হয়ত। তারই ভিত খোঁড়া হল। তা হোক। তাই বলে রাস্তা তৈরি করছে গ্রামের যে-সব ছেলে, তারা গিয়ে রাখহরির বাড়িতে পাতা পেতে খিচুড়ি আর মাংস খেয়ে এল—সে আবার কী রকম কথা? শঙ্কর রাজি হল কেমন করে?

নবদ্বীপ বললে, "আমি দাঁড়িয়েছিলাম তালপুকুরের কাছে। তা আমাকে একবার ডাকলেও না। মাংসটা খুব ভাল হয়েছিল, আবার শুনছি নাকি এক-একজনে এই এত-এত—"

শুনতে তারিণীশঙ্করের ভাল লাগছিল না। কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেতো খেয়েছে?"

নবদ্বীপ বললে, "না না, কার্তিক খাবে না রাখহরির বাড়িতে। তাই খেতে পারে কখনও?"

"কেন পারে না? হ্যাঁ বাবা, আমি খেয়েছি, শঙ্করদা খেয়েছে।"

বলতে বলতে কার্তিক এসে দাঁড়াল।

নবদ্বীপ বললে, "এই দেখ, একা তাহলে আমিই বাদ পড়লাম।"

শঙ্কর এল হাসতে হাসতে। বললে, "না, তুমি বাদ পড়বে না। এবার যেদিন পোলাও-মাংস খাওযাবে সেই দিন তোমাকে ডাকব। যাও দেখি তুমি এখান থেকে, একটু সরে যাও, আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে।"

এই বলে নবদ্বীপকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে শঙ্কর বললে, "বাছাধন এবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাখহরি ভেবেছে, রাস্তাটা তৈরি করিয়ে আপনি সরকার থেকে একটা খেতাব-টেতাব পেয়ে যাবেন। কাজেই সেও একটা-কিছু করতে চায়।"

"কী করবে?"

"বলছে ত—হাসপাতাল করব।"

তারিণী বললে, "হাসপাতাল করবার টাকা আছে?"

শঙ্কর বললে, "তা আমি কেমন করে বলব বলুন।"

তারিণী বললে, "কয়েক পাঁজা পোড়ানো ইঁট ওর আছে, শহর থেকে না-হয় সিমেণ্ট আনলে, লোহা আনলে, রাজমিস্ত্রী আনলে,—বিল্ডিং না-হয় হল। কিন্তু শুধু বিল্ডিং হলেই ত হবে না।"

"আজ্ঞে না, ওষুধপত্র চাই, ডাক্তার চাই, নার্স চাই—"

"মাসে মাসে কমপক্ষে—"

"পাঁচ হাজার টাকা ত চাই-ই।"

তারিণী বললে, "ওই টাকা ও খরচ করে যেতে পারবে?"

শঙ্কর বললে, "সরকারী সাহায্য ছাড়া এ-সব কাজ হয় না। আর না-হয় একসঙ্গে লাখ পাঁচেক টাকা কি লাখ-দশেক টাকা যদি সরকারের হাতে তুলে দেয়, তাহলে হতে পারে।"

তারিণী বললে, "ব্যাটা মরেছে।"

শঙ্কর বললে, "ওই জন্যেই ত যখন বললে—তোমাদের খাওয়াব, তখন আর বাধা দিলাম না। দু-দুটো বড় বড় খাসি কাটলে। ভাবলাম, ওর যত খরচ হয় ততই ভাল।"

তাবিণী খুব খুশী হল। বললে, "যত পার দাও খসিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "আপনার ত একবার খরচ করে দিলেই বাস্, আব খরচ করতে হবে না। আপনি শুধু দেখুন বসে বসে।"

তারিণী জিজ্ঞেস করলে, "আমার ইস্কুলের কী হল? মেয়েদের ইস্কুল?"

শঙ্কর বললে, "ভেবে দেখলাম ও-সব হবে না।"

"কেন হবে না? রাখহরি যে আমাকে মুখ্খু বলেছে!"

"বলুক মুখ্খু।" শঙ্কর বললে, "কে মুখ্খু দুদিন পরে বুঝতে পারবেন। রাখহরিবাবু হাসপাতাল করছেন, হাসপাতালে রুগীর অভাব হবে না। আব বেশি রুগী হওযা মানেই বেশি খরচ।"

তাবিণী বললে, "আমাব ইস্কুলে ছাত্রীর অভাব হবে না। আর বেশি ছাত্রী মানেই বেশি ইনকাম।"

শঙ্কর হেসে উঠল। বললে, "তার আগে ভেবে দেখুন—সব মেয়েরা ইস্কুলে আসবে না। যারা আসবে তারা অ আ ক খ জানে না। তাদের নিয়ে ইস্কুল খোলা চলে না। বড়জোর প্রাইমারি পাঠশালা একটা খুলতে পারেন।"

"তাও ত বটে!"

তারিণী বললে, "এ-কথা ত আমি ভাবিনি।"

"কাজেই সে-কথা এখন ভাবতে হবে না। আপনি রাস্তাটা আগে শেষ করুন। শহরের সঙ্গে এই গ্রামের যোগাযোগটা সহজ হয়ে যাক, তখন দেখবেন আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তারিণীর মনের মধ্যে কিন্তু একটা কথা খিচ্খিচ্ করতে লাগল।—"রাস্তার আগে রাখহরির ডাক্তারখানাটা যদি শেষ হয়ে যায়, আমার মাথাটা কিন্তু তাহলে হেঁট হয়ে যাবে।"

শঙ্কর বললে, "ওঁর ডাক্তারখানার ডাক্তার ত হেঁটে হেঁটে আসবে না। আপনার রাস্তার ওপর দিয়েই তাকে আসতে হবে গাড়িতে চড়ে।"

তারিণী কিন্তু শঙ্করের কোন কথাই শুনলে না। বললে, "তা হোক। তোমার শহরের রাস্তা যেমন হচ্ছে হোক, ওর ডাক্তারখানার কাজ যেমন চলছে চলুক, আমি 'তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়' তৈরি করবই।"

শঙ্কর বললে, "করুন। পাঠশালা হবে।"

"তা হোক।"

শঙ্কর বললে, "একজন মাস্টারনী ত চাই।"

"আসবে। কালই আমি কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেব।"

"এত দূরে গ্রামের চাকরি নিয়ে সহজে কেউ আসতে চাইবে না।"

তারিণী বললে, "বেশি টাকা মাইনের লোভ দেখাব। থাকা-খাওয়ার খরচ লাগবে না।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েদের মাইনে থেকে যা পাবেন তাতে আপনার মাস্টারনীর মাইনে দেওয়া চলবে না। নিজের বাড়ি থেকে দিতে হবে।"

"রাখহরি যদি একটা হাসপাতালের খরচ চালাতে পারে আমি একটা মাস্টারনীর মাইনে দিতে পারব না?"

"নিশ্চয়ই পারবেন।" বলে শঙ্কর সেখান থেকে সরে গেল। বাইরে অপেক্ষা করছিল কার্তিক। তার নিত্য-নতুন শখ। সে যখন নিতান্ত ছোট ছিল, তার বাবা তাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল শহরে। সেখানে কার্তিক দেখেছিল ছেলেরা ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। কার্তিক ঝোঁক ধরেছিল সে ওইরকম ব্যাণ্ড বাজাবে। তারিণী কিনে দিয়েছিল ব্যাণ্ড বাজাবার সাজ-সরঞ্জাম। পাড়ার ছেলেদের জড়ো করে খুব উৎসাহের সঙ্গে কিছুদিন ধরে কার্তিক খুব ঢাক পেটাল।

গত কয়েকদিন থেকে কার্তিকের শখ হয়েছে আবার ব্যাণ্ড-পার্টি গড়ে তুলবে। বোসবাগান ক্লাবে শঙ্করও এ-কাজ অনেক করেছে।

অবশ্য ব্যাণ্ড-পার্টি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যও একটা ছিল। নইলে শঙ্কর কখনও এ-ব্যাপারে সম্মতি দিত না। প্রতিদিন সকালে ছেলেরা যখন রাস্তা তৈরির কাজে বেরোয়, তখন দুজন ছেলেকে সারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ছুটে বেড়াতে হয়—প্রত্যেককে ডেকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করবার জন্যে। শঙ্কর বলেছিল, "এতে সময় নষ্ট হয় অনেক। রোজ রোজ তোমাদের ডাকতে হবে কেন?"

একটা ছেলে বলেছিল, "আমাদের কারও বাড়িতে ত ঘড়ি নেই যে, সময় দেখে বেরুব।"

কার্তিক বললে, "ঠিক আছে। কাল থেকে ব্যাণ্ডের বাজনা শুনলেই তোমরা বারোয়ারীতলায় এসে হাজির হবে।"

সেইদিন থেকে আবার ব্যাণ্ড-পার্টি তৈরি হল। প্রতিদিন সকালে আবার ব্যাণ্ড বাজতে লাগল।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে সারা গ্রামের ছেলেরা আর কুলি-মজুরেরা যখন সারি দিয়ে তালে তালে পা ফেলে কাজে যায়, দেখতে মন্দ লাগে না।

টাকা থাকলে সবই সম্ভব।

এদিকে রাস্তা এগিয়ে যাচ্ছে, ওদিকে রাখহরির হাসপাতালেব কাজ চলছে। আবার আর-একদিকে তারিণী আরম্ভ করে দিয়েছে বাড়ি মেরামতের কাজ। 'তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয' সে সবার আগে খুলে দেবে।

ময়নাবুনি গ্রামখানাই যেন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

গ্রাম থেকে বেরুতে হলে এখন আর জলকাদা ভাঙতে হয না। রেল-স্টেশন পর্যন্ত গাড়ি-চলার পথ একরকম শেষ হয়ে গিয়েছে। রাস্তাটা এখন চলেছে শহরের দিকে এগিয়ে।

রাস্তার সুখে কিনা কে জানে, তারিণী আর রাখহবি—দুজনেই ট্রেনে চড়ে ঘন ঘন শহরে যেতে লাগল। পাছে একই দিনে গেলে ট্রেনে কি শহবে মুখোমুখি দেখা হযে যায়, তাই একদিনে দুজনে কখনও যায় না। তারিণী যেদিন যায, রাখহরি সেদিন বাড়িতে থাকে; আবার রাখহরি যেদিন যায, তাবিণী সেদিন গ্রাম ছাড়ে না।

একদিন দেখা গেল, তারিণীর খামাব-বাড়ির চেহারা গিয়েছে বদলে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়ির বড় বড় খানচাবেক ঘর চুনকাম করা হয়েছে, দরজা-জানলায় রঙ দেওয়া হয়েছে। ছুতোব-মিস্ত্রীরা চেয়ার-বেঞ্চি তৈরি করছে। আর সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো রঙিন একটি সাইন-বোর্ড। তাতে বড় বড অক্ষরে লেখা—'তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়'।

শঙ্কর একদিন তারিণীকে জিজ্ঞেস করলে, "গ্রামের সবাইকে বলেছেন—মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাবাব কথা?"

তারিণী বললে, "তুমি বলেছিলে সবাই হয়ত মেয়ে পাঠাবে না। কিন্তু আমি কি দেখলাম জান? ইস্কুলটা দু বেলা বসাতে হবে। প্রত্যেকটি বাড়ির ছোট-বড় সব মেয়ে ত আসবেই, এমন-কি, বাড়ির বউ যারা, ছেলেমেয়ের মা যারা—তারাও বলছে লেখাপড়া শিখবে।"

শঙ্কর বললে, "তবে আর কি! এবার তাহলে একজন মাস্টারনী যোগাড় করুন। কলকাতার দুটো বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিন।"

তারিণী দুখানা খবরের কাগজ বের করে দেখালে।

"এই দেখ, বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছি। আরও তিনটে রবিবার বেরুবে। রাখহরির হাসপাতালের আগে আমাকে এই ইস্কুল খুলতেই হবে।"

"খুলুন।"

শঙ্কর চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তারিণী তার হাতখানা টেনে ধরলে। যেতে দিলে না। বললে, "কেমন? আমি তাহলে একাই সব করতে পারি?"

শঙ্কর বললে, "তা পারেন।"

"হেঁ-হেঁ, বল সেই কথা।"

অর্থাৎ তিনি যে একজন করিতকর্মা মানুষ, অপরের সাহায্য ছাড়াই সব কাজ করতে পারেন, রাখহরি তার তুলনায় নিতান্ত অর্বাচীন, এই কথাটাই বারংবার শুনতে চান।

শঙ্কর মনে মনে হাসলে। বললে, "নিশ্চয়ই। আপনার মত মানুষ—সত্যি বলছি, আমি আর দেখিনি।"

ভারি খুশী হল তারিণী। বললে, "তবে হ্যাঁ, তুমি যদি না আসতে আমাদের গ্রামে, তাহলে, হয়ত এইরকম কাজ করবার—ইয়ে, মানে ইয়েটা পেতাম না।"

থাক, আর নিজের প্রশংসা শুনে কাজ নেই। শঙ্কর আবার চলে যাচ্ছিল। তারিণী আবার বললে, "শোন।"

শঙ্কর ফিরে দাঁড়াল।

তারিণী বললে, "তোমাদের সাহায্য ছাড়া রাখহরি এক পা এগোতে পারবে না। সাহায্য কর, মানে বুঝতে পেরেছ?"

বলেই চোখ টিপে একটুখানি হেসে চুপিচুপি বললে, "মোটা রকমের কিছু দাও খসিয়ে! হাসপাতাল করার ঠ্যালাটা বুঝুক।"

"সে-কথা আর বলতে হবে না। আপনি শুধু দেখুন বসে বসে।"

"আমার আগে যেন কিছু না হয়!"

শঙ্কর বললে, "তাই হয় কখনও! এই ত সবে বাড়ির ছাত পড়ছে।"

"তা হলেও খুব তাড়াতাড়ি করলে ব্যাটা।"

শঙ্কর বললে, "টাকাটা কীরকম খরচ হচ্ছে দেখুন!"

কথাটা শুনে তারিণী সে-এক অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল। পৈশাচিক আনন্দের হাসি।

শঙ্কর সেদিন রাস্তায় কাজ করছিল, রাখহরি এসে দাঁড়াল তার কাছে।

বললে, "তোমার সঙ্গে আজকাল দেখাই হয় না, তাই একবার এলাম তোমার কাছে।"

শঙ্কর বললে, "দেখা না হলেও আপনার সব খবরই আমি রাখি।"

"কী খবর রাখ, কই, বল ত শুনি!"

শঙ্কর বললে, "এই যেমন ধরুন, আপনি ঘন ঘন শহরে যাচ্ছেন।"

রাখহরি বললে, "কী জন্যে যাচ্ছি তা ত জান না?"

"আজ্ঞে না, তা কেমন করে জানব বলুন!"

"তাহলে শোন, ওই ছাতিম গাছটার তলায় একটু বসি গিয়ে।"

এই বলে রাখহরি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের ছায়ায় নিজেও বসল, শঙ্করকেও বসালে। বললে, "তোমাকেই বলছি, এ-কথা আর-কাউকে যেন বোল না।"

শঙ্কর বললে, "না, বলব না। তবে আপনার সন্দেহ যদি হয় ত বলবেন না।"

রাখহরি তবু বললে। বললে, "তখন ত ঝোঁকেব মাথায় বলে বসলাম—হাসপাতাল করব। তারপব জয়া আমাকে একদিন জিজ্ঞেস কবলে, হাসপাতাল করবাব মত টাকা তোমার আছে বাবা? সেই দিন যেন চৈতন্য ফিবে এল। সত্যিই ত, এ আমি করছি কী! গেলাম শহরে আমার চেনা একজন উকিলের কাছে। মন্মথ উকিল, খুব নাম-কবা বড উকিল। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ করে সরকারী সব বড় বড় অফিসারদেব সঙ্গে তাঁব খুব দহরম-মহরম। প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, বলেছিলেন—হাসপাতালটা সরকারের হাতে তুলে দিতে পারেন কি না, দেখবেন বলে-কয়ে। তারপর যাই আব ফিবে আসি—তাঁর সময়ই হয় না। পরশু গিযে দেখি—মন্মথবাবুব ছেলেব জন্মদিন। বাড়িতে লোকজন দেখে ফিরে আসছিলাম, মন্মথবাবু বললেন, বসুন। বসিযে খুব খাওয়ালেন প্রথমে। খাইয়ে বললেন, ব্যবস্থা সবই কবেছি। সরকাবের হাতেই তুলে দিতে পারব। কী করতে হবে আর-একদিন এসে জেনে যাবেন। কিন্তু তার আগে এখান থেকে সিভিল সার্জেন নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "আসবেন কেমন কবে? ট্রেনে চড়ে?"

রাখহরি বললে, "সে-কথাও বললাম। কিন্তু স্টেশন থেকে গরুর গাডিতে আসতে হবে শুনে বললেন, না, তা হবে না। বলেই তিনি জিজ্ঞেস কবলেন, আপনার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট তারিণীবাবু যে-রাস্তাটা তৈবি করাচ্ছিলেন, সেটা শেষ হবে কবে? বললাম, শেষ হয়ে এসেছে, আব বেশি দেবি নেই। মন্মথবাবু বললেন, তবে আর কী? শেষ হলে জানাবেন। আমরা সবাই মিলে গিয়ে দেখে আসব মোটরে চড়ে। এই বলে তারিণীর প্রশংসায় মন্মথবাবু একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনিও ত

প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, কিন্তু দেখুন, উনি কেমন একটা কাজের মত কাজ করলেন। সত্যি বলতে কী, আমি সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, আপনি জানেন না তাই তারিণীর প্রশংসা করছেন। তারিণী কিছু করেনি। করেছে শঙ্কর। মন্মথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, শঙ্কর কে? আমি বললাম তোমার সব কথা। মন দিয়ে সব শুনলেন তিনি। আমি বললাম, ভারী সুন্দর ছেলে। যদি দেখতে চান ত আমি একদিন নিয়ে আসব এখানে। যাবে?"

শঙ্কর বললে, "যেতে পারি। রাস্তাটা আগে শেষ হোক।"

এই বলেই শঙ্কর উঠে যাচ্ছিল। রাখহরি বললে, "দাঁড়াও, আসল কথাটাই ত এখনও বলা হল না। মন্মথবাবুর ছেলের জন্মদিনে তাঁর এক শালীর ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে। সাহেবী-পোশাক-পরা বড়লোকের ছেলে। খুব মন দিয়ে তোমার কথাগুলো শুনলে। তারপর আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, কী নাম বললেন? শঙ্কর? শঙ্কর মুখার্জী? বললাম, হ্যাঁ। বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা—গুণ্ডার মত দেখতে, কপালে একটা কাটা দাগ আছে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু গুণ্ডা কী বলছেন? সুন্দর, সুপুরুষ। ছোঁড়াটা তার মুখটা বেঁকিয়ে আমাকে ভেংচি কেটে বললে, সুন্দর! সুপুরুষ!—কোত্থেকে সে এসেছে বলতে পারেন? বললাম, জানি না। কোনদিন জিজ্ঞেস করিনি। ছোঁড়াটা বললে, জিজ্ঞেস করলেও বলবে না। শঙ্কর ফেরারী আসামী। কলকাতা থেকে পালিয়ে এইখানে এসে জুটেছে। কত লোককে খুন করেছে, কত লোকের টাকা মেরেছে। আমারই ত হাজার চার-পাঁচ মেরে দিয়েছে। আমি ওকেই খুঁজছিলাম। ভালই হল, সন্ধান পেয়ে গেলাম।

"বললাম, বেশ ত। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। গিয়ে দেখুন—যাকে খুঁজছেন, এ-লোকটি সেই লোক কি না। আমার বাড়িতে থাকবেন, আপনার কোনও কষ্ট হবে না। আমি শঙ্করের সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেব। দেখেশুনে আবার কাল চলে আসবেন।

"অনেক করে বললাম। কিছুতেই এল না। বললে, যাব একদিন নিশ্চয়। তবে এখন নয়।"

"বললাম, আপনার নামটি বলুন। গিয়ে বলব শঙ্করকে।

"তখন কী বললে জান? বললে, না না, এখন কিছু বলবেন না। এই যে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে এ-কথাটাও এখন চেপে যাবেন। আমার নাম শুনলেই পালাবে ওখান থেকে।

"এই বলে ছোঁড়াটা উঠে গেল সেখান থেকে। দেখলাম, বেশ খানিকটা দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে লাগল। পাইপ টানবার জন্যেই বোধ করি মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে চলে গেল।

"মন্মথবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আত্মীয়?

"মন্মথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার এক শালীর ছেলে। আমার ছেলের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কাল এসেছে। ওর কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না। টাকাকড়ি বেশ রেখে গিয়েছিল বাপ। এরই মধ্যে প্রায় শেষ করে আনলে।

"জিজ্ঞেস করলাম কী নাম? মন্মথবাবু বললেন, নরেন।"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি।"

"চেন তাহলে?"

শঙ্কর বললে, "খুব চিনি।"

তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালযের কাজকর্ম সব শেষ হযে গিয়েছে। দুখানা ঘরে সারি সারি বেঞ্চি পাতা হয়েছে, হাই বেঞ্চি পাতা হযেছে, চেয়া· টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড—যেখানে যেমনটি প্রয়োজন, সেইখানে ঠিক তেমনটি সাজানো। এমন কি, নতুন শিক্ষিকা যিনি আসবেন, তাঁর থাকবার ঘর, রান্নার জাযগা, খাট-বিছানা, আসবাবপত্র—এমন কি. জলেব কুঁজোটি পর্যন্ত ঠিক করে বেখেছে তারিণী।

এবার মাস্টারনী এলেই হয়!

দবখাস্ত এসেছে অনেকগুলো। এখনও আসছে। ব -নম্বর দেওয়া হযে-ছিল। খবরের কাগজের আপিস থেকে তাডা তাড়া দবখাস্ত পাঠিযে দিচ্ছে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওযা হয়েছে। তবু দরখাস্ত আসবার বিরাম নেই।

দরখাস্তের তাড়াটা শঙ্কবের হাতে তুলে দিয়ে তারিণী বললে, "এই দেখ কত দরখাস্ত। এর ভেতর থেকে বেছে বেছে জনচাবেক মেযেকে আসতে বল। তাদেব মধ্যে যে ভাল হবে তাকে বেছে নিও। একদিনে ত আসতে বলবে না। কাজেই সময় লাগবে।"

চিঠির কাগজও ছাপিয়েছে তাবিণী। 'তারিণীশঙ্কব বালিকা বিদ্যালয়' ছাপা কাগজের একটি প্যাড আর চারটি খামও দিয়ে দিলে শঙ্করেব হাতে।

কতকগুলো দরখাস্ত বাংলায় লেখা, কিন্তু বেশিব ভাগ ইংরেজীতে। সেদিক দিয়ে শঙ্করের একটু বিপদ আছে। হাতে করে নিলে দরখাস্তের তাড়াটা। নিয়ে চলে গেল রাস্তার কাজে।

কার্তিককে বললে, "তুই কাজ দেখ, আমি ততক্ষণ এইগুলো দেখি।" বলেই শঙ্কর গিয়ে বসল বাস্তার ধাবে সেই ছাতিম গাছের তলায়।

দরখাস্তগুলো শঙ্কর উল্টেপাল্টে দেখলে। বাংলায় লেখা দরখাস্ত যে-

কটি ছিল পড়ে ফেললে। ইংরেজীতে লেখাগুলো যে একেবারে পড়তে পারলে না তা নয়। সবই প্রায় একই রকম লেখা। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি-এ পাস-করা সবরকম মেয়েই আছে। কী রকম মেয়ে আসবে কে জানে! দরখাস্তের পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ তার ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ল। লেখাপড়া-জানা মেয়েগুলো অহঙ্কারী হয়—এই ছিল তার ধারণা। কিন্তু জয়াকে দেখে সে-ধারণা তার বদলে গিয়েছে।

জয়ার কথা মনে হতেই শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। কার্তিককে বললে, "আমি আসছি। চিঠি আজকে ডাকে না দিলে দেরি হয়ে যাবে।"

রাখহরির বাড়ি গিয়ে হাজির হল শঙ্কর।

চাকর বললে, "বাবু বাড়ি নেই।"

কিন্তু বাবুর কাছে সে যায়নি। গিয়েছে যার সন্ধানে, তার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও শঙ্কর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছিল। বললে, "একটা দোয়াত আর কলম দিতে পারিস?"

চাকরটা বললে, "দিদিমণির কাছে আছে। চেয়ে আনব?"

"দিদিমণি কী করছে রে?"

"সেলাই করছে।"

শঙ্কব বললে, "আচ্ছা, আমি ওই ওপরের ঘবে বসি, তুই গিয়ে চুপি চুপি বল—শঙ্করবাবু একটা দোয়াত-কলম চাইলে।"

চাকরটা ভিতরে চলে গেল।

যে-ঘরখানা তাকে দেওযা হযেছিল শঙ্কর সেই ঘরে গিয়ে দেখলে, সব তেমনই আছে, শুধু তার খাট থেকে বিছানাটা তুলে রাখা হয়েছে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শঙ্কব চুপ কবে বসল।

চাকরটা ফিরে এসে খবব দিলে, "দিদিমণি বললে দোয়াত-কলম নেই।"

এ-রকম জবাব শঙ্কর আশা করেনি। ভেবেছিল, তার নাম শুনলে সে নিজেই ছুটে আসবে। লজ্জায় সে আব মুখ তুলতে পাবলে না। দরখাস্তেব ফাইলটা নাড়াচাড়া কবতে করতে ভাবছিল, এখানে আসা বোধ হয় তার উচিত হয়নি।

চাকরটাকে বললে, "দিদিমণিকে বলিস আমি চলে গেছি।"

"বলতে হবে না। আমি এসেছি।"

বলতে বলতে জয়া এসে দাঁড়াল। এসেই প্রথমে ভোলা চাকরকে বললে "যা তুই ঠাকুরের কাছে যা।"

শঙ্কর সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে বসেছিল, জয়াকে দেখতে পায়নি।

জযা বললে, "তা আসাই বা কেন, চলে যাওয়াই বা কেন? দোয়াত-কলম আমার সত্যিই নেই। এই নিন।"

বলে জয়া তার দামী ফাউণ্টেন-পেনটি শঙ্করের হাতের কাছে নামিয়ে দিলে।

শঙ্কর বললে, "তা এতই দয়া যখন করলে তখন আর একটু দয়া তোমাকে করতে হবে। এই চেয়ারটায় বোস, বলছি।"

"দাঁড়িয়েও শুনতে পাব। বলুন।"

শঙ্কর বললে, "জানতে এসেছিলাম, তোমার বাবা কবে শহরে যাবেন।"

"সে কথা আমার চেয়ে আমার বাবা ভাল জানেন।"

"তাহলে তোমার বাবা যখন আসবেন তখনই আসব। আজ চলি।"

জয়া বললে, "কিন্তু বাবার শহরে যাওয়ার সঙ্গে দোয়াত-কলমের সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন?"

শঙ্কর বললে, "আমার চোখটা খারাপ হয়েছে। শহরে গিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়ে চশমা নিতে হবে। অথচ এই দেখ তারিণীবাবু এই ফাইলটা আমাকে দিলেন। বললেন, এর ভেতর থেকে চারটি মেয়েকে পছন্দ করে একজন একজন করে আসতে লিখে দাও। তোমার কাছে দোয়াত-কলম চেয়ে পাঠিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। ফাইলটা উলটে দেখি ঠিকানাগুলো ঠিক পড়তে পারছি না।"

জয়া বললে, "বুঝেছি। তারিণীবাবুর মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারনীদের ফাইল।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে ত মেয়েরা আসবার আগে চশমা আপনার নিশ্চয়ই চাই।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েরা আসবার আগে বলছ কেন?"

জয়া বললে, "মেয়েদের পছন্দ করবার ভারটাও ত আপনারই উপর পড়বে। চশমা ছাড়া তাদের ভাল করে দেখতে পারবেন না ত!"

শঙ্কর ঈষৎ হেসে জয়ার মুখের দিকে তাকালে।

শঙ্করের হাসিটি বড় চমৎকার!

মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত জয়া তার উদ্যত ফণা গুটিয়ে নিলে। চেয়ারটা টেনে তার উপর ভাল করে চেপে বসে বললে, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেল। আপত্তি যদি না থাকে ত আপনার হাতের ওই ফাইলটা একবার দেখতে চাই।"

এইটিই শঙ্কর চাইছিল। ফাইলটি তৎক্ষণাৎ তার হাতে তুলে দিয়ে বললে, "চারটে মেয়ে এর থেকে দাও না বেছে!"

"শুধু নাম আর হাতের লেখা দেখে? কিন্তু জানেন ত, ঝাঁটার মুড়োর মত চুল, নাম কিন্তু মণিকুন্তলা। পেত্নীর মত চেহারা, নাম জয়ারানী—"

আর কী যেন সে বলতে যাচ্ছিল, শঙ্কর বললে, "এটা ভুল বললে। জয়ারানীর নাম হওয়া উচিত ছিল বিজয়িনী।"

জয়া শুধু একবার তার আয়ত চোখ দুটি শঙ্করের মুখের দিকে তুলেই আবার নামিয়ে নিলে। বললে, "কাজ নেই বাবা, আমি শুধু নাম আর বিদ্যের বহরটা বলে যাব। আপনি পছন্দ করুন।"

বলেই জয়া একে একে বলে যেতে লাগল।

"আরতি সান্যাল। আই-এ। হাতের লেখা বিশ্রী। চলবে না। সুমতি ঘোষ। বি-এ। হাতের লেখা মাঝামাঝি, ভালও নয়, মন্দও নয়। কী করব বলুন!"

শঙ্কর বললে, "উল্টে যাও, আরও আছে।"

জয়া আবার বললে, "জ্যোতির্ময়ী ঘোষ। ম্যাট্রিকুলেশন। বিশ্রী হাতের লেখা। মমতা পাকড়াশী। আই-এ। চলবে না। সুলেখা বোস। দেখুন দেখুন। নাম সুলেখা, অথচ হাতের লেখার ছিরি দেখুন।"

এই বলে ফাইলটা শঙ্করকে দেখাতে গিয়েও দেখালে না। বললে, "ওহো, আপনি যে চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। শুনুন, আবার পড়ি। মীরা দাসী। বি-এ। হাতের লেখা ভাল। দাসী চলবে?"

শঙ্কর বললে, "দাগ দাও।"

ফাউণ্টেন-পেনটি খুলতে খুলতে জয়া আবার বললে, "দাসী চলবে! দাগ দিলাম। তারপর, সবিতা সরকার। ম্যাট্রিক। নাঃ, চলবে না। শঙ্কবী চট্টোপাধ্যায়, বি-এ। একে আপনার মনে ধরা উচিত। শঙ্কর, শঙ্করী, মুখোপাধ্যায় আর চট্টোপাধ্যায়।"

শঙ্কর বললে, "না, চলবে না। উল্টে যাও।"

জয়া হাসতে হাসতে বললে, "শুনুন শুনুন, বিধুমুখী মিত্র। ধেৎ, বিধুমুখী নাম ভাল নয়।"

শঙ্কর বললে, "দেখ জয়া, দরকার মাত্র একটি মেয়ের। পডাবে ত অ আ ক খ। যাকে হোক আসতে লিখে দাও। ভাল না হয়, বিদেয় করে দেব। তাবপব আর-একজনকে ডাকব।"

জয়া বললে, "অসম্ভব। মেয়েদেব বিদেয় করা অত সহজ নয়। আপনি ত পারবেনই না। আমি পারি।"

শঙ্কর বললে, "তোমাকে ইস্কুলের সেক্রেটারি করে দেব।"

"তারিণীবাবুব ইস্কুলের আমি হব সেক্রেটারি? আপনার বদনামের আর কিছু বাকী থাকবে না।"

জয়া বললে, "আবার পড়ি, শুনুন। সৌদামিনী রক্ষিত। না। এই দেখুন, এ-নামটা পডাই যাচ্ছে না। তারপর বানীবালা বোস, জ্যোৎস্না ঘোষ। শুধু নামগুলো পড়ে যাচ্ছি। প্রণতি মুখার্জী। অপর্ণা নন্দী। সুবর্ণ বিশ্বাস। ইন্দ্রাণী দেবী। নন্দিতা—"

শঙ্কর বললে, "এইটা কী নাম বললে?"

"নন্দিতা শ্রীমানী।"

"না না, তার আগে।"

জয়া বললে, "সুবর্ণ বিশ্বাস, অপর্ণা নন্দী, ইন্দ্রাণী দেবী।"

শঙ্কর বললে, "ইন্দ্রাণী দেবী? পদবী নেই?"

জয়া বললে, "না। আই-এ পাস। হাতের লেখাটি মন্দ নয়।"

"ঠিকানা?"

জয়া বললে, "কালীঘাট, কোলকাতা।"

শংকব বললে, "বাস্, হযে গেছে। একেই আসতে লিখে দাও।"

তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালযেব ছাপা প্যাড আর একটি খাম জয়াব হাতেব কাছে বাড়িযে ধরে শঙ্কব বললে, "সাত দিন সময় দিয়ে, আসছে ববিবার সকালের ট্রেনে আসতে লিখে দাও।"

"কে লিখবে? আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি।"

"আমাব হাতেব লেখা খুব খারাপ।"

"তুমি ত চাকরিব দরখাস্ত কবছ না।"

জয়া হেসে জিজ্ঞেস করলে, "বাংলায়, না ইংরিজীতে?"

শঙ্কব বললে, "বাংলায়। রাত্রি নটার হাওড়া ছেড়ে, [illegible] স্টেশনে ট্রেন বদলাবে এক ঘণ্টা পবে, তাবপব সাবা রাত ট্রেনে এসে সকালে নামবে তোমাদেব এই স্টেশনে। গরুব গাড়ি থাকবে। তাইতে চড়ে সোজা চলে আসবে তোমার কাছে। আমি সেদিন কোথাও পালাব। তুমি দেখেশুনে আলাপ-পবিচয় কবে ঠিক কবে বাখবে। আমি চুপি চুপি এসে জেনে যাব চলবে কিনা। যদি চলে ত নিযে যাব তাব আস্তানায়, যদি না চলে ত এইখান থেকেই বিদেয় করে দেব।"

জয়া বললে, "বেশ ত বলে গেলেন গড গড করে! তারপব বাবা যখন শুনবে মেয়েটি তারিণী মুখুজ্যেব ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তখন?"

শঙ্কর বললে, "উনি কিছু বলবেন না। তুমি বলবে শঙ্কর আমাকে বলেছে। তাব আগেই আমি তোমাব বাবাকে সব বলে বাখব।"

চিঠিখানা জয়া লিখতে আরম্ভ কবলে।

শঙ্কব তখন ভাবছে-কে এই ইন্দ্রাণী? ঠিকানা লিখেছে কালীঘাট। আই-এ পাস। এতদিনে আই-এ পাস কবা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে সুদূব এই পাড়াগাঁযে সে চাকরি করতে চাইবেই-বা কেন? সুন্দবী ওই যুবতী মেয়েকে মা তাব একা একা এই পল্লীগ্রামে থাকবার জন্যে ছেড়েই-বা দেবে কেন? সে ইন্দ্রাণী নয় হয়ত। হয়ত-বা ওই নামের আর-একটি মেয়ে। কালীঘাট অঞ্চলে থাকে। টাকা-পয়সার অভাবে আর বেশিদূর

হয়ত পড়তে পারেনি। সংসারে অভাব অত্যন্ত বেশী। আই-এ-পাস মেয়ে খাওয়া-থাকার খরচ লাগবে না, তার ওপর দেড়শ টাকা মাইনে পাবে। এর জন্যে সবরকম বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করতে পারে—সেরকম দরিদ্র মেয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে বড় কম নেই। কিন্তু সত্যই যদি তার সেই ইন্দ্রাণী হয়? জীবনের রহস্য বোঝা ভার। জীবন-দেবতা হয়ত-বা আবার এক নতুন খেলা খেলতে চান তার সঙ্গে।

জয়ার চিঠি লেখা শেষ হল। খামের উপর ঠিকানাটা লিখে জয়া খামখানি শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "নিন। আপনার সেক্রেটারির কাজ করলাম। চিঠিখানা পড়ে দিতে হবে নাকি?"

শঙ্কর বললে, "না।"

বলেই হঠাৎ তার কি মনে হল, বললে, "ঠিকানাটা পড় ত।"

জয়া পড়লে, "শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী। তিন নম্বর গোবিন্দ সেন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।"

মনে মনে হাসলে শঙ্কর। ছি ছি, নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল সে? ঠিকানা ত আলাদা! এক নামের দুটি মেয়ে কি কালীঘাটে থাকবে না? এক পাড়ায় থাকা ত দূরের কথা, অনেক সময় এক-বাড়িতে থাকে।

শঙ্কর যেন নিশ্চিন্ত হল।

চিঠিখানি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে শঙ্কর ভাবলে, ভালই হল, ইন্দ্রাণী থাক তার অহঙ্কার নিয়ে। যে-জীবন সে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে এসেছে তার আর জের টেনে লাভ নেই। ইন্দ্রাণী তার জীবনে এসেছিল যেন অভিশাপ হয়ে। ইন্দ্রাণীকে খুশী করবার জন্যই তাকে মিথ্যাচার করতে হয়েছিল। তারই জন্য তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মা তার আত্মহত্যা করেছে শুধু তারই জন্যে। সুতরাং ভালই হয়েছে—এ-ইন্দ্রাণী তার বিয়ে-করা ইন্দ্রাণী নয়।

শঙ্কর আবার তার রাস্তা তৈরির কাজে লেগে গেল।

কিন্তু সেদিন থেকে ইন্দ্রাণীর চিন্তা যেন তাকে নিষ্কৃতি দিলে না।

দিবারাত্রি সে শুধু ইন্দ্রাণীর কথা ভাবে। রূপলাবণ্যবতী রাজেন্দ্রাণীর মত সদ্যোবিবাহিতা সেই তন্বী-তরুণী সব-কিছুকে আড়াল করে তার চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। জ্বালাময়ী সে বহ্নিশিখা তাকে যেন ঠিক পতঙ্গের মত টানতে থাকে।

কয়েকদিনের মাত্র কয়েকটি ছোট্‌খাটো ঘটনার স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তার জীবনে। বিয়ের রাতের সেই শুভদৃষ্টি। সেই দুটি আয়ত চোখের রহস্যময় এক অপরূপ সৌন্দর্য! বিদ্যুতের মত একটি মুহূর্ত মাত্র। চোখ সে লজ্জায় নামিয়ে নিয়েছিল তক্ষুনি। কিন্তু আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সে দুটি চোখ। কথা কয়েছিল। হেসেছিল।

বিবাহের পর, বাসরে ভেবেছিল পরিচয় হবে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর বন্ধুরা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। শুধু চোখে চোখে দেখা, আর চোখে চোখে কথা।

পরের দিন কুশণ্ডিকা।

সেদিনও শুধু একটুখানি স্পর্শের রোমাঞ্চ।

তারপর ঝিলপাড়ার সেই ভাড়া-বাড়িতে তাদের বোঝাপড়া। উদ্যতফণা ভুজঙ্গিনীকে বশ মানানো সারারাত ধরে।

বশ কি সে সত্যই মেনেছিল?

বোধহয় না।

যেটুকু মেনেছিল, সেটুকু শুধু তার গায়েব জোরে।

ইন্দ্রাণীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিল, ইন্দ্রাণী কিন্তু তার সে ভালবাসা গ্রহণ করেনি।

তাকে সে বোঝাবার সময়ও পায়নি, বুঝতে পারেওনি।

ইন্দ্রাণী যদি তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে না যেত, তাব মা তাহলে এমন কবে আত্মহত্যা করত না। তাব এই সর্বনাশের জন্য ইন্দ্রাণীই দায়ী।

অনুতপ্ত হয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত তার অশৌচ অবস্থায় ইন্দ্রাণীব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল। বলেছিল, তুমি যেমনটি চাও আমি তেমনি হব। তাবই কাছে সে আত্মসমর্পণ কবেছিল। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যাকে সে ভালবাসতে চায়, সেই তাবই কাছে চেয়েছিল একটুখানি মনের আশ্রয়।

ইন্দ্রাণী তখন তাকে নিষ্ঠুবভাবে তাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

শঙ্কর বলেছিল, "আমি তোমার স্বামী।"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "স্বামীব পরিচয় আপনাকে দিতে হবে না। আপনি যান।"

কিন্তু কী বিচিত্র মানুষেব মন! সেই ইন্দ্রাণীব কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। শিক্ষয়িত্রীদেব দরখাস্তেব ভিতর থেকে কোথাকাব কে-এক ইন্দ্রাণীর নামটি শোনবামাত্র জয়াকে বললে, আর-সবাইকে বাদ দিয়ে তুমি একেই আসতে বল। এরও বাড়ি কালীঘাট শুনে শঙ্কবের প্রথমে স্থিব বিশ্বাস হয়েছিল—এ তারই সেই ইন্দ্রাণী। তারপর নিশ্চিন্ত হল ঠিকানা দেখে।

যে-ইন্দ্রাণী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে আর-একটিবার শুধু দেখবার আগ্রহ শঙ্কর দমন কবলে। যে তার স্বামিত্বের দাবি স্বীকাব করেনি, তাকেই-বা সে স্ত্রীর অধিকার দেবে কেন?

সে যে-ইন্দ্রাণীই হোক, তার সঙ্গে শঙ্করের কোনও সম্বন্ধ নেই।

মন থেকে ইন্দ্রাণীর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শঙ্কর সেদিন রাখহরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে, "শহরে যাবেন বলেছিলেন, যাবেন না?"

"হ্যাঁ, শুনছিলাম ডাক্তারকে তুমি চোখ দেখাতে যাবে।"

"কোথায় শুনলেন?" জিজ্ঞেস করলে শঙ্কর।

"জয়া বলছিল।"

শঙ্কর বললে, "হ্যাঁ চলুন, রবিবার সকালে যাই। ভোরেব ট্রেনে।"

"সেই ভালো। চোখ দেখিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব আমার সেই উকিল-ভদ্রলোকের বাড়িতে।"

কথাটা শঙ্করেব মনে ছিল না। বললে, "কেন?"

রাখহরি বললে, "মনে নেই? সেই যে কি নাম বললে! বীবেন না কি, তোমার চেনা সেই ছোঁড়াটা—"

শঙ্কর বললে, "নবেন।"

"হ্যাঁ, তাকে দু' কথা বেশ কবে শুনিয়ে দিযে এস। হতভাগা যা-তা বলছিল তোমার নামে।"

"ঠিক বলেছেন। চলুন।"

শঙ্কর বললে বটে, কিন্তু নবেনের সঙ্গে দেখা কববাব ইচ্ছা তার ছিল না। পুরনো দিনের অপ্রীতিকর স্মৃতি সে তার মন থেকে মুছে ফেলতেই চায। কিন্তু বহস্যময় সে অদৃশ্য জীবন-দেবতাব এ কী বিচিত্র খেলা কে জানে।

শঙ্কর ভয পেল না। বললে, "তাহলে এই কথা রইল। রবিবাব আপনি ঠিক হয়ে থাকবেন। শেষ রাত্রে আমি আপনাকে এসে তুলে নেব।"

রাখহবির সঙ্গে শহরে এল শঙ্কর।

"চল তোমাব চোখেব ডাক্তারের কাছে আগে যাই।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, আগে চলুন আপনার উকিলের বাড়ি। আদালতে চলে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

রাখহরি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, "আজ রবিবার। ভুলে গেলে নাকি?"

কিছুই সে ভোলেনি। বললে, "তাহলে চলুন. আপনার আর-একটা কাজ সেরে নিন আগে। সিভিল সার্জেনের বাড়ি চলুন। এই কাজটাই সবচেয়ে বড় কাজ।"

রাখহরি বললে, "তোমার চোখ দেখানোর কাজটা বুঝি সবচেয়ে ছোট কাজ? আচ্ছা শঙ্কর—"

বলেই সে তার পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললে, "নিজের কাজটা বুঝি কাজই নয়? তুমি পরের কাজ করতে এত ভালবাসো!"

"পরের কাজ কোন্‌টা বলছেন?"

"আমাদের গ্রামে এসে অবধি যা তুমি করছ?"

শঙ্কর বললে, "কিছুই ত করিনি। যা করছেন আপনারাই করছেন।"

রাখহরি বললে, "আমরা পুরুষানুক্রমে বাস করছি এই গ্রামে। কিন্তু কই, এতদিন ত করিনি! এ-মন তুমি কোথায় পেলে?"

"আমার মায়ের কাছে।"

মার কথা মনে হতেই শঙ্করের চোখ দুটো জলে ছল ছল করে এল। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ কবে নিয়ে বললে, "এ আমার মার আদেশ।"

"সে মা বুঝি তোমার মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বাবা?"

"তাবও আগে। তাঁকে আমাব মনেও পড়ে না।"

কথাটা বলেই শঙ্করের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এমন গম্ভীব হল যে, রাখহরি সে-মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কথা বলতে ভরসা পেলে না।

শহবের যে-পথ ধরে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল, সে-পথে লোকজন কম। একদিকে বড় বড় বাড়ি। আর একদিকে প্রকাণ্ড একটা পার্ক, পার্কের ধাবে ধাবে বড় বড় গাছ, আর গাছের ছায়ায় বেঞ্চি পাতা।

রাখহরি বললে, "খেযে এসে তোমাব সঙ্গে আমি হাঁটতে পারছি না শঙ্কর। এস এই বেঞ্চে একটু বসি।"

"বসুন।"

দু'জনেই বসল। শঙ্কবের কোনও কাজ নেই। সে শুধু পালিয়ে এসেছে ময়নাবুনি থেকে। পালিযে এসেছে তারিণীশঙ্কব বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর ভয়ে। ইন্দ্রাণী যাব নাম। জয়াব ওপব ভার দিযে এসেছে তাকে আদব-অভ্যর্থনা করবার। এতক্ষণ সে এসে গেছে নিশ্চয়ই। কোন্ ইন্দ্রাণী কে জানে!

চিন্তায় বাধা পড়ল।

রাখহরি কি যেন বলবার জন্য অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল। শঙ্কব বুঝতে পারলে। মনে হল সেইজন্যই সে বসল। হাত বাড়িযে আবার রাখহরি তাব কাঁধের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলে, "আপনাব বলতে কেউ নেই, না?"

শঙ্কর বললে, "না।"

রাখহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

শঙ্কর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

রাখহরি বললে, "তোমার মত আমার যদি একটা ছেলে থাকত!"

অস্বস্তি যেন আরও একটু বাড়ল শঙ্করের। এ আবার কি কথা?

স্নেহের কাঙাল মন মানুষের একটুখানি স্নেহের আশ্রয় চায় বৈকি!

কিন্তু আশ্চর্য তার মনের গঠন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, সে-হাত ধবতে গিয়ে মনে হল যেন তার হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে। কিসের এ কুণ্ঠা?

শঙ্কর তার মনের কাছ থেকে কোনও জবাবই পেলে না।

রাখহরি জিজ্ঞেস করলে, "বিয়ে-থা করে সংসারী হতে তোমার ইচ্ছে করে না শঙ্কর?"

"থাক ও-সব কথা। চলুন।"

এই বলে শঙ্কর উঠতে যাচ্ছিল, রাখহরি তাব হাতটা ধরে ফেললে। বললে, "বল। তোমাকে বলতেই হবে।"

শঙ্কর বললে, "একটা পয়সা যে রোজগার করে না, তার আবার সংসারী হওয়া! চলুন যাই।"

"ধর, রোজগারের কথা তোমাকে যদি ভাবতে না হত, তাহলে ইচ্ছে করত কিনা, তাই বল।"

"আচ্ছা, এ-কথা জানবার আগ্রহ আপনার কেন হল বলুন ত? বেশ ত আছি আমি। আপনাবা সবাই আমাকে ভালবাসেন—"

কথাটা শঙ্করকে শেষ করতে দিলে না বাখহবি। বললে, "তোমার যদি মত থাকত, তাহলে জয়াব সঙ্গে তোমাব আমি বিযে দিতাম।"

শঙ্কর চমকে উঠল কথাটা শুনে। অবাক হয়ে একটুখানি থেমে মুখ তুলে চাইল। বললে, "একটি ছেলে শুনেছিলাম বিলেত গেছে, ফিরে এলে জয়ার বিযে হবে।"

"ঠিকই শুনেছিলে। কিন্তু সে-ছেলে আর এসেছে! এক বছর পরে ফিরে আসাব কথা। আজ তিন বছব হল এল না। বাপের কাছে এখন আর টাকাও চায় না, চিঠি-পত্রও লেখে না।"

"আসবে, আসবে। আপনি ভাববেন না। উঠুন।"

রাখহরি আবার তাকে টেনে বসিয়ে দিলে। "তুমি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ আমার কথাটা। তুমি আমাকে বল। আমি নিশ্চিন্ত হই।"

শঙ্কর ম্লান একটু হাসলে। হেসে বললে, "দু-চারদিন আমাকে ভাববাব সময় দিন।"

"তা বেশ, তুমি আমাকে ভেবেই বলো!"

এই বলে রাখহরি উঠল। শঙ্করও উঠল।

রাখহরি বললে, "শহরে যদি বাস করতাম, এতটা ভাবতাম না। কিন্তু আমাদের গ্রামের সমাজ—কত রকমের কত কথা আমার কানে আসে, আমি গ্রাহ্যই করি না।"

শঙ্কর দু-চারদিন সময় চাইলে ভেবে দেখবার। ভাবনা কিন্তু তার মনে তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিয়ে সে করতে চায়নি। মা যদি তার বিয়ের কথা না তুলত, আর বস্তির সেই মেয়েটির মোটর-ড্রাইভার মামা যদি তাব মাকে অপমান না করত, তাহলে বিয়ে হয়ত সে করত না। ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করে তার কম শিক্ষা হয়নি। আবার বিয়ে? জয়া চমৎকার মেয়ে, স্নিগ্ধ একটি দীপ-শিখার মত, ইন্দ্রাণীর মত উগ্র নয়। কিন্তু কি জানি হয়ত ছাই-চাপা আগুনের মত—দপ করে জ্বলে উঠতেই-বা কতক্ষণ! বিয়ের পর যাচাই করে বাজিয়ে যখন দেখতে চাইবে,—দেখবে, যাকে সে বিয়ে কবেছে সে লেখাপড়া জানে না, এক পয়সা রোজগার করে না, তখন সেও ঠিক ইন্দ্রাণীর মত তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবে কিনা, তাই-বা কে জানে!

আবার হয়ত ভালও হতে পাবে। মেয়েদেব সঙ্গে কতটুকুই-বা তাব পরিচয়! এমনও হতে পারে, জয়া হযত ভিন্ন ধাতুতে গড়া। হয়ত-বা দোষ-গুণ সমেত গোটা মানুষটাকে সে ভালবাসতে জানে।

মেয়েদের ভালবাসা অসাধ্য সাধন করতে পারে। স্বামীকে মনের মত কবে গড়ে তুলে এই পৃথিবীতে সুখেব স্বর্গ রচনা করা তাব দ্বারাই সম্ভব।

শঙ্করের চিন্তায় বাধা পড়ল। রাখহরি বললে, "এই ত সরকারী বড় ডাক্তাববাবুব কোয়ার্টার। আমি একবার দেখা করে আসি। তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর।"

অপেক্ষা অবশ্য বেশিক্ষণ কবতে হল না। সুখবব নিযে ফিরে এল রাখহবি। বললে, "তোমাব বাস্তাটা শেষ হতে আব ক'দিন লাগবে শঙ্কর?"

শঙ্কর বললে, "আমরা ত এখন গরুব গাড়ি চলবার রাস্তাটাব কাছে এসে পড়েছি। সেইটেকে পাকা কবে শহরে যাবাব বাস্তাটাব সঙ্গে মিশিয়ে দেব। তাহলেই আমাদের কাজ শেষ।"

"সেটা কতদিনে হবে?"

শঙ্কর বললে, "তা মাসখানেক লাগতে পারে।"

রাখহরি বললে, "তাহলেই এই শহর থেকে সোজা মোটর গাড়ি চলে যাবে আমাদের গ্রামে। কি বল?"

"জিপগাড়িগুলো এখনও যেতে পারে।"

রাখহরি বললে, "না, রাস্তাটা শেষ হোক। আমারও ত সময় চাই।

বাড়িটা শেষ করে ওষুধপত্র দিয়ে সাজিয়ে চারটে বেডের ব্যবস্থা করে সরকারের হাতে তুলে দেব। সেই ব্যবস্থাটাই উনি করে দেবেন বললেন।"

এই বলে রাখহরি শঙ্করকে নিয়ে গেল সেই উকিলের বাড়িতে। ভদ্রলোক সমাদর করে বসালেন তাদের।

শঙ্করকে দেখিয়ে রাখহরি বললে, "এরই কথা হচ্ছিল সেদিন। এরই নাম শঙ্কর।"

হাত তুলে শঙ্কর নমস্কার করলে। মন্মথবাবু নমস্কার করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শঙ্করের মুখের দিকে। শুধু মুখের দিকে নয়, সুগঠিত সুন্দর তার সারা দেহের দিকে। তারপর বললেন, "বাঃ! চমৎকার! আপনার কথা সব শুনেছি আমি।"

শঙ্কর একটুখানি হাসলে। হাসিটি আরও সুন্দর!

মন্মথবাবু তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

শঙ্কর বললে, "শুনেছেন কার কাছ থেকে?" রাখহরিকে দেখিয়ে বললে, "এঁর কাছ থেকে, না আপনার আত্মীয় পাকপাড়ার নরেনের কাছ থেকে?"

মন্মথবাবু বললেন, "আরে দূর, দূর, ওটা হচ্ছে গিয়ে একনম্বরের বখাটে ছোকরা। একটা সত্যি কথা বলে না, মস্ত চালিয়াৎ। বড়লোকের একটি মাত্র ছেলে, টাকাকড়ি দু হাতে ওড়াচ্ছে আর চাল মেবে মেরে বেড়াচ্ছে। ওর কথা বিশ্বাস করতে আছে? রামঃ!"

রাখহরি বললে, "একবার ডাকুন না তাকে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

মন্মথবাবু বললেন, "সে কি আছে নাকি এখানে? পরের দিনই পালিয়েছে কলকাতায়। আবার একদিন হুট করে এসে হয়ত হাজির হবে। নতুন একটা মোটরবাইক কিনেছে, আমাকে বলে গেল, তাইতে চড়ে একদিন সোজা কলকাতা থেকে এখানে এসে বাইকটা আমাকে দেখিয়ে যাবে।"

শঙ্কর বললে, "আসুক, তারপর একদিন আসব।"

"আসতে পারেন, কিন্তু কখন আসে তার ত কোনও ঠিকঠিকানা নেই। আর এলে যে আপনাকে খবর দেব তারও কোনও ব্যবস্থা নেই।"

রাখহরি বলে উঠল, "আমার ঠিকানায় একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিতে পারেন।"

"সে পোস্টকার্ড আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, তারপর উনি আসবেন ততদিন সে থাকবে বুঝি?"

শঙ্কর বললে, "মোটরবাইক নিয়ে আসবে ত! বলবেন—যাও, ময়নাবুনি গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এস।"

"যাবার রাস্তা কোথায়?"

রাখহরি বললে, "রাস্তা ত হল বলে। ওইটিই ত শঙ্করের কীর্তি। ডাক্তারবাবু সোজা এখান থেকে মোটর নিয়ে যাবেন আমাদের গ্রামে। আমার ডাক্তারখানা দেখে আসবেন। সেদিন কিন্তু আপনাকেও যেতে হবে।"

"আমার সময় হবে কি?" মন্মথবাবু বললেন।

শঙ্কর বললে, "সময় একটু করে নেবেন। সেইদিন শহর থেকে প্রথম মোটর গাড়ি যাবে ময়নাবুনি গ্রামে। ডাক্তারখানা, রাস্তা, মেয়েদের ইস্কুল—আপনাদের মতন মানুষের পায়ের ধুলো না পড়লে—"

রাখহরি তার কথাটা যেন লুফে নিলে। বাঃ, বেশ কথা বলেছে ত শঙ্কর। কথাটা তারই বলা উচিত ছিল।

বললে, "না না, আপনার কোনও কথা শুনব না। আমি নিজে এসে আপনাদের নিয়ে যাব। আপনি না থাকলে আমার ডাক্তারখানার কোনও ব্যবস্থাই হত না।"

শঙ্কর বললে, "নরেন যদি সেদিন আসে ত খুব ভাল হয়।"

"তারিখটা আমাকে আগে জানাবেন। আমি নরেনকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেব। তবে সত্যি কথা বলতে কি, সে-ছোঁড়াটার আসা আমি পছন্দ করি না। বুঝলেন?" এই বলে মন্মথবাবু হাসতে লাগলেন। শঙ্করও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, "আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।"

"আচ্ছা তাই বলব।" মন্মথবাবু বললেন, "নরেন তোমাকে যে-সব কথা বলেছে, সে-সব তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি।"

মন্মথবাবু বললেন, "তার জন্যে তুমি যেন মন খারাপ কোর না। ছোঁড়াটা অমনিই। কারও ভাল দেখতে পারে না। যেই শুনেছে তুমি এখানে এসে একটা কাজের মত কাজ করছ, বাস্, অমনি যা-তা বলতে লাগল তোমার নামে।"

"আপনার চেয়ে আমি বোধহয় ওকে ভাল করে চিনি। আজ তাহলে আসি। নমস্কার।"

শঙ্করকে বোধহয় মন্মথবাবুর খুব ভাল লেগেছিল। বললেন, "শহরে এলেই এখানে এস যেন।"

"আসব।"

রাখহরি বললে, "চল এবার তোমার চোখের ডাক্তারের কাছে যাই।"

"চলুন।" বলে শঙ্কর বাইরে বেরিয়ে এসেই বললে, "না থাক। আজ আর ডাক্তারের কাছে যাব না।"

"না না, ও কি কথা? চোখকে কখনও অবহেলা করতে নেই।"

শঙ্কর বললে, "অবহেলা করছি না বলেই যাচ্ছি না। গেলেই এখুনি

চশমার ব্যবস্থা করে দেবে। আর একবার যদি চশমা পরি, চিরজীবন ধরে পরতে হবে। তার চেয়ে দেখি যদি এমনিই সেরে যায়।”

রাখহরি বুঝলে তার যুক্তিটা। মন্দ বলেনি। চশমা ব্যবহার না করেও ত অনেকের সেরে যায়।

রাখহরি জিজ্ঞেস করলে, “তাহলে এখন আমাদের কী কাজ?”

“স্টেশনে যাওয়া।” শঙ্কর বললে, “বিকেলের ট্রেনটা যদি ধরতে পারি তাহলে রাত্রি আটটা নাগাদ আমরা বাড়ি পেঁাছতে পারব।”

আটটায় পেঁাছতে পারলে না অবশ্য। ন'টা বাজল।

পল্লীগ্রামের রাত্রি ন'টা মানে সব চুপচাপ।

চুপচাপ নয় শুধু ময়নাবুনি শক্তিকেন্দ্র। মানে তারিণীশঙ্করের বাগান-বাড়িটা। শঙ্কর আর কার্তিকের আস্তানা।

রাখহরির গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াল তার বাড়ির দরজায়। শঙ্কর কিন্তু তার আগেই নেমে গেছে। রাখহরির অনুরোধ সত্ত্বেও তার বাড়িতে সে আসেনি। বলেছে, “খেতে দেরি হলে ওঁরা রাগ করেন।”

রাগ অবশ্য কেউ করে না। অ্যালুমিনিয়ামের একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে শঙ্করের খাবার বাগান-বাড়িতে দিয়ে যায়। আজকাল কার্তিকের খাবারও আসছে সেখানে। আসবার অবশ্য কারণ আছে। দুজনে একসঙ্গে বসে খাবার লোভ শুধু নয়, লোভ আর-একটা জিনিসের। মুরগী বা মুরগীর ডিম তারিণীশঙ্করের বাড়ির ত্রিসীমানায় যাবার জো নেই। অথচ এখানে ও-সবের দাম খুব সস্তা। স্টোভ জ্বালিয়ে কার্তিক নিজের হাতে রান্না করে শঙ্করের সঙ্গে বসে বসে খায়।

সেদিনও কার্তিক সেই ব্যবস্থাই করেছিল। ঘরের ভিতর একটা হ্যাজাক জ্বলছে। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো টিম টিম করে জ্বলে বলে কার্তিক একটা ‘হ্যাজাক’ আনিয়েছে শহর থেকে।

সেই হ্যাজাকের আলো জানলার পথে রাস্তায় এসে পড়েছে। মনে হল যেন কার্তিক একা নেই, তার সঙ্গে আরও লোকজন রয়েছে। শঙ্কর কিন্তু বাগান-বাড়ির ফটকটা পেরিয়ে এসে তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থম করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চৌকাঠের কাছে। ঘরে কার্তিক নেই, হ্যাজাকের সুতীব্র আলোকে স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা গেল, বসে রয়েছে মাত্র দুজন স্ত্রীলোক—একজন রাখহরির কন্যা জয়া, আর একজন তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নবাগতা শ্রীমতী ইন্দ্রাণী।

শঙ্কর যা ভেবেছিল ঠিক তাই। এবার আর তার কোনও সন্দেহই রইল না।

সেই ইন্দ্রাণী! পরনে কালো চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, তেমনি কালো

পাড়-দেওয়া সাদা ব্লাউজ। মাথায় একমাথা চুলের এলো খোঁপা। পায়ে স্লিপার। গয়না বলতে হাতে মাত্র দুগাছা চুড়ি, কানে দুটি হীরের মত সাদা পাথর।

ইন্দ্রাণীকে যেন আগের চেয়েও বেশী পরিচ্ছন্ন, আগের চেয়েও বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছে। এত সুন্দরী যেন তার না হলেও চলত।

শঙ্করকে দেখেই জয়া বলে উঠল, "এই নিন আপনার ইন্দ্রাণী দেবী। বেশ লোক যাহোক! আমার ওপর বোঝাটি চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেমন সরে পড়লেন!"

সর্বনাশ! ইন্দ্রাণী কি তাহলে সবকিছু বলে দিয়েছে নাকি?

শঙ্কর তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

কিন্তু সে-ভুল তার ভাঙতে দেরি হল না। জয়া বললে, "এঁরই কথা বলছিলাম। ইনিই শঙ্করবাবু।"

ঘরে ঢোকবার সময়েই একবার সে শঙ্করকে দেখে নিয়েছে। জয়ার কথাটা শুনে আর-একবার চোখ তুলে তাকালে।

চোখে চোখ পড়ে গেল এতক্ষণে। ইন্দ্রাণীর দুটি কালো চোখের উপর পড়ল শঙ্করের দুটি চোখ।

ইন্দ্রাণী চোখ নামিয়ে নিলে। শঙ্করও বাধ্য হল চোখ ফিরিয়ে নিতে। বিদ্যুতের মত একটা শিহরণ যেন তার সর্বাঙ্গে বয়ে গেল।

কিন্তু কেন? যে-মেয়ে তার সমস্ত অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাকে দেখে তার কেন এ চঞ্চলতা? টেবিলের উপর মেয়েদের দরখাস্তের ফাইলটা পড়ে ছিল, শঙ্কর সেইটে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মনে হল তার হাতের আঙুলগুলো যেন কাঁপছে।

হঠাৎ তার পায়ের উপর হাত পড়তেই শঙ্কর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখলে, ইন্দ্রাণী তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে।

হাতটি মাথায় ঠেকিয়েই আবার সে জয়ার পাশে গিয়ে বসল।

জয়া বললে, "কেমন করে দরখাস্তের জবাব দেওয়া হয়েছিল বললাম ওকে। সুন্দর সুন্দর নাম দেখে দেখে—"

বলতে বলতে জয়ার সে কী হাসি!

হাসতে হাসতে বললে, "ইন্দ্রাণী নামটাই ওঁর পছন্দ হল সবচেয়ে বেশী। যেই শোনা আর বললেন—বাস্ একেই আসতে বল।"

ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সেদিকে না তাকিয়েই শঙ্কর বললে, "দুজনের বুঝি খুব ভাব হয়ে গেছে।"

হাসির ধমক তখন একটু থেমেছে জয়ার। বললে, "হ্যাঁ। খুব।"

শঙ্করের মুখে কিন্তু হাসি নেই। ইন্দ্রাণীও কী যেন ভাবছে।

জয়া ইন্দ্রাণীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "আ-মর্। গোমড়া মুখ করে বসে আছে দ্যাখ! কী ভাবছ?"

ইন্দ্রাণীর মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। এ যেন হাসতে হয় বলে হাসা।

জয়া বললে, "জানেন শঙ্করদা, গরুর গাড়িতে জীবনে এই ও প্রথম চাপলে। গাড়ি থেকে যখন এসে নামল, ভেবেছিলাম, আমারই মতন হবে হয়ত ধিঙ্গী এক কুমারী মেয়ে। ও মা! দেখি—না, সিঁথিতে সিঁদুর। এত সুন্দর মুখ, কিন্তু কী গম্ভীর রে বাবা! কথা কইতে ভয় করছিল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ খুললে। মা মারা গেছে। ছোট একটি ভাই আছে—কলেজে পড়ছে, তার খরচ পাঠাতে হয়। টাকার খুব দরকার, তাই চাকরির জন্যে এই দূর পাড়াগাঁয়ে এসেছে। আর কি বলছিল জানেন শঙ্করদা?"

শুনতে শুনতে শঙ্কর বোধকরি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। নীচের দিকে মুখ করে মিছেমিছি ফাইলের পাতাগুলো তখনও সে উল্টে চলেছে। বললে, "উঁ?"

ইন্দ্রাণী হাত বাড়িয়ে চুপি চুপি জয়ার গায়ে একটা ঠেলা মারলে।

জয়া কিন্তু তার বারণ শুনলে না। বললে, "বলছিল, চাকরিটা আমার হবে ত ভাই?"

"তুমি কী বললে?"

বললাম, "ভারী ত চাকরি! ধাড়ি ধাড়ি মেয়েদের অ আ ক খ পড়াতে হবে। চাকরিটা তোমারই বরং পছন্দ হলে হয়!"

শঙ্কর মুখ না তুলেই বললে, "হুঁ।"

জয়ার কথা বোধকরি তখনও শেষ হয়নি। বললে, "শঙ্করদা সেরকম মনিব নন। চাকরি তোমার হবে।"

শঙ্করের ইচ্ছে করছিল, জয়াকে জিজ্ঞেস করে—সে তার দাদা হল কখন থেকে? কিন্তু ইন্দ্রাণীর সামনে সে-কথা জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছেটা দমন করে বললে, "মনিব আমি কেন হব? মনিব তারিণীবাবু।"

জয়া বললে, "থামুন। সে-কথা আর কাউকে বলবেন। কেন? একে বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? আর একটা নাম খুঁজে বের করে দেব? দিন ফাইলটা।" বলেই সে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, "সেই থাকমণি দাসী না কি নাম একটা দেখেছিলাম যেন।"

বাইরে জানলার কাছে ভজু এসে দাঁড়াল। ডাকলে, "দিদিমণি!"

সবাই তাকালে সেইদিকে। ভজুর এক হাতে লাঠি, এক হাতে একটা লণ্ঠন। বললে, "বাবু আমাকে পাঠালেন দিদিমণি। বাড়ি চল।"

"হ্যাঁ, যাই," বলে জয়া উঠল, "আমি কেমন বসে বসে গল্প করছি দ্যাখো!

ওদিকে বাবা এসে বসে আছে। শঙ্করদা, আপনি যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, আমি করে দিয়েছি। এবার আমার ছুটি।”

এই বলে জয়া উঠে দাঁড়াল।

শঙ্কর এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালে জয়ার দিকে। বললে, “ওঁর থাকবাব জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ?”

“হ্যাঁ, সব—সব দেখিয়েছি। কিন্তু শেযালের ডাক শুনে উনি চমকে চমকে উঠছেন। ওখানে—ওঁর ওই কোযার্টাবে উনি থাকবেন কেমন করে একা একা?”

শঙ্কর বললে, “বিশু হালদারের মেয়েটাকে রেখে দেব ওঁব কাছে। দুবেলা দুটি খেতে পেলেই কাজকর্ম করে দেবে। বেচারাব কেউ কোথাও নেই।”

জযা বললে, “আপনি সব ঠিক করেই বেখেছেন তাহলে। আজ চলি।”

“হ্যাঁ যাও।” শঙ্কর বললে, “শত্রুশিবিবে এসেছ। বাবা একজন দারোয়ান পাঠিয়েছেন লাঠি হাতে দিয়ে। ওঁকে আজ তোমার কাছে নিয়ে গিয়েই বাখ।”

জয়া বললে, “তবে কি ভেবেছেন ওকে আপনাব কাছে ছেড়ে দিয়ে যাব?”

এই বলে সে এক অদ্ভুত হাসি হেসে ইন্দ্রাণীর হাত ধরে বললে, “এস।”

যেই তাবা বেরিযে যাবে, দোবেব কাছে কার্তিক এসে তাদের পথ আটকে দিলে। “এ কী ব্যাপার? জয়ারানী আমাদের এখানে?”

“কেন? তোদের এখানে আসতে নেই নাকি?”

কার্তিক ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। হাত জোড় করে একটি নমস্কার করলে। বললে, “ও বুঝেছি। আপনিই বুঝি আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়ে এলেন?”

জয়া বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ। এলেন। হাঁ করে আর দেখতে হবে না, কাল দেখবি। পথ ছাড়।”

লজ্জিত হল কার্তিক। বললে, “যাঃ! আচ্ছা ফাজিল মেয়ে ত।”

পথ ছেড়ে দিয়ে শঙ্কবের কাছে এসে বললে, “শঙ্করদা, জয়াটা কী। ওই বুঝি মাস্টারনী?”

“হ্যাঁ।”

কার্তিক জিজ্ঞেস করলে, “দরখাস্তের সঙ্গে ফটো পাঠিয়েছিল নাকি?”

শঙ্কর বললে, “না।”

“বেশ বেছেছ ত।” কার্তিক বললে, “খেযে নাও, আর দেরি কেন?”

“দে। আমি চট করে হাতমুখ ধুয়ে নিই।”

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে শঙ্কর উঠে দাঁড়াল।

স্টোভে-চড়ানো মাংসের বাটিটা কার্তিক টেবিলের উপর রাখলে। বললে, "দেখলে? একটা জিনিস দেখতে ভুলে গেলাম।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "কী?"

"জয়াটা ভাল করে দেখতেও দিলে না। সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা দেখলাম না।"

এতক্ষণ পরে শঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, "আছে।"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি। আমাদের কোনও আশা নেই।" বলেই হো হো করে হেসে উঠল শঙ্কর।

তারিণীশঙ্কর বিদ্যামন্দির (বালিকা বিদ্যালয়) খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মুরুব্বি-মাতব্বরদের ডেকে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল খোলবার আগে। গ্রামের লোকসংখ্যা কম নয়। সবাই এসেছিল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল বালিকা বিদ্যালয়ের সুমুখের রাস্তা দুটো। নেহাত যারা আসবার নয়, তারা ছাড়া গ্রামের মেয়েরাও উঁকিঝুঁকি মারছিল এদিক-ওদিক থেকে। সেটা অবশ্য সভা দেখবার জন্য নয়। সবাই শুনেছিল, মেয়েদের পড়াবার জন্যে একজন মাস্টারনী এসেছে কলকাতা থেকে। সে নাকি লেখাপড়া-জানা খুব সুন্দরী মেয়ে।

সভা কেমন করে করতে হয় তাও জানে না এখানকার কেউ। শঙ্করকেই সব আয়োজন করতে হল। সভাপতি করা হল তারিণীশঙ্করকে। শঙ্করের ইচ্ছে ছিল রাখহরিকে প্রধান অতিথি করে। রাখহরি কিছুতেই রাজি হল না। বললে, "জয়া ত রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা তোমাদের ওই মাস্টারনীর সঙ্গে। জয়া যাবে তাইতেই হবে। আমি আর নাই-বা গেলাম।"

শঙ্কর বললে, "একটিবার গিয়ে ঘুরে আসবেন।"

তাই হল। শঙ্করের অনুরোধ এড়ান শক্ত। হুঁকো টানতে টানতে রাখহরি এল একবার। বালিকা বিদ্যালয়টা ঘুরে ফিরে দেখলে। পাছে তারিণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন চাষীকে করে দেওয়া হল প্রধান অতিথি। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তারিণীশঙ্করের পাশে লোকটি কিছুতেই চেয়ারে বসতে চাইলে না। তারিণীশঙ্করের পাশে দুখানি চেয়ারে বসল ইন্দ্রাণী আর জয়া।

আবার আর-এক বিপদ বাধল। শঙ্কর যখন তারিণীশঙ্করকে বললে, "আপনি কিছু বলুন। বলতে হয়।"

সর্বনাশ! গলাটা কাঠ হয়ে এল ভদ্রলোকের। এমন জানলে এ-সব হাঙ্গামা সে করতেই দিত না শঙ্করকে।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে হল। কিছু বলতেও হল। তবে ভরসা এই যে, সবাই গ্রামের লোক।

থেমে থেমে অতিকষ্টে তারিণীশঙ্কর বললে, "আমাদের এ গ্রামের চেহারা এখন একদম বদলে গেছে। আগে যারা এসেছে তারা দেখে আর চিনতে পারবে না। কিন্তু কেমন করে হল? কে করলে? তুমি করলে? তোমার ব্যাটা করলে? আমি করলাম? রাখহরি করলে? না, কেউ করেনি। করলে এই শঙ্কর। কোত্থেকে এল কেউ জানি না। কেন এল তাও জানি না। জিজ্ঞেস করলে কিছুতেই বলে না। ওকে যেন ভগবান পাঠিয়ে দিলেন আমাদের গ্রামে। এত সুন্দর ছেলে আমরা কখনও দেখিনি। ও আমাদের নিজের ছেলের চেয়েও বেশী।"

সবাই একসঙ্গে সায় দিয়ে উঠল।

তারিণীশঙ্কর বললে, "সারা গাঁয়ের লোককে সে আপনার করে নিয়েছে। ভগবানের কাছে দিনরাত তার মঙ্গল কামনা করছি। আমি আর কিছু বলতে পারছি না।"

প্রধান অতিথি হরি মোড়ল মাটিতে উবু হয়ে বসে বসে সব শুনছিল। বয়স তার সত্তর পার হয়ে গিয়েছে। মাথার চুলগুলো সব সাদা। মুখে একটিও দাঁত নেই। তারিণীশঙ্কর বসতেই সে উঠে দাঁড়াল। বললে, "তারিণী-বাবু যা বললেন তা ঠিক। আমি একটি কথা বলছি—ঠিক কিনা তোমরা বল। শঙ্করের দেশ যেখানেই হোক, আমরা তাকে এখান থেকে যেতে দেব না। আমরা সারা গাঁয়ের লোক চাঁদা করে তার ঘরবাড়ি করে দেব, জমি-জায়গা দেব, বিয়ে দেব—দিয়ে এই গাঁয়ে রেখে দেব। আমি তার বাড়ি তৈরি করবার সব খরচ দেব। তোমরা কে কী দেবে তাই বল।"

তারিণীশঙ্কর প্রথমেই বললে, "আমি দেব পঁচিশ বিঘে জমি।"

হরি মোড়ল বললে, "বাড়ি তৈরী ছাড়াও আমি দেব দশ বিঘে জমি।"

আর একজন বলল, "আমি দেব দু'বিঘে।"

"আমি এক বিঘে।"

"আমি এক বিঘে।"

এমনি করে কেউ এক, কেউ দুই, কেউ তিন বলতে বলতে যখন পঞ্চাশ বিঘের ওপর জমি দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল—শঙ্কর নিজে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললে, "আপনারা থামুন। বাড়িঘর জমি-জায়গা আমি চাই না। আমি চাই আপনাদের স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্বাদ। এইটিই আমি চেয়েছিলাম, আর তা আমি পেয়েছি। বিষয়-সম্পত্তি বাড়িঘর নিয়ে আমি কী করব? আমি একা।"

এই বলে সে একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়েই বসে পড়ল। তীরটা যাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে তার বুকে ঠিক লেগেছে কিনা বোধকরি একবার দেখতে চাইলে। ইন্দ্রাণী তখন মাথা হেঁট করে বসে আছে। মুখখানা ভাল দেখা গেল না।

ছেলেদের ইস্কুলটা ত সরকারী পয়সায় বড় হবেই, মেয়েদের ইস্কুলটাও শেষ পর্যন্ত বাদ যাবে না, তবে এখন যেমন চলছে চলুক।

এ যুগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা একান্ত প্রয়োজন, তাই গ্রামের প্রায় সকলেই তাদের মেয়েদের পাঠালে। ছোট ছোট মেয়েগুলো ত এলই, এমনকি বড় মেয়েরাও আসতে লাগল। বড় মেয়েরা যত-না এল পড়তে, তত এল ইন্দ্রাণীকে দেখতে আর তার সঙ্গে কথা বলতে, গল্প করতে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সাধারণত রেখে-ঢেকে কথা বলতে জানে না। এক-একজন ত ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে, "ও মা, এ যে দেখছি মাথায় সিঁদুর রয়েছে! তা কর্তাটি ছেড়ে দিয়েছে, না আছে এখনও?" এক-একজন এমন কথা বলে যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ইন্দ্রাণীর।

প্রথম কয়েকদিন জয়া অধিকাংশ সময় তার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকত। ইন্দ্রাণী ভেবেছিল, শঙ্কর শুধু সেই জন্যেই তার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। নইলে নিশ্চয়ই সে আসত। তাই জয়া যেদিন বলেছিল, "আজ রাত্রেও তোর কাছে থাকতে ইচ্ছে করছে ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণীর সত্যিই ভয় হয়েছিল মনে-মনে। বলেছিল, "তুই কি আমাকে আগলে রাখতে চাস নাকি?"

জয়া হেসেছিল। বলেছিল, "তা যেরকম রূপ নিয়ে জন্মেছিস, বিশ্বাস করব কেমন করে? তার ওপর বলছিস যখন কত্তাটির সঙ্গে তোর রাগারাগি হয়েছে—"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "নজর দেবার মত কেউ আছে নাকি তোদের গাঁয়ে?"

"পাশেই ত রয়েছে একজন।"

সে যে শঙ্করের কথা বলছে সে-কথা বুঝতে ইন্দ্রাণীর দেরী হয়নি। বলেছিল, "যাঃ।"

জয়া বলেছিল, "আর যাই করিস, দেখিস যেন ওইখানে নজর দিস না।"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "কেন? তোর বুঝি আগেই নজর পড়ে গেছে।"

জয়া বলেছিল, "ভারি শক্ত ঠাঁই। একবার ফিরেও তাকায় না।"

কথাটা শুনে খুশিই হয়েছিল ইন্দ্রাণী।

কিন্তু সেদিন ইস্কুলের মিটিংএ শঙ্করের কথা শুনে তার সব আশা যেন নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

হালদারদের যে-মেয়েটিকে বেখে দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রাণীর কাছে, তার ডাক-নাম টুনু। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, রং ময়লা, চেহারাটা ঠিক ভালও বলা চলে না, আবার নেহাত মন্দও নয়। কিন্তু বেচারার অদৃষ্টটা বড় মন্দ। সে-বছর গড়গড়ির মেলায় তার ভাই দুপয়সাব তেলেভাজা খেয়ে এল; তাকেও দিয়েছিল দুটো, সেও খেয়েছিল, কিন্তু তার কিছু হল না। ভাইটার হল কলেরা। দিনে হল, রাত্রে মরে গেল। একটিমাত্র ভাই, বারো বছরের ছেলে, ধড়ফড় করে মবে গেল চোখেব সামনে।

মা সেবা করেছিল ছেলের। মার হল পরের দিন। ছেলেকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে বাবা ফিবে এসে দেখলে, স্ত্রী ছটফট করছে। ছেলের শোক আর বোগেব যন্ত্রণা বেশিক্ষণ তাকে সহ্য করতে হল না। বারো ঘণ্টাতেই সব শেষ হয়ে গেল। ছেলেকে আর স্ত্রীকে শ্মশানে রেখে এসে বাবা যে একটু বসে বসে কাঁদবে তারও সময় পেলে না। বাড়ি ফিরেই সে শুয়ে পড়লো। কিন্তু কি জানি কেন, বাপ অত সহজে গেল না। গাছ-গাছড়ার শিকড় ধারণ করে দুদিন সমানে যুঝলে এই মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গে। সবাই বলতে লাগল, ভগবান এত নিষ্ঠুর নন। দুদিন পবে সে উঠে বসল। বললে, “খুব ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খাব।” পাশের বাড়ি থেকে একথালা ভাত আব একবাটি মাছের ঝোল চেয়ে আনলে টুনু। বাপ আর মেয়ে দুজনে খেলে বসে বসে। কিন্তু সেই খাওযাই তার শেষ খাওয়া হয়ে গেল। সকালে বাপ আর বিছানা ছেড়ে উঠল না। কেমন করে কখন যে মরে গেছে টুনু তা জানতেও পারল না। ছুটে ছুটে লোক জড়ো করলে। সবাই বলতে লাগল—ছেলে মলো, স্ত্রী মলো, অশৌচ অবস্থায মাছ-ভাত খাওয়া তার উচিত হয়নি। শাস্ত্রবাক্য অমান্য কবাব এই ফল। শাস্ত্রবাক্য অমান্য অবশ্য টুনুও করেছিল। কিন্তু যমরাজ তাকে স্পর্শ করলে না।

বিয়ে অবশ্য একটা তার হয়েছিল। তখন তাব বারো বছর বয়েস। বিয়ের পর সে তার স্বামীকেও আর দেখেনি, শ্বশুববাড়িও যায়নি। সামুরাই গ্রামে গিয়ে হালদার তাব জামাই-এব খোঁজখবব অনেক করেছে কিন্তু নটবর গোঁসাই-এর কোনও পাত্তা মেলেনি। ভিটেয় মাত্র একটা ন্যাড়া কুলগাছ ছাড়া আর কিছু ছিলও না লোকটার।

কাজেই টুনু সধবা কি বিধবা তাও সে জানে না।

বাপ ছিল নিতান্ত গরিব। সেও যখন চলে গেল, আপনার বলতে

কেউ আর রইল না টুনুর। বাড়িতেও কিছু নেই যে, বসে বসে খাবে।

টুনু একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল ব্যাপার দেখে। তার চোখের জল গেল শুকিয়ে, মুখের কথা গেল বন্ধ হয়ে। এর ওর বাড়ির দোরে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখলে দয়া হয়। অতি বড় পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। কেউ দেয় দুটি অন্ন, কেউ দেয় লজ্জা নিবারণের বস্ত্র।

কিন্তু শুধু অন্ন আর বস্ত্র দিলেই চলে না। ভগবান তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছেন, নেননি শুধু তার দেহের স্বাস্থ্য। সারা অঙ্গে তখন তার যৌবনের জোয়ার। অযত্ন-বর্ধিত বুনো গাছের মত সর্বদেহে তার বন্য মাদকতা।

তার জন্য চাই একটু নিরাপদ আশ্রয়।

তাও-বা কোনোদিন মিলত, কোনোদিন মিলত না।

সেই টুনু আজ আশ্রয় পেয়েছে ইন্দ্রাণীর কাছে।

ইন্দ্রাণী কিন্তু দুদিনেই তার চেহারা দিয়েছে বদলে।

"তুই রান্না করবি আর সেই রান্না আমি খাব? এই সাবানখানা নিযে যা পুকুরের ঘাটে, গিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেশ করে ঘষে ঘষে পরিষ্কাব হয়ে আয়।"

ইন্দ্রাণী তাকে ভাল সাবান মাখিয়ে, ভাল তেল মাখিয়ে, নিজের পুরনো কাপড় পরিয়ে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে যে, তাকে আর সেই টুনু বলে চেনবার জো নেই।

ইন্দ্রাণী সেদিন একটা কাগজে লিখলেঃ

ভাই জয়া,

অতিথির উপর রাগ করতে নেই। জিনিসটে যদি সত্যিই তোর হয় তো সে জিনিসে আমি হাত দেবো না, তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। এখন কিন্তু তোকে আমার একান্ত প্রয়োজন। দয়া করে টুনুর সঙ্গে একবার আসবি? না এলে আমি নিজেই যাব। ইতি

তোর
ইন্দ্রাণী

টুনুর সঙ্গে জয়া এল হাসতে হাসতে।

"ও-সব কী লিখেছিস হতভাগী?"

"বেশ করেছি। এখন শোন, তোকে আমি কী জন্যে ডেকেছি।"

এই বলে জয়াকে তার ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে বললে,

"তোর বাবুটির সঙ্গে যে একবার দেখা করা দরকার। তোর অনুমতি ছাড়া ত দেখা করতে পারি না।"

জয়া বললে, "আমার আবার বাবু কে? যাঃ!"

"ওই যে গো পাশে থাকে, তোমাদের গাঁয়ের হিরো, ইস্কুলের সেক্রেটারি।"

"কেন, শঙ্করদার নামটা কি তোকে উচ্চারণ করতে নেই নাকি?"

এই বলে খুব রসিকতা করেছে মনে করে হাসতে হাসতে জয়া ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, "কী দরকার? বল না। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তুই কি ভেবেছিস বল দেখি? ও কি আমার কাছে সত্যিই দুর্লভ? আমি যদি ইচ্ছে করি, কেনা গোলামের মত ওকে আমার পিছু পিছু ঘোরাতে পারি।"

জয়া বললে, "পারবি না।"

"বাজি রাখ।" ইন্দ্রাণী বললে, "দ্যাখ্ পারি কি-না!"

জয়া বললে, "না বাবা, যদি-বা একটু আশা আছে তাও আবার যায় কেন?"

"আছে নাকি আশা?"

নীরবে হাসতে হাসতে জয়া তার চোখের ইশারায় জানিয়ে দিলে—আছে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলে, "কথাবার্তা হয়েছে নাকি কিছু?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ। বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল—শঙ্করকে বিয়ে করবি? আপত্তি না থাকে ত বল্ একবার দেখি চেষ্টা করে।"

কথাটা ইন্দ্রাণীর বুকে গিয়ে বাজল ধক্ করে। তবু সে জিজ্ঞেস করলে, "তুই কি বললি?"

"আমি? আমি ভাই লজ্জায় মুখ বুজে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।"

ইন্দ্রাণী হঠাৎ তলিয়ে গেল তার নিজের চিন্তায়। সত্যিই ত ওরই-বা কী দোষ? বিয়ে যে এতদিন সে করেনি—এই তার পরম সৌভাগ্য। দুরন্ত অভিমানে যাকে সে অপমান করে তাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি, মনের উত্তেজনা শান্ত হলে সেই তারই কথা ভেবেছে সে দিবারাত্রি। সমরকে পাঠিয়েছে কলকাতায়। ফিরে এসে বলেছে, কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। তখন সেই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে বারবার শুধু মাথা ঠুকেছে আর অনুতাপ করেছে। কেঁদেছে আর বলেছে ভগবানকে—'তাকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে দাও, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে দেখি তাকে আমার মনের মত করে তুলতে পারি কিনা! যে-ভুল আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগটুকু দাও একবার।' তার সে প্রার্থনা যে এমন করে তিনি শুনবেন সে-কথা কোনদিন সে কল্পনাও করতে পারেনি।

এ সুযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই।
শঙ্করের এখন অভিমানের পালা।
ইন্দ্রাণী প্রস্তুত হল অভিসার যাত্রায়।

শঙ্কর খেতে এসেছিল বাগান-বাড়িতে। কার্তিক বাড়িতে খায় দিনের বেলা।

সেদিন রবিবার। ইস্কুলের কাজ বন্ধ।

শঙ্কর শেষ রাত্রে ওঠে বিছানা ছেড়ে। স্যানিটারি প্রিভি, স্নানের ঘর, শঙ্কর তৈরি করিয়েছে বাগান-বাড়িতে। ইন্দ্রাণীর কোয়ার্টারেও তৈরি করিয়ে দিয়েছে।

আমগাছের তলায় অনেকক্ষণ ধরে শঙ্কর এক্সারসাইজ করে, নিজের হাতে কুয়ো থেকে জল তুলে স্নানের ঘরের ড্রাম ভর্তি করে, তারপর স্নান করে জামা-কাপড় ছেড়ে যখন উঠোনে এসে দাঁড়ায়—পূর্বদিকের আকাশে তখন সূর্য ওঠে। দুহাতের আঙুলের ভাঁজ দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করে শঙ্কর। গ্রামের কয়েকজন ছেলে আসে ব্যায়াম করতে। শঙ্কর তাদের দেখিয়ে দেয়।

বারোয়ারীতলায় কার্তিকের ব্যান্ড-পার্টির বাজনার আওয়াজ শোনা যেতেই শঙ্কর বেরিয়ে পড়ে।

বালিকা বিদ্যালয়ের ছাতে উঠে ইন্দ্রাণী সবকিছু দেখেছে। রোজই দেখে।

রাত্রে খাওয়া শেষ করেই কার্তিক বাড়ি চলে যায়। শঙ্কর একাই থাকে বাগান-বাড়িতে। ইন্দ্রাণীর ইচ্ছে করে ছুটে চলে যায় তার কাছে। সে যখন এল না তখন তাকেই যেতে হবে। কিন্তু যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে আসে। ছাতে গিয়ে একা বসে বসে খানিকটা কাঁদে।

ইন্দ্রাণী জয়াকে বললে, "চল্ এবার যাই। খাওয়া এতক্ষণ হয়ে গেছে।"

দুজনে গিয়ে যখন দাঁড়াল, খাওয়া শেষ করে শঙ্কর তখন চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবছে। মুখ তুলে তাকিয়ে এদের দেখেই একটু হেসেই বললে, "কী খবর?"

জয়া ইন্দ্রাণীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "আপনার মাস্টারনী কী যেন বলবে।"

শঙ্কর বললে, "বলুন।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ভেবেছিলাম ক্লাসটা দেখতে যাবেন একবার, গেলেন না তাই আসতে হল।"

"রাস্তাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। জয়ার বাবা তাড়া লাগিয়েছেন তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে।" শঙ্কর জয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি

ত জানো ওই রাস্তার ওপর দিয়ে শহর থেকে মোটরে চড়ে ডাক্তার আসবেন তোমাদের হাসপাতাল দেখতে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ইস্কুলে সত্তর জন মেয়ে আসছে। একটা ঘরে কুলোয় না, দুটো ঘরে বসাতে হয়।"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি। একা সামলাতে পারছেন না?"

"না। দুদিক সামলান শক্ত।"

শঙ্কর বললে, "পড়ছে ত সব অ আ ক খ?"

ইন্দ্রাণী বললে, "সেই ত হয়েছে আরও মুশকিল। কেউ ত অক্ষর চেনে না। বইও নেই অনেকের। সবাইকে চিনিযে দিতে হয়।"

শঙ্কর জয়ার দিকে তাকালে। "বন্ধুকে একটু সাহায্য কর না।"

"ও আমার বন্ধু কেন হবে? শত্রু।"

এই বলে জয়া হাসতে হাসতে ইন্দ্রাণীর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, "সত্যি কিনা—আচ্ছা তুই-ই বল্ না।"

শঙ্কর বললে, "ওরে বাবা, 'তুই' হয়ে গেছে এবই মধ্যে? তাহলে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।"

জয়া বললে, "কখ্খনো না। ওকে সাহায্য করতে গিযে কি আমি মরব?"

"তবে দেখুন," শঙ্কর বললে, "অতগুলো মেযে থাকবে না। কতক গেছে হুজুগে পড়ে, কতক গেছে আপনাকে দেখতে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন? আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।"

শঙ্কব বললে, "বযেসে ছোট হতে পারেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে মর্যাদায় আমাব চেযে আপনি অনেক—অনেক বড়।"

মাথা হেঁট কবে কথাটা শুনছিল ইন্দ্রাণী। শঙ্কবেব বলা শেষ হলে ইন্দ্রাণী তার আয়ত চোখের পাতাদুটি একবাব তুললে শঙ্করেব দিকে। তুলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলে। রাগ নয়, অভিমান নব, ক্রুদ্ধা ফণিনীব মত যে-চোখের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পবিচয হযেছিল শঙ্কবেব, তাব চিহ্নমাত্র ছিল না সে-চোখে। মিনতিকাতর চোখদুটি যে এবই মধ্যে সজল হয়ে এসেছে সেটুকু চোখে পড়বার মত যথেষ্ট আলো তখন ছিল সে-ঘরে।

শঙ্করের কিন্তু বিচলিত হবার লক্ষণ দেখা গেল না, সে ববং তার বলার সুবটা আব এক পর্দা চড়িয়ে দিলে। বললে, "'তুমি' বলবার মত স্পর্ধা আমার নেই। তাছাড়া সে অধিকারই-বা আমি পাব কোথায়?"

"অধিকার?" জয়া বললে, "ওর হয়ে আমি দিলাম আপনাকে। বলুন আপনি। বেশ শোনাবে।"

এই বলে ব্যাপারটাকে আরও তরল করে দেবার জন্য জয়া একটা দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলে বললে, "আমাকে কেউ 'আপনি' বললে না।—আর কিছু বলবি?"

"কাকে বলব?"

ইন্দ্রাণীর গলাটা যেন ধবে গিয়েছে মনে হল।

জয়া বললে, "আমি ত তোকে আগেই বলেছি, শঙ্করদার শরীরটাও যেমন পাথরের মত, ওর মনটাও তেমনি। নে, চল।"

ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। শঙ্করের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। না তাকাবার কারণ বোধহয় তার চোখে তখন জল এসে পড়েছিল। জয়া কিন্তু দোরের কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালে। দুষ্টু হাসি ছিল তাব মুখে। কিন্তু মুখের হাসি তার মুখেই বয়ে গেল শংকরের মুখের পানে চেয়ে। তারও মুখখানা যেন কান্নার মত করুণ। মনে হল তারও চোখদুটো যেন চিকচিক করছে।

সরোজিনী সেবা-সদনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রাস্তা তৈরির কাজ জোর চলছে। বেল্মা থেকে গাড়ি গাড়ি কাঁকর আসছে, পাথর আসছে। তারিণীশঙ্কর শহরের মিউনিসিপ্যালিটি থেকে হাতে-টানা একটা রোলার এনে দিয়েছে।

রাখহরির মুহূর্তের অবসর নেই। ডাক্তারখানার ওষুধপত্র থেকে আরম্ভ করে সব রকমের সব জিনিস আনিয়ে সাজিয়ে দেবাব ভার দেওয়া হয়েছে একজন ঠিকাদারের উপর। জিনিসপত্র আসতে আরম্ভ করেছে।

মন্মথবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রাখহরি এরই মধ্যে একদিন গিয়েছিল রাস্তাটা দেখতে। শঙ্করের কাছে গিয়ে এ-কথা সে-কথার পর বললে, "দ্যাখো, ভাল কাজেব একটা নেশা আছে। জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে বটে, কিন্তু মন্দ লাগছে না।"

শঙ্কর তার মুখের পানে তাকিয়ে হাসলে একটুখানি।

রাখহরি বললে, "নেশাটা তুমিই ধরিয়ে দিলে।"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

"তবে মন্মথবাবু আমাকে খুব সাহায্য করলেন।"

শঙ্কর বললে, "মানুষটি ভাল।"

"তোমাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে। প্রায়ই বলেন তোমাব কথা।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "আমাদের ওপ্নিং-এব দিন আসবেন ত?"

রাখহরি বললে, "বললেন ত চেষ্টা করব। হ্যাঁ, কথায় কথায় তোমার সেই বন্ধু নরেনের কথা উঠল। বললাম, আসবার জন্যে একখানা চিঠি লিখে দিন না! উনি বললেন, হতভাগা যত না আসে ততই ভালো। এই দেখুন একখানা

চিঠি লিখেছে। হাতের লেখা দেখুন না। রাবিশ্! বলে ড্রয়ার থেকে খামের একখানা চিঠি দেখালেন।”

“কী লিখেছে চিঠিতে?” শঙ্কর জিজ্ঞেস না করে পারলে না।

রাখহরি বললে, “হাতের লেখা দু’লাইনের বেশী পড়তে পারলাম না। মন্মথবাবু বললেন, আমি পড়েছি অতি কষ্টে। বড়লোকের ছেলে—বড়লোক বন্ধু জুটেছে। সেই বন্ধুর সঙ্গে কোথায় কোন্ জঙ্গলে যাবে বাঘ মারতে।”

শঙ্কর হো হো করে হেসে উঠল। “নরেন বাঘ মারবে?”

রাখহরি বললে, “হ্যাঁ। মন্মথবাবুকে লিখেছে খুব ভাল একটা বন্দুক কিনবে। তার লাইসেন্সের জন্যে একটা দরখাস্ত লিখে পাঠাবেন।”

শঙ্কর বললে, “বন্দুক কিনলেই বুঝি বাঘ মারা যায়?”

রাখহরি কিন্তু এসেছিল অন্য কথা বলতে। বললে, “মরুকগে, শোন। সেইটের কী হল? সেই যে বলেছিলাম।”

“কী বলেছিলেন, বলুন ত।”

কথাটা শঙ্করের ঠিক মনে পড়ছিল না।

রাখহরি বললে, “শুভকাজগুলো একসঙ্গে সেরে দিই তাহলে।”

“শুভকাজ?” শঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে।

রাখহরির কেমন যেন লজ্জা করছিল বলতে। “এখনও মনে পড়ল না? নিজের কথা কি কিছু মনে থাকে না তোমার? জয়ার বিয়ে।”

ইন্দ্রাণী আসার পর কথাটা শঙ্কর সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। পরিষ্কার জবাব দিলে রাখহরি আঘাত পাবে। শঙ্কর এখন আর তাকে সে-আঘাতটা দিতে চাইলে না। বললে, “রাস্তাটা শেষ হোক্, আপনার ডাক্তারখানা খুলে যাক্, তারপর বলব। এখন কিছু ভাবতে পারছি না।”

শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখে, কে যেন বসে আছে তার বিছানায়। ঘরের জানলা দরজা সবই খোলা। বন্ধ করার অভ্যাস তার নেই। পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি। জ্যোৎস্নার আলোয় ঘর ভরে গেছে।

চিনতে দেরি হল না শঙ্করের। ইন্দ্রাণী বসে আছে। সেই ইন্দ্রাণী তার এত কাছে? একেবারে নাগালের ভেতর, মুঠোর মধ্যে!

শঙ্কর উঠে বসল না, শুধু পাশ ফিরে শুলো ইন্দ্রাণীর দিকে মুখ করে। “ইন্দ্রাণী!”

ইন্দ্রাণী চুপ করে আছে, কোনও কথা বলছে না। ডান হাতটি বাড়িয়ে শঙ্কর তার একখানি হাত চেপে ধরে আবার ডাকলে, “ইন্দ্রাণী!”

মাথা হেঁট করে বসে ছিল ইন্দ্রাণী। তার চোখ থেকে গড়িয়ে টপ্ করে একফোঁটা জল পড়ল শঙ্করের হাতে।

"তুমি কাঁদছো ইন্দ্রাণী?"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ পরে কথা বললে। "আমাকে ক্ষমা কি তুমি করবে না?"

শঙ্কর বললে, "কী দোয তুমি করেছ যে, তোমাকে আমি ক্ষমা করব?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তোমাকে অপমান করেছি, তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—"

"যাকে ভালবাসতে পারবে না, তাকে তাড়িয়ে দেবে না ত কী করবে?"

"কিন্তু তারপর?" ইন্দ্রাণী বললে, "কেঁদে কেঁদে মরলাম।"

শঙ্কর বললে, "কার জন্যে কাঁদলে? যে-লোকটা তোমাকে প্রতারণা করেছিল, যে-লোকটা ছিল তোমার দু' চক্ষের বিষ—তার জন্যে কেঁদে মবলে?"

"তাছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না যে!"

"কেন? দুটো মন্ত্র পড়ে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল বলে?"

ইন্দ্রাণী মাথা হেঁট করে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল. কোনও কথা বললে না। শঙ্করের হাতটি ধরে সে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "আমার মা চেয়েছিল আমি মানুষ হই, তুমিও চেয়েছিলে একটি মানুষের মত মানুষ। কাউকে আমি খুশী করতে পারিনি। মা সরে গেল আমার কাছ থেকে। তুমিও আমাকে সরিয়ে দিলে তোমার কাছ থেকে। আমাব আর কোনও অবলম্বন রইল না পৃথিবীতে। আমি চলে এলাম দূরে। চেষ্টা করলাম আমার পিছনের জীবনটাকে ভুলে যেতে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, তুমি সুখী হও।"

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে চাইলে। বললে, "কেমন কবে হব?"

"মানুষ কেমন করে সুখী হয তুমি জানো না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না। পারলাম না ত সুখী হতে!"

শঙ্কর বললে, "পারবে কেমন করে? ভালবাসা দিতে পারনি যে। মানুষ সুখী হয় ভালবেসে। তোমার উচিত ছিল প্রাণ দিযে ভালবাসতে পার—এমন একটি মানুষকে খুঁজে বের করা।"

"কী যা-তা বলছ? আমি হিন্দুর মেয়ে না?"

শঙ্কর হাসলে। বললে, "ধ্যেৎ তেরি হিন্দু! দেখছি ত চারদিকে তাকিযে। ভালবাসার নামগন্ধ নেই কোথাও। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘরকন্না করছে, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ে হচ্ছে, অথচ কেউ কাউকে ভালবাসে না। কাজ কি তোমার এই হিন্দু-সমাজে? তুমি হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ। সবার আগে তুমি নিজে, তোমার জীবন। তোমার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার অধিকাব তোমার আছে।"

ইন্দ্রাণী চুপ করে শুনছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন অন্য শঙ্কর। যে-শঙ্করের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়, এ যেন সে শঙ্কর নয়।

শঙ্কর কথা বলতে বলতে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বললে, "তুমি বলছ তুমি হিন্দুর মেয়ে। দেবতা আর অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে বিয়ের সময়। তার পরমুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে তুমি কুণ্ঠিত হওনি। তোমার স্বামী পছন্দ হয়নি, স্বামীর ঘর পছন্দ হয়নি, শাশুড়ী পছন্দ হয়নি। শাশুড়ী ঝি-এর মত কাজ করেছে, আর তুমি সেজেগুজে চুপচাপ বসে বসে রাগে ফুলেছ। বৌভাতের দিন বিদ্রোহের চরম করে তুলেছ। ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, বিধবা মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, আর ঠিক সেই সময় তুমি কী করেছ? কচি খুকি নও, লেখাপড়া-জানা শিক্ষিতা মেয়ে, অসহায়া সেই বিধবা শাশুড়ীর অনুরোধ-উপরোধ নিষেধ-বারণ সবকিছু অগ্রাহ্য করে তাঁকে সেই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছ সেখান থেকে। তুমি যদি তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, ছেলে তার যত বড় পাষণ্ডই হোক, তিনি অন্তত অমন করে গলায় ফাঁসি লটকে আত্মহত্যা করতেন না।"

মার কথা বলতে বলতে শঙ্করের গলাটা ধরে এল, চোখ দুটো ছল্ ছল্ করতে লাগল।

ইন্দ্রাণীর চোখ দিয়ে তখন দর্ দর্ করে জল গড়াচ্ছে। দু হাত বাড়িয়ে শঙ্করের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, "আর বোল না। আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার অন্যায় হয়েছে, অপরাধ হয়েছে।"

এই বলে সে একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শঙ্কর তাকে তুলে দিলে। বললে, "কেঁদো না, চুপ কর। হিন্দুর মেয়ে! হিন্দুর মেয়ে! শাশুড়ী মরে গেছে, খবর পেয়েছ, অশৌচ পালন করনি। তারপর তোমার সেই স্বামী তোমার কাছে গেছে অনুতপ্ত হয়ে, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে তোমাকে চেয়েছে, তোমাকে ভালবেসে তোমার ভালবাসা পেয়ে নিজেকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমার শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে, তুমি তাকে স্বামী বলে স্বীকার পর্যন্ত করতে চাওনি; অপমান করে, দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছ। তখন তুমি হিন্দুর মেয়ে ছিলে না? তখন কোথায় ছিল তোমার হিন্দুত্ব?"

কাঁদতে কাঁদতে ইন্দ্রাণী বলে উঠল, "চুপ কর, তুমি চুপ কর। তোমার দুটি পায়ে পড়ছি—তুমি আর বোল না।"

শঙ্কর বললে, "বেশ, আর বলব না। কিন্তু আমি খুশী হতাম, যদি দেখতাম, তুমি একটি মানুষকে ভালবেসে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছ।"

"না, তা আমি পারিনি। কোনোদিন পারব না।" বললে ইন্দ্রাণী।

শঙ্কর বললে, "তোমার হিন্দুধর্ম এইখানে খানিকটা কাজ করেছে। তোমার সহজাত সংস্কার তোমাকে ও-পথ মাড়াতে দেয়নি।"

"কী বললে? ওইরকম করলে তুমি খুশী হতে? তোমার রাগ হত না?" ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলে।

"রাগ কেন হবে?" শঙ্কর বললে, "আমি জানতাম আমি তোমার অযোগ্য, তুমি আমাকে ভালবাসতে পারনি, তাই অন্য আর-একজনকে ভালবেসে সুখী হয়েছ। এ ত আনন্দের কথা। ভালবাসতে পারার মত, ভালবাসা পাওয়ার মত—সুখ বল, সৌভাগ্য বল—আর-কিছু আছে মানুষের জীবনে? ভালবেসে ভুলও যদি কর তবু ভাল। ভালবাসার অভিনয় নয়, সত্যিকারের ভালবাসা। পৃথিবীতে যারাই বড় হয়েছে তারা, জানবে, মা-বাপের ভালবাসার সন্তান। সে রকমের সন্তানের মা হতে তোমার ইচ্ছা করে না?"

"জানি না। তুমি বিশ্বাস কর আব না কর, ভগবানের নাম নিয়ে আর এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—শুধু তোমার কথা ছাড়া আমি আর কারও কথা ভাবতে পারিনি। তোমার সেই ঝিলপাড়ার বাড়িতে সমরকে পাঠিয়েছি। নিজে গেছি। তোমাদের বস্তির বাডিটা দেখে এসেছি। থানায় গেছি তোমার সন্ধান করতে। থানাব বড়বাবু তোমার সম্বন্ধে কত কথা বলেছেন। বলেছেন, 'ছেলেটাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম।' তিনি আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে নিযে গিয়েছিলেন। আমাব ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমিও তাব খোঁজ করছি—খবর পেলেই তোমাকে জানাব'।"

বলতে বলতে ইন্দ্রাণীর ঠোঁট দুটি থর থর কবে কাঁপতে লাগল।

শঙ্কব বললে, "থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। বুঝতে পেবেছি।"

ইন্দ্রাণী তখন ঝব্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলেছে।

"কিন্তু কেন? কেন তুমি সেই গুণ্ডাটাকে খুঁজে মরছিলে? সে ত তোমাকে সুখে রাখতে পাবত না।"

"না, আমি তাকে খুঁজিনি। আমি খুঁজেছিলাম সেই লোকটিকে যে একদিন আমার কাছে গিয়ে বলেছিল—আমি ভাল হব। আমি তোমাকে সুখে রাখবাব চেষ্টা করব।"

এই বলে ইন্দ্রাণী তার হাতখানা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলে, "অনেক কথাই ত তুমি আমাকে বললে, এইবার আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জবাব দাও।"

"কি বলবে বল।"

"তুমি কি কোনও মেয়েকে ভালবেসেছ?"

শঙ্কব বললে, "বেসেছি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "কাকে? জয়াকে?"

"না। ইন্দ্রাণীকে।"

ইন্দ্রাণী—"কেন ঠাট্টা করছ? ইন্দ্রাণীকে তুমি পাওনি, পাবার আশাও কোনোদিন করনি, তার কাছ থেকে দূরে এক গ্রামে এসে লুকিয়ে বসে আছ, তবু বলছ তাকে ভালবাসি?"

"হ্যাঁ, সত্যি বলছি ভালবাসি। ভগবানকেও ত মানুষ পায় না, কাছে পাবার আশাও করে না, তবু মানুষ তাঁকে ভালবাসে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "না না, হেঁয়ালী রাখ। সত্যি বল।"

"সত্যি বলছি।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

ইন্দ্রাণী এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের বুকের ওপর। দুহাত দিয়ে শঙ্করের মুখখানি চেপে ধরে বললে, "আবার বল! তুমি আবাব বল!"

বলতে বলতে আবার তার সেই সুচারু সুন্দর ওষ্ঠপ্রান্ত কেঁপে উঠল, মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি দেখা গেল, আয়ত দুই চোখের কালো দুটি তারা থেকে আরম্ভ কবে সুঠাম সুগঠিত দুটি হাত, হাতের আঙুল—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব অবয়ব আনন্দের শিহরণে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কৃত তাবের মত থর থর কবে কাঁপতে লাগল।

জানলার পথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ইন্দ্রাণীর সেই অপরূপ সুন্দর মুখের ওপর। স্বচ্ছ দু ফোঁটা জল টলটল করছে তার চোখের কোণে।

শঙ্কর ধরলে তার মুখখানি দুহাত দিয়ে। বললে, "তুমি তোমার মনের মত স্বামী পাওনি, কিন্তু আমি? আমি ত পেয়েছিলাম আকাশের চাঁদ—যা আশা করেছিলাম তার চেযে অনেক—অনেক বেশি। তাই ইন্দ্রাণীর নাম হয়েছিল আমার জপমালা—যে ইন্দ্রাণী আমাকে তাড়িয়ে—"

কথাটা ইন্দ্রাণী তাকে শেষ করতে দিল না।

"না না, আর বোল না। আব আমি তোমাকে—" বলতে বলতে ইন্দ্রাণী তার নিজের মুখ দিয়ে শঙ্করের মুখ দিলে বন্ধ করে।

তারপর আকাশে রইল অতন্দ্র চাঁদ, আর ঘরে রইল আনন্দবিহ্বল এই বিনিদ্র দম্পতি। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ রাত্রি আর স্তম্ভিত গ্রাম।

আশ্চর্য সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে ঘরের আনাচে-কানাচে। সেখান থেকে ঠিকরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে পথের ধুলোয়। ঝির্ ঝির্ করে মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত যেন শিউরে উঠছে শির্ শির্ করে। রিম ঝিম রিম ঝিম করে ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক—মগজে ধরিয়ে দিচ্ছে গোলাপী নেশার আমেজ।

শঙ্কর ঠিকই বলেছিল। তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা কমে এসেছে। অজুহাত নানারকমের। কেউ বলছে 'টেপীর মায়ের অসুখ, এ সময় টেপী ইস্কুলে গেলে ঘরের কাজকর্ম করবে কে?' আবার কেউ-বা বলছে, 'টগরীর পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, শহর থেকে কাপড় এনে দিই, তারপর ইস্কুলে যাবে।'

তারিণীশঙ্কর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরেও আনছে অনেককে। এক টাকার জায়গায় মাইনে করে দিয়েছে দু'টাকা। মোট কথা মাস্টারনীর মাইনেটা কোন-রকমে উঠে যাবে।

সেদিন শঙ্করকে ডেকে পাঠালে তারিণীশঙ্কর।

জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ইস্কুল কেমন চলছে?"

"আমার ইস্কুল? আপনি বলছেন কি?"

"ঠিকই বলছি। তোমাকে সেক্রেটারি কবে দিয়েছি, তুমি যাবে একবাব করে, দেখবে, নতুন মাস্টারনীকে একটু বলবে ভাল করে—তবে ত? শুনছি তুমি একদম ও-পথ মাড়াও না।"

"লজ্জা করে। তাছাড়া ফট্ করে কে কখন কি বদনাম রটিয়ে দেবে।"

"বদনাম রটালেই হল? আমরা মাইনে দিই, ও কাজ করে; না না, তুমি যাবে।"

শঙ্কর বললে, "আপনি বরং যাবেন মাঝে-মাঝে।"

"আমি কি আর যাইনি ভেবেছ? দুদিন গিয়েছিলাম। তাছাড়া মেয়েটিকে আমার বাড়িতে ডেকে এনে খুব খাইয়ে দিয়েছি সেদিন। ভারী ভাল মেয়ে। তুমি আমাকে কাকাবাবু বল, তাই না শুনে ও-ও আমাকে কাকাবাবু বললে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। কার্তিকের মায়ের সঙ্গে কত কথা।"

শঙ্কর আব বেশি-কিছু শুনতে চাইলে না। কাজ আছে, বলে চলে গেল।

কিন্তু দোরের কাছ থেকে পিছনে ডাক শুনে আবার তাকে ফিবে যেতে হল। "আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ ডাকছি।" তারিণীশঙ্কর বললে, "একটা কথা মনে পড়ে গেল। শুনছি নাকি রেখো তোমার সঙ্গে ওর ওই ধিঙ্গি মেয়েটার বিয়ে দিতে চায?"

শঙ্কর বললে, "চাইতে পারে, কিন্তু বিয়ে করছে কে?"

"হ্যাঁ। খবরদার, খবরদার। মেয়েকে দিয়ে ব্যাটা তোমাকে হাত করতে চায়। তোমার জন্যে খুব ভাল মেয়ে দেখে দেব আমি। কার্তিকের আর তোমার একসঙ্গে বিয়ে দেব। পুব দেশের ভাল মেয়ে।"

শঙ্কর আবার পালাতে চাইলে, কিন্তু তারিণীশঙ্কব আবার বসালে তাকে। যেতে দিলে না। বললে, "ওই যে মাস্টারনী এসেছে, দাঁড়াও, ওকে একবার

জিজ্ঞেস করব আমি—ওর বোন-টোন আছে কি না। বউ করতে হয় ত ওই রকম মেয়ে। তোমার কাকীমাও বলছিল—ঘর আলো-করা মেয়ে। হ্যাঁ, শোন, যে-কথাটা বলবার জন্যে ডাকলাম তোমাকে। শুনছি নাকি ওর ডাক্তারখানার ওষুধপত্র সব এসে গেছে?"

শঙ্কর বললে, "সব আসেনি। আসছে কিছু-কিছু।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "ব্যাটার বেশ খসবে, কি বল?"

"হ্যাঁ, তা খসবে বৈকি! ও-সবের দাম ত কম নয়।"

"কিন্তু আমার রাস্তা খোলবার আগেই ব্যাটা ওর ডাক্তারখানা খুলে দেবে না ত?"

শঙ্কর বললে, "তাই পারে কখনও? ডাক্তারখানা হলেই ত হবে না, ডাক্তারও ত চাই!"

"হ্যাঁ তা চাই। ডাক্তার আনবে।"

শঙ্কর বললে, "ডাক্তার ত উড়ে আসবে না! আপনার রাস্তার ওপর দিয়েই আসতে হবে। রাস্তাটা আগে শেষ হোক।"

"ঠিক বলেছ। কিন্তু যদি ট্রেনে আসে? স্টেশনের রাস্তাটা ত হয়ে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "না, গরুর গাড়ি চড়ে ডাক্তাব আসবে না বলেছে। বলেছে, বড় রাস্তার ওপব দিয়ে মোটরে চড়ে আসবে।"

তারিণীশঙ্কর আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল, "ঠিক হয়েছে। আগে আমার রাস্তা খুলবে, তারপব আমাব সেই রাস্তাব ওপব দিযে বাখহরিব ডাক্তার আসবে। তাহলে আমার রাস্তা আগে, তারপর ওব ডাক্তারখানা।"

শঙ্কব বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি চলি। আমার দেরি হয়ে গেল।"

বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শঙ্কর সেদিন সত্যিসত্যিই গেল বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। কিন্তু রাস্তা তৈরির কাজ ছেড়ে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল। বিদ্যালয়ের তখন ছুটি হয়ে গেছে।

পাশেই ইন্দ্রাণীর কোয়ার্টার।

শঙ্কর গিয়ে দেখলে, তোলা উনুনেব উপর কেটলিতে চায়ের জল গরম কবছে টুনু, আর ইন্দ্রাণী তখন স্নানের ঘর থেকে এসে জামা-কাপড় ছেড়ে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

শঙ্কর বললে, "নমস্কার!"

ইন্দ্রাণী চট্ কবে মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে মুখের হাসি ঠোঁট দিয়ে চেপে বললে, "নমস্কার। বসুন।"

খাটের উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। ইন্দ্রাণী চোখের ইশারায়

সেইখানেই তাকে বসতে বলেছিল, কিন্তু টুনু রয়েছে বলে শঙ্কর খাটের তলা থেকে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

রাত্রে টুনু শোয় পাশের ঘরে। কাজেই এ-ঘরের কোথায় কি থাকে শঙ্কর সবই জানে।

ইন্দ্রাণী কিছু বলবার আগেই শঙ্কর বললে, "তারিণীবাবু ইস্কুলটা মাঝে মাঝে দেখতে বলছিলেন, তাই এসেছিলাম আপনার ছাত্রীদের দেখতে। রাস্তা থেকে আসতে দেরি হয়ে গেল। নইলে ছুটির আগেই আসতাম।"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি এখান পর্যন্ত এসেছেন। ছুটি হয়ে গিয়েছে বলে আপনি দোর থেকে ফিরে যাননি এই যথেষ্ট। টুনু, সেক্রেটারিবাবুকে আগে এক পেয়ালা চা দাও। শুধু চা খাবে? দাঁড়াও দেখছি।"

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শঙ্কর ডাকলে, "টুনু।"

"উঁ"—টুনু মুখ তুলে তাকালে।

"কাজকর্ম ভাল করে করছ ত?"

টুনু মাথাটি হেঁট করে বললে, "হুঁ।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েটা কেমন? মাস্টারনী লোক ভাল ত?"

টুনু এবার তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটু হেসে বললে, "খুব ভাল।"

ইন্দ্রাণী ফিরে এল একটা কুঁজো হাতে নিয়ে। বললে, "টুনু, কুঁজোতে এক ফোঁটা জল নেই। যাও চট্ করে সেক্রেটারিবাবুর বাগান-বাড়ির কুয়ো থেকে জল নিয়ে এস। ছাড়ো, চা আমি করে নিচ্ছি।"

টুনু উঠে দাঁড়াল। কুঁজোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দোরের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী হাসিতে একেবারে ভেঙে পড়ল। "কুঁজোর জলটা ফেলে দিলাম।"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি।"

"কিন্তু এ রকম আর কতদিন চলবে বল ত? আমার আর ভাল লাগছে না।"

এই বলে ইন্দ্রাণী ডিম ভাঙতে লাগল।

শঙ্কর বললে, "রাস্তা, ডাক্তারখানা খুলে যাক।"

"কখন খুলবে?"

"আর বেশি দেরি নেই।"

ইন্দ্রাণী বললে, "সেদিন কি বিপদেই না পড়েছিলাম। কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন, বরটি কী করে? কী যে বলব ভেবেই ঠিক করতে পারছিলাম না। বললাম, কিছুই করে না। বরের আমার মাথার ঠিক নেই। পাগল বললেও

হয়। জিজ্ঞেস করলে, ছেড়ে দিয়েছে নাকি? বললাম, একরকম ছেড়ে দেওয়াই! প্রথম যেদিন এখানে এলাম, জয়া জিজ্ঞেস করলে, তখন ত জানি না তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তাই সত্যি কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিয়ের পর স্বামী আমার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলাম।"

শঙ্কর বললে, "তোমাকে আরও কাঁদাবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু পারলাম না।"

ইন্দ্রাণী কাজ করতে করতে বলতে লাগল, "তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর জয়াকে একদিন বলেছি, তোকে আমি মিছে কথা বলেছি জয়া। স্বামী আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়নি। আসলে আমার এখনও বিয়েই হয়নি। অভিভাবক বলতে কেউ নেই, একা একা এখান-ওখান ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই মিছেমিছি সিঁথিতে সিঁদুব নিয়ে সধবা সেজেছি। মেয়েটা খুব চালাক। আমার কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করেনি।"

শঙ্কর বললে, "কাকীমা তোমার খুব প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ঘব-আলো-করা বউ। তোমার বোন-টোন আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।"

"কেন?"

"থাকলে তার সঙ্গে হয় আমার, নয় কার্তিকের বিয়ে দেবেন।"

দুজনেই হাসতে লাগল।

ইন্দ্রাণী বললে, "হায়রে অদৃষ্ট। বোন আমার নেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর না।"

"কী কাজ?"

"জয়াকে যে কথা বলেছি তোমার কাকাবাবুকে বল সেই কথা। বল, মাস্টারনীর বিয়ে হয়নি, সে কুমারী। জিজ্ঞেস করবে ত—তাহলে সিঁথিতে সিঁদুর কেন? বলবে অপরিচিত জায়গায় এল বলে পুরুষদেব ভয়ে মিছে-মিছি সিঁদুর পরে এসেছে।"

"তারপর?"

ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতে বললে, "তোমার সঙ্গে আবাব আমার বিয়ে হবে। বেশ হবে কিন্তু।"

ভাজা ডিমটা প্লেটের উপর রাখলে ইন্দ্রাণী। বললে, "যে-মানুষটির সঙ্গে আমাব বিয়ে হয়েছিল এখন ত আব তুমি সে-মানুষ নও। একেবারে বদলে নতুন মানুষ হয়ে গেছ। কাজেই নতুন কবে আবার যদি আমাদের বিয়ে হয়, মন্দ হবে না।"

"ভুল বলছ ইন্দ্রাণী," শঙ্কর বললে, "আমি ঠিক সেই মানুষই আছি। এতটুকু বদলাইনি। বদলান এত সহজ নয়।"

প্লেটটা হাতে নিয়ে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। "না গো মশাই, না।" বলতে

বলতে শঙ্করের কাছে এসে প্লেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, "খাও। আমি চা আনছি।"

"তুমি খাবে না?"

"পরে খাব। তুমি খাও আগে।"

শঙ্কর ধরে বসল। "না, একসঙ্গে খাব।"

"ধেৎ! টুনু এসে পড়বে।"

শঙ্কর চামচ দিয়ে ডিমটা দুভাগ করে একটা ভাগ নিজের জন্যে রেখে আর একটা ভাগ হাত দিয়ে তুলে ইন্দ্রাণীর মুখের কাছে ধরলে। বললে, "হাঁ কর, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

"না।"

"তোমাকে খেতেই হবে।"

"ধেৎ! না—"

শঙ্কর কিছুতেই ছাড়বে না।

ইন্দ্রাণীও হাঁ করবে না। তাকে বিশ্রী দেখাবে হয়ত। "খেয়ে রেখে দাও না। বলছি আমি পবে খাব।"

শঙ্করের কিন্তু জেদ চড়ে গেছে। হাঁ করে তার হাত থেকে তাকে খেতেই হবে। এক হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে সে জোব করে ধরে টেনে তাকে নিজের কোলের উপর এনে ফেললে। তারপর আদর করে তাকে খাওয়াতে লাগল। একসঙ্গে সবটা কিছুতেই খেলে না ইন্দ্রাণী। একটু একটু করে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে নিতে লাগল। ছোট মোড়ার উপর বসে আছে শঙ্কর। ইন্দ্রাণী তার পা দুটো মুড়ে মেঝেতে বসে পড়েছে। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে শঙ্করের কোমরটা, আর হেসে হেসে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খাচ্ছে।

টুনু এসে পড়বে বলে খেতে আপত্তি করেছিল ইন্দ্রাণী। কিন্তু মনের আনন্দে সে-জ্ঞান সে হাবিয়ে ফেললে খেতে খেতে।

"বেশ, তাহলে তোমাকে আমি খাইয়ে দিই।"

বাকী টুকরোটি ডান হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে ইন্দ্রাণী শঙ্করের মুখের কাছে ধরল।

দুজনেই খেতে লাগল।

দোরের দিকে কেউ তাকায়নি। টুনু বাগান-বাড়িতে যাবে, কুয়ো থেকে জল তুলবে, কুঁজোটা ধোবে ভাল করে, তারপর জল ভরে নিয়ে ফটকের বাইরে এসে ফটকটা বন্ধ করবে, তারপর আসবে। ততক্ষণে তাদের খাওয়া হয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণীর খাওয়া শেষ হয়েছিল, কিন্তু শঙ্করের তখনও শেষ হয়নি। খেতে খেতে হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেল দোরের উপর।

একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে দোরে দাঁড়িয়ে আছে টুনু নয়—জয়া।

শঙ্কর না পারলে উঠে দাঁড়াতে, না পারলে ইন্দ্রাণীকে সরিয়ে দিতে, কী যে করবে কিছুই বুঝতে পারলে না। ইন্দ্রাণী ছিল দোরের দিকে পিছন ফিরে, বাকী ডিমটুকু খাইয়ে দেবার জন্যে হাতটাও ঠিক সেই সময় তুলে ধরলে। হাতটা সরিয়ে দিয়ে শঙ্কর ডাকলে. "জয়া!"

ইন্দ্রাণী চট্ করে শঙ্করকে ছেড়ে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই দোরের দিকে তাকিয়ে দেখে, জয়া নেই।

"কোথায় জয়া?"

শঙ্কব বললে, "দেখেই চলে গেল।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ছি ছি, তুমি একি করলে বল ত?"

বলেই সে চা করতে বসল। বলল, "জানি এইরকম হবে একদিন। আর কতদিন চাপা দিয়ে রাখবে, আব কেনই-বা রাখবে? ভালই হয়েছে। আজ আমি জয়াকে সব বলে দেব।"

শঙ্কর বললে, "না না, আজ বোল না।"

"কেন বল ত? এখনও তুমি চাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছ কেন?"

টি-পটে চা দিয়ে জল ঢেলে ইন্দ্রাণী কাপ দুটো আনবার জন্যে উঠল। বললে, "কী ভেবে গেল বুঝতে পারছ?"

শঙ্কর বললে, "খুব পারছি।"

"তার উপর, তোমার ওপর ওর নজর আছে।"

"সব জানি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "তবু বলব না?"

"না।"

"যদি জিজ্ঞেস করে? কী জবাব দেব?"

"যাহোক একটা দেবে বলে। দুদিন পরে জানতেই ত পারবে সব।"

টুনু এল জলের কুঁজো নিয়ে। জিজ্ঞেস করলে, "কুঁজোটা এই ঘরে রাখি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "রাখো।"

কুঁজোটা রেখে টুনু বললে, "আমি চা করছি। ছাড়ো।"

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস কবলে, "জয়াকে দেখলি?"

"দেখলাম।" টুনু বসল চা করতে। তারপর ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বললে, "ওইখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে বলতে বারণ করলে।"

আজ আর টুনুকে ইন্দ্রাণী লজ্জা করলে না। চা তৈরির ভার তার উপর

ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী শঙ্করের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, "ওই ত দাঁড়িয়ে আছে, শুনলে, এখন কী করব বল। ডেকে আনব?"

"আমি চলে যাই। তারপর।"

"তার মানে লজ্জাটা নিজে গায়ে মাখতে চাচ্ছ না। 'মরি ত আমিই'"—

টুনু চা নিয়ে এল। ইন্দ্রাণী চায়ের কাপ দুটি তার হাত থেকে নিয়ে একটি শঙ্করের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর-একটি নিজে নিয়ে বসল খাটের উপর।

"সত্যি কথা বলতে কেন বারণ করছ আমাকে বলতে হবে।"

চা খেতে খেতে শঙ্কর বললে, "গ্রামে দুজন বড়লোক। আমার কাকাবাবু, আর জয়ার বাবা। দুজনের মনের মিল নেই। আমি সেইটেকেই মূলধন করে দুজনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছি। জয়ার বাবার গোপন বাসনা আমাকে তিনি জামাই করবেন। আজকেই যদি সে আশাটুকু নির্মূল হযে যায়, আর কালকেই যদি বলে দেন—এই রইল তোর ডাক্তারখানা, ওটা আমার বৈঠকখানা হবে, তাহলেই গেছি। তাই আমি তোমার কথাটা বলতে চাই সেইদিন—যেদিন ওঁর ডাক্তারখানাটা খোলা হবে। তার আর দেরি নেই। রাস্তা আর ডাক্তারখানা একই সঙ্গে খোলা হবে। আর দুচারটে দিন কোনরকমে দাও চালিযে। তোমার ভয় বা লজ্জা পাবার কিছু নেই। অভিনয় করে দুদিন মজা কর।"

ইন্দ্রাণী বললে, "মজাটা কেমন যেন মর্মান্তিক হযে যাচ্ছে।"

শঙ্কর বললে, "এই দ্যাখো কেমন সুন্দর বাংলা বলছ তুমি। আমি লেখা-পড়া শিখিনি। পারি না।"

"তোমাকে আমার ইস্কুলে ভর্তি করে নেব।" ইন্দ্রাণী বললে।

শঙ্কর বললে, "টুনু সব শুনছে ত।"

"শুনুক। টুনু বড় ভাল মেয়ে। ও আমাকে সব বলেছে। গাঁয়ের ব্যাটা-ছেলেগুলো ভারি বজ্জাত, না টুনু?"

টুনু বললে, "হ্যাঁ দিদিমণি।"

বলেই সে লজ্জায় যেন মরে গেল।

ইন্দ্রাণী বললে, "সব সমান। আমাদের সেক্রেটারিবাবুকে ভাল মনে করেছিলাম। ও আমাকে কেমন করছে দ্যাখ্।"

"আমি চলি।" শঙ্কর চলে গেল।

ইন্দ্রাণী তার পিছু পিছু দোর পর্যন্ত এল, কিন্তু জয়াকে কোথাও দেখতে পেলে না। পালিয়েছে নাকি?

সদর দোরটা বন্ধ করে ইন্দ্রাণী যেই ফিরেছে, দেখলে এদিকের একটা দেয়ালেব আড়াল থেকে জয়া বেরিয়ে এল।

"দিলি ত পোড়ারমুখী সব শেষ করে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "কি করব বল, ইস্কুলের সেক্রেটারি, একটু হাতে রাখতে হয়।"

"ওর নাম বুঝি হাতে রাখা? কোলে শুয়ে পড়েছিলি, আমি বুঝি দেখিনি!"

ইন্দ্রাণী বললে, "গায়ের জোরে পারলাম না যে! লোকটার গায়ে অসুরের মতন বল।"

জয়া বললে, "দাঁড়া, কাল আমি সব রটিয়ে দেব। শঙ্করদা ভাল, শঙ্করদা ভাল। বাবাঃ, আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।"

"তোর বাবা ত ওকে জামাই করবে।"

"আবার? তোর মতন সতীনকে নিয়ে আমি ঘর করব বুঝি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমি তখন ছেড়ে দেব। —আচ্ছা ধর, আমি যদি বলি আমি কুমারী। সিঁথিতে সিঁদুর পরেছি পুরুষ মানুষের ভয়ে। আমি যদি ওকে বিয়ে করি?"

জয়া বললে, "কর না। আমি কেড়ে নেব।"

দেখতে দেখতে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল।

ময়নাবুনি থেকে শহরে যাবার পাকা সড়ক। বাহাদুর শঙ্কর। বাহাদুর কার্তিক আর গ্রামের ছেলেরা। তারিণীশঙ্করের ইচ্ছা, শহর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বড় বড় উকিল, আর দুচারজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে এনে, বেশ একটু জমকালো রকমের সভায় নিজের নামটা প্রচার করে রাস্তাটা খোলার ব্যবস্থা করা। তারিণীশঙ্কর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন শহরে গিয়েছিল। ফিরে এসে জানালে সবাইকে এক-করা মুশকিল। তবে আগামী পঁচিশে তারিখে কিসের যেন একটা ছুটি আছে, সেইদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের সামর্থ্যে এই যে এত বড় একটা কাজ করা হয়েছে, তার জন্যে প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

শঙ্কর বললে, "তার ত এখনও দশ-বার দিন দেরি।"

তারিণীশঙ্কর আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছেন। কাজেই দেরিটাকে আর দেরি মনে হচ্ছে না। বললে, "তা হোক না। এদিককার আয়োজনও ত করতে হবে।"

"না, আমি সেজন্যে বলছি না। রাখহরিবাবুর ডাক্তারখানার কাজ শেষ হয়ে গেছে। উনি আর খরচ টানতে পারবেন না, তাই ওটা উনি সরকারের হাতে তুলে দিতে চান।"

তারিণীশঙ্করের খুশীর মাত্রাটা যেন আর এক ধাপ উঠল। হেসে বললেন,

"দেখলে? আমার কথাটাই ঠিক হল ত শেষ পর্যন্ত। ওটা যাতে আমার হাতে আসে তার ব্যবস্থা করে দিও শঙ্কর। ও ডাক্তারখানা ইউনিয়ন বোর্ড চালাবে!"

শঙ্কর বললে, "তাই হবে, আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"আমি বেঠিক কখনও বলি না।"

শঙ্কর বললে, "শহর থেকে সিভিল সার্জেন আসবেন পরশু।"

"তুমি তাহলে সিভিল সার্জেনের কানে কানে ওই কথাটা বলে দিও।"

"নিশ্চয় বলব।"

শঙ্কর বললে, "পরশু তাহলে প্রথম মোটর গাড়ি আসবে শহর থেকে আপনারই এই রাস্তার ওপর দিয়ে।"

তারিণীশঙ্কর তার কথাটাকে আর-একবার আওড়ালেন। "হেঁ-হেঁ, আমারই রাস্তার ওপর দিয়ে। আমার রাস্তা আগে, তারপর ওর ডাক্তারখানা! ওর ডাক্তারখানা আর রইলো কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "তাহলে এই কথা রইল। আজ তাহলে এই রাস্তার উপর হাতে লিখে একটা সাইনবোর্ড পুঁতে দিই। আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তাটা আজই খুলে দেওয়া হল। ধরে নিন।"

"সাইনবোর্ড? কী লেখা থাকবে তাতে?"

শঙ্কব বললে, "তাবিণীশঙ্কর সরণী।"

"সরণী? সরণী মানে?"

শঙ্কর বললে, "সরণী মানে সড়ক। নামটা ইন্দ্রাণী বললে। আপনার ওই মাস্টারনী।"

আরও খুশী হল তারিণীশঙ্কর। ইন্দ্রাণীর নাম শুনে আর-একটা কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে, "জিজ্ঞেস করেছিলে ওর বোন-টোন আছে কিনা?"

শঙ্কর হাসলে। বললে, "এ-সব হাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর বলব আপনাকে একটা কথা। শুনে খুশী হবেন কিনা জানি না, তবু বলব।"

"না না, এক্ষুনি বল।" ধরে বসল তারিণীশঙ্কর। কিন্তু কিছু না বলেই হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল শঙ্কর।

উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শঙ্কর।

হাতে-লেখা সাইনবোর্ড পুঁতে দেওয়া হল রাস্তার ধারে। তারিণীশঙ্কর সড়ক। সরণী কথাটা বাদ দিয়ে দিলে শঙ্কর। বললে, "আমরা সব মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, সরণী কথাটাব মানে বুঝব না। আমাদের সডকই ভাল।"

পরের দিন সিভিল সার্জেন আসবেন শহর থেকে। আসবেন 'সরোজিনী সেবা-সদন' দেখতে। দেখেই যাবেন শুধু; দেখে গিয়ে মন্মথবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করবার করবেন।

রাখহরি বললে, "মন্মথবাবুও আসতে পারেন।"

পরের দিন সকাল থেকে সেবা-সদন সাজাতে আরম্ভ করেছে গ্রামের ছেলেরা। সরোজিনী সেবা-সদনের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। নানারকম রঙিন কাগজের ফুল আর শিকলি তৈরি করে দিয়েছে জয়া।

কার্তিক তার ব্যান্ড-পার্টির রিহার্স্যাল দিচ্ছে। নিজে তার হাতে নিয়েছে বন্দুক আর কাঁধে ঝুলিয়েছে ক্যামেরা।

শঙ্কর তারিণীশঙ্করকে নিয়ে ব্যস্ত। তারিণীশঙ্কর বলছে, সে যাবে না। শঙ্কর বলছে, "চলুন। ডাক্তারখানার উদ্বোধন যদিও আজকে হচ্ছে না, তবুও আজ আপনার যাওয়া উচিত।"

তারিণীশঙ্কর বলল, "ও-যে আসেনি আমার বালিকা বিদ্যালয়ের মিটিংএ!"

"এসেছিলেন। এসেই চলে গিয়েছিলেন মেয়েকে রেখে।"

"তাহলে আমাকে তুমি যেতে বলছ?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যাবেন শুধু আপনার রাস্তার উপর দিয়ে শহর থেকে প্রথম মোটর গাড়ি আসবে সেইটি দেখতে।"

"ঠিক বলেছ। তাহলে যাই। আমি কিন্তু কথা বলব না রেখোর সঙ্গে।"

"তা নাই-বা বললেন। তবু চলুন।"

ফরসা জামা-কাপড় পরে গলায় একটা চাদর ঝুলিয়ে তারিণীশঙ্কর বেরিয়ে এলেন। কার্তিককে বললেন, "ভাল করে বাজাবি। শহর থেকে সিভিল সার্জেন আসছে তারিণীশঙ্কর সরাণের উপর দিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "সরাণ নয়, সরণী।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "ও হো হো. এতক্ষণে বুঝতে পারছি—আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক রাস্তাকে সরাণ বলি।"

শঙ্কর বললে, "কিন্তু সরাণ সরণী বদলে সড়ক করে দিয়েছি।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "বেশ করেছ। যা সবাই বোঝে সেই কথা লেখাই ভাল।"

তারিণীশঙ্কর রাখহরির সঙ্গে কথা বলবে না, রাখহরিও বলবে না তারিণীর সঙ্গে। রাখহরি ছিল তার ডাক্তারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে, আর তারিণী ছিল তার রাস্তার সাইনবোর্ডের কাছে। শঙ্কর শুনলে না কিছুতেই। তারিণীকে বললে, "আসুন, আপনাকে একবার ডাক্তারখানাটা দেখাই।"

"রেখো যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফটকের কাছে।"

"থাক না!"

"দিয়েছ ত আচ্ছা করে খরচ করিয়ে।"

"সেইটেই ত দেখাতে চাচ্ছি আপনাকে।"

তারিণীশঙ্কর এল। ঢুকল রাখহরির ডাক্তারখানায়।

"ওরে বাবা, এত ওষুধ?"

শঙ্কর বললে, "এইদিকে তাকান।"

"ওরে বাবা, এটা কী?"

রাখহরি বলে উঠল, "অপারেশন টেবিল। ওইখানে শুইয়ে কাটাছাঁটা করা হবে।"

তারিণীশঙ্কর সেদিকে তাকালে না। না-তাকিয়েই বললে, "দাম নিশ্চয়ই অনেক!"

শঙ্কর চোখের ইশারা করে দিলে রাখহরিকে। রাখহরি বললে, "টাকাকড়ি যা-কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেল। মেয়েটার বিয়ে কেমন করে দেব তাই ভাবছি।"

ভারী খুশী হল তারিণীশঙ্কর। রাখহরির বিমর্ষ মুখখানার দিকে একবার না-তাকিয়ে পারলে না। বললে, "তা যদি বলছ ত একবার জিজ্ঞেস কর শঙ্করকে। রাস্তাতে আমার কম খরচ হল না। তার উপর আবার মেয়েদের ইস্কুল। —ওরে বাবা, এ-ঘরে বিছানা পাতা কেন?"

রাখহরি বললে, "যে-সব রুগী বাড়ি যেতে পারবে না তারা থাকবে এইখানে। এ-ঘরে পুরুষদের ছ'টি বেড, আর এই ঘরে মেয়েদের ছ'টি বেড।"

তারিণীশঙ্কর বসল একটা খাটের উপর। বেশ করে টিপেটুপে দেখলে। বললে, "লোহার তৈরি। দাম আছে।"

শঙ্কর বললে, "ভাল করে চেপে বসুন। দেখাচ্ছি একটা জিনিস।"

তারিণীশঙ্করকে রুগীর মত শুইয়ে খাটের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে একদিকটা উঁচু করে দেখিয়ে দিলে। বললে, "উঁচু-নিচু নানারকম করা যায় এগুলো।"

"তাহলে এরই দাম অনেক বল।"

"নিশ্চয়।"

দেয়ালের ঘড়িতে টং করে আওয়াজ হল। রাখহরি সেইদিকে তাকিয়ে বললে, "আসবার সময় প্রায় হয়ে এল। এস আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।"

সবাই বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্যাণ্ড-পার্টির দল তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শঙ্কর বললে, "আমি একটু এগিয়ে দেখি। তোরা ঠিক হয়ে থাক।"

তারপর হঠাৎ কী ভেবে কার্তিকের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বললে, "এইটে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তারের গাড়ি দেখলেই আমি আওয়াজ করব। আওয়াজ শুনলেই তোরা বাজাতে আরম্ভ করবি। দে, একটা কার্টিজ দে।"

কার্তিক বললে, "ফাঁকা কার্টিজ নয় কিন্তু।"

"নাই-বা হল।"

কার্তিক জিজ্ঞেস করলে, "তুমি আসবে কেমন করে? গাড়ি ত চলে আসবে এগিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "আমি গাড়ির পাদানিতে চড়ে বসব।"

এই বলে শঙ্কব এগিযে চলে গেল। নতুন তৈরি সোজা রাস্তা। ছেলেরা তাকিয়ে বইল সেইদিকে। শঙ্কর যাচ্ছে ত যাচ্ছেই।

খানিকটা দূরে গিয়ে রাস্তাটা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, একটু একটু করে শঙ্কর সেইখানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাস্তার ধাবে ধানের মাঠ, পুকুব আর গাছপালার ঝোপ। ঝোপের কাছে জুতোর আওযাজ হতেই শঙ্কর তাকালে সেইদিকে। তাকিযে এগিযে যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে পড়তে হল সেইখানে। দেখলে, নরেন এগিযে আসছে। অনেকদিন পরে নরেনের সঙ্গে দেখা। সেই আদালতে দেখেছিল তাকে আব এই এখন দেখছে। চেহারার বিশেষ-কিছু পরিবর্তন হযনি। দামী একটা স্যুট পবে তাকে মানিয়েছে চমৎকার।

শঙ্কর বললে, "কি রে নরেন, এখানে কেন?"

নরেন একটা কথাও বলছে না। এগিয়ে আসছে তার দিকে। নবেনের একটা হাত প্যাণ্টের পকেটে আর একটা হাত খালি।

"কি রে, কথা বলছিস না যে? তোর খবর আমি পেয়েছি।"

তবু কথা বলছে না নরেন। শঙ্কবের কাছে এসে ফস্ করে পকেট থেকে হাতখানা বেব করলে। হাতে একটা ছোট্ট অটোমেটিক রিভলবার। শঙ্কর ভাবতেই পারেনি যে, নরেন সেটা চালিয়ে দেবে। দুম্ করে একটা আওয়াজ হল। শঙ্করের তলপেটে লাগল গুলিটা।

বাঁ হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে শঙ্কর চিৎকাব করে উঠল, "নরেন!"

নরেন তখন রাস্তার ধাবে ধারে প্রাণপণে ছুটছে আর পিছন ফিরে ফিবে তাকাচ্ছে। শঙ্করের হাতে দেখেছে বন্দুক। ভয়ে তখন তার হযে গেছে।

ওদিকে আওয়াজ শুনে কার্তিকের ব্যাণ্ড-পার্টি তখন বাজাতে আরম্ভ করেছে।

যত জোরেই ছুটুক, নরেন তখনও রেঞ্জের বাইবে যায়নি। শঙ্করেব হাতে রয়েছে দোনলা বন্দুক। একটিমাত্র কার্টিজ আছে ওতে। ওই একটি কার্টিজই যথেষ্ট। সন্ধান তার অব্যর্থ। এক্ষুনি তাকে শুইয়ে দিতে পারে।

বন্দুকে একবার হাত রাখলে শঙ্কর। হঠাৎ কী ভেবে হাতটা সরিয়ে নিলে। প্রতিহিংসাপরায়ণ মন এক্ষুনি হয়ত প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষেপে উঠতে পারে, তাই বন্দুক থেকে কার্টিজটি বের করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

পেটে বাঁ হাতটা চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছে শঙ্কর। ব্যান্ড-পার্টি সমানে বাজিয়ে চলেছে।

কার্তিক বললে, "শঙ্করদা, গাড়ি কোথায়?"

শঙ্করের মুখে জবাব নেই। রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল শঙ্কর।

ব্যান্ডের বাজনা বন্ধ করে দিয়ে কার্তিক ছুটে এল তার কাছে।

"এ কী? এত রক্ত কেন শঙ্করদা?"

"বন্দুকের গুলি লেগেছে।" শঙ্কর বললে।

"এই বন্দুকে? কখ্খনো না।" বলেই বন্দুকটা তার হাত থেকে নিয়ে চট করে সেটা খুলে দেখলে কার্টিজটা নেই, চোখ দিয়ে নলটা দেখলে—তাতে ফায়ারিং-এর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কার্তিক চিৎকার করে উঠল "শঙ্করদা! বল—বল এ-কাজ কে করলে?" বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার দর দর করে জল গড়িয়ে এল।

কার্তিকের সেই বুকফাটা আর্তনাদ শুনে ছেলেরা ছুটে এল।

কার্তিক বললে, "শঙ্করদাকে বাড়ি নিয়ে যা। আমি আসছি।"

শঙ্কর বললে, "ওকে যেতে দিস না। ওকে ধর।"

কার্তিক তখন বন্দুক হাতে নিয়ে ছুটছে। ছেলেরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। কার্তিক আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দে। আজ আমি যার হাতে বন্দুক দেখব তাকেই শেষ করে দেব।"

ওদিকে তারিণীশঙ্কর রাখহরি দুজনেই ছুটে এসেছে। রক্ত দেখে চমকে উঠেছে তারা। "কে করেছে? এ সর্বনাশ কে করলে শঙ্কর?"

ছেলেরা তখন তাকে আড়কোলা করে তুলেছে।

শঙ্কর বললে, "নামিয়ে দে, নামিয়ে দে, হেঁটে আমি যেতে পারব। সে শক্তি আমার আছে।"

আঙুল বাড়িয়ে শঙ্কর সেবা-সদনটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ওইখানে নিয়ে চ।" রাখহরির দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, "আমিই আপনার সেবা-সদনের প্রথম পেশেন্ট। অপারেশন টেবিলটা কাজে লেগে গেল।"

সাজানো সেবা-সদনের গেট পেরিয়ে ছেলেরা নিঃশব্দে শঙ্করকে নিয়ে ভেতরে এল। তারপর সবচেয়ে ভাল খাটটার উপর শুইয়ে দিলে। রাখহরি আর তারিণীশঙ্কর পাশাপাশি এসে দাঁড়াল তার শিয়রের কাছে। "বল শঙ্কর, এ-কাজ কে করেছে বল।"

শঙ্কর বললে, "আমি—আমি নিজেই নিজেকে মেরেছি।"

রাখহরি বললে, "ওষুধপত্র এখানে সবই রয়েছে, অথচ ডাক্তার ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।"

রাখহরি আর তারিণীশঙ্কর তখন এক হয়ে গেছে।

শঙ্কর দেখলে। দেখে বড় তৃপ্তির হাসি হাসলে। হেসে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোবা সব রাস্তায় যা। ডাক্তারবাবু আসবেন। দ্যাখ।"

রাখহরি বললে, "আমি দেখি। আয় তোরা আমার সঙ্গে।"

ছেলেরা চলে যাচ্ছিল। তাদের ভেতর একজনকে ডেকে শঙ্কর বললে, "গৌর, শোন। তুই একবার চট্ করে যা ত ভাই, মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী ইন্দ্রাণীকে আর জয়াকে ডেকে আন। এ-সব কিছু বলিস না।"

তারিণীশঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, "ওদেব ডাকতে বললে কেন? চেঁচামেচি করবে।"

"হ্যাঁ, চেঁচামেচি করবে, কাঁদবে। ইন্দ্রাণী খুব কাঁদবে। ইন্দ্রাণী কে জানেন কাকাবাবু? বলে নিই। পরে যদি বলবার সময় না পাই।"

তারিণীশঙ্কর তার শিযরের কাছে এসে বসল।

শঙ্কর বললে, "ইন্দ্রাণী আপনার বৌমা। আমার বিয়ে-করা স্ত্রী।"

"এ-কথা এতদিন বলনি শঙ্কব?"

"না, বলিনি। আমাব মা বিযে দিযে গিযেছিলেন। আমাব মা কে জানেন? আপনাব দাদাব স্ত্রী—আপনার বৌদিদি। আমার মা মারা গেছেন।"

"তুমি কি তাহলে—"

"আপনাব দাদা ভবানীশঙ্কবেব ছেলে—ববিশঙ্কব। ববিটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। এই আমাব জন্মস্থান। তাই এ গ্রামটাকে আমি এত ভালবাসি। অনেক-কিছু করবার ইচ্ছা ছিল। কিছুই করতে পাবলাম না।"

এতক্ষণ পরে শঙ্কবের চোখেব কোণে জল দেখা গেল।

কার্তিককে ধরে নিযে এল দুজন ছেলে।

তাবিণীশঙ্কব বলে উঠল, "ওবে শোন শোন কার্তিক, শঙ্কব কে জানিস? ও আমার দাদার ছেলে, তোর আপন জ্যেঠতুতো ভাই।"

"আবে ধেৎ, আমার কিছু ভাল লাগছে না। চুলোয় যাক্ ওর জন্মবৃত্তান্ত, ও আমার দাদা, আমার শঙ্কবদা।"

বলেই সে শঙ্করেব দিকে তাকিয়ে বললে, "বলবে না ত? আচ্ছা—বোল না। কিন্তু এই আমি"—হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিযে বললে, "এই আমি প্রতিজ্ঞা কবছি, তোমাকে যে মেরেছে সে যেখানেই থাক্, তাকে আমি বেঁচে থাকতে দেব না।"

"ওরে পাগল, শোন, এইখানে আয!" শঙ্কর ডাকলে কার্তিককে।

"তোমার দিকে তাকাতে পারছি না আমি।" বলতে বলতে কার্তিক গিয়ে

বসল শঙ্করের কাছে। শঙ্কর বললে, "কেউ আমাকে মারেনি। আমি নিজেই নিজেকে মেরেছি।"

"ও-সব কথা আমি শুনতে চাই না।"

"তবে শোন, দেশকে ভালবাসবি, মানুষকে ভালবাসবি, মিথ্যাচার করবি না। জানবি সত্যই ভগবান। মা বলেছিলেন, 'তোর পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করবি।' সেই সম্পত্তি উদ্ধার করতে আমি এসেছিলাম। সম্পত্তি উদ্ধার আমি করেছি। এই হাসপাতাল, এই বিদ্যামন্দির আর আমাদের জীবন দিয়ে গড়া এই পথ। আজ শহর আর গ্রাম এক হয়ে গেল। ওই পথের উপর দিয়ে আজ প্রথম আসছে ডাক্তারের গাড়ি। এইটিই আমি চেয়েছিলাম। এই পথকে প্রণাম কর!"

কার্তিকের চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। হাত দুটি তুলে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

রাখহরি ঘরে ঢুকল।—"ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

কার্তিক উঠে দাঁড়াল। তারিণীশঙ্কর এগিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় দোরের কাছে জয়া ডাকলে, "বাবা!" .

শঙ্কর বললে, "কার্তিক, তোর বৌদি এসেছে।"

কথাটা শুনে কার্তিক একটু হকচকিয়ে গেল। আবার বসল সে শঙ্করের পাশে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে. "বৌদি কে? জয়া?"

শঙ্কর বললে, "না, ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী আমার স্ত্রী।"

"হুঁ। তা এতদিন বলতে কি হয়েছিল?" বলে কার্তিক বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এসেছিলেন। তিনিও বোধ করি ডাক্তার। এক মুহূর্ত দেরি করলেন না তিনি। শঙ্করকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে ক্লোরোফর্ম করে অপারেশনের আয়োজন ঠিক করে ফেললেন। গরম জলে নতুন কেনা ছুরি-কাঁচি টগবগ করে ফুটতে লাগল।

অপারেশন করবার আগে কিন্তু একটা বড় অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেল। শহরের সিভিল সার্জেন এসেছেন। এসেছেন বন্ধু মন্মথবাবুর অনুরোধে নতুন এই ডাক্তারখানাটি দেখতে। এসেই কিন্তু বিপদে পড়ে গিয়েছেন। গুলি-খাওয়া পেশেণ্ট। অপারেশন করে গুলি বের করতেই হবে। সরকারী কর্মচারী হলেও সেবাব্রত তাঁর ধর্ম। জামা খুলে হাতে দস্তানা পরে তৈরি হলেন। কিন্তু তার আগে শঙ্করের মুখ থেকে তাঁর শোনা উচিত---কে মেরেছে তাকে। জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলুন, কে আপনাকে গুলি করেছে। পুলিসের কাজটা আমিই করি।"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

"বলুন!" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

শঙ্করের যন্ত্রণা হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সামলে নিয়ে বললে, "জানি না।"

"জানি না কি বলছেন! চেনেন না তাকে?"

জীবনে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে সে। আবার বললে।

"আজ্ঞে না। চিনি না।"

"লোকটা দেখতে কি রকম?"

শঙ্কর বললে, "ঠিক মানুষের মত।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি চেনেন তাকে, তবু বলছেন না।"

"যদি না বলি?" শঙ্কর বললে।

"ছুরি আমি ধরব না।"

"তাহলে কতক্ষণে মরব?"

"বেশি দেরি হবে না।"

শঙ্কর বললে, "ছুরি ধরে বুলেটটা বের করে দিয়ে আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না।"

"তা যখন পারছেন না, ছুরিটা তখন আর না-ই-বা ধরলেন!"

ডাক্তারবাবু দেখলেন—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ-কথা যে বলতে পারে সে বড় সহজ মানুষ নয়। ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্টকে ক্লোরোফর্ম ধরতে বললেন। আর দেরি করা চলে না।

ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি কোন কিছুরই অভাব ছিল না সেখানে। আশ্চর্য নিপুণতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর কাজ শেষ করলেন।

এতক্ষণ কাউকে তিনি ঘরে ঢুকতে দেননি। দোর খুলতেই দেখলেন, সমস্ত গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। আবালবৃদ্ধবনিতার অশ্রুভারাক্রান্ত মুখগুলি দেখে অপ্রিয় কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে সহজে বেরুতে চাইলো না। জয়া আর ইন্দ্রাণীকে তিনি পথ ছেড়ে দিলেন। সাবধান করে দিলেন—তারা যেন ওকে কোনও কথা বলাবার চেষ্টা না করে।

রাখহরি তারিণীশঙ্কর দুজনেই ছুটে এল ডাক্তারবাবুর কাছে। জিজ্ঞেস করলে, "বাঁচবে ত?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "মনে হয় বাঁচবে।"

ইন্দ্রাণী আর জয়া—শঙ্করের বিছানার দুপাশে দুজন নীরবে চোখের জল ফেলছে।

ইন্দ্রাণী লুটিয়ে পড়েছিল তার পায়ের কাছে। জয়া তখনও কিছু জানতে

পারেনি। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, “অমন করিসনি হতভাগী, লোকে দেখলে কী ভাববে?”

ইন্দ্রাণী সেকথার কোনও জবাব দেয়নি।

সারাদিনের পর সন্ধ্যায় চোখ চেয়ে তাকালে শঙ্কর।

আশায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সকলে।

সুমুখেই ছিল ইন্দ্রাণী। চোখের জল মুছে জিজ্ঞেস করলে, “কষ্ট হচ্ছে?”

শঙ্কর বললে, “না।”

ইন্দ্রাণী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বললে। শঙ্করের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল সে যেন হাসলে একটুখানি।

জয়া এক মুহূর্তের জন্য কাছছাড়া হয়নি। বললে, “বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস তুই। কি বললি?”

আবার কানে কানে কথা! ইন্দ্রাণী জয়াকেও বললে। জয়া তার গায়ে এক ঠেলা মেরে দূরে সরে গেল। বললে, “কিছু আর বাকি রাখলি না তুই।”

শহর থেকে একজন ডাক্তাব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সিভিল সার্জেন। আর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে। শঙ্কর তখন ঘুমুচ্ছে। ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন তাকে জাগাতে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একবার দেখলেন শুধু। বুলেটটি নিলেন হাতে করে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন বাইরের ঘরে।

তাঁর প্রতীক্ষার আর শেষ হল না।

প্রহরের পর প্রহর চলে গেল। সারারাত কাটল উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায়। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল শঙ্করের। ডাক্তারের কাছে খবর পেয়ে সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট এসে দাঁড়ালেন। বললেন. “আপনার একটা ডিক্লারেশন নিতে এসেছি। কে আপনাকে মেরেছে বলুন।”

শঙ্কর বললে, “আমি নিজে।”

বলেই কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শঙ্কর চোখ বন্ধ করলে। তারপর সে চোখ আর খুলল না।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, “শেষ হয়ে গেছে।”

ইন্দ্রাণী লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। বললে, “আমার পরিচয় দিয়ে গেলে না তুমি। বলে যাও আমি কে!”

কার্তিক দাঁড়িয়েছিল, জয়া দাঁড়িয়েছিল। রাখহরি, তারিণীশঙ্কর—সবাই।

কার্তিক বললে, “আমরা সবাই জানি বৌদি, শঙ্করদা বলেছে তোমার পরিচয়। ওঠ।”

ফুলেপাতায় সাজিয়ে শঙ্করের মৃতদেহ নতুন রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে। ছেলেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শবাধার, ছেলেদের চোখে জল। আশপাশের সমস্ত গ্রাম ভেঙে লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। দেখতে এসেছে তারা এই জীবনের জয়যাত্রা।

পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে ইন্দ্রাণী আর জয়া।

পাশাপাশি হাতে হাত দিয়ে চলেছে রাখহরি আর তারিণীশংকর।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চলেছেন সবার আগে আগে মোটরবাইকে চড়ে। ডানহাতটি তাঁর কপালে তোলা—দুই চোখ ভরে এসেছে জলে। প্রণাম জানাচ্ছেন সেই মহাজীবনকে—যে-জীবন মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এমনি করেই যাত্রা করে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে।